ফরীদ আহমদ রেজা

বিপরীত উচ্চারণ

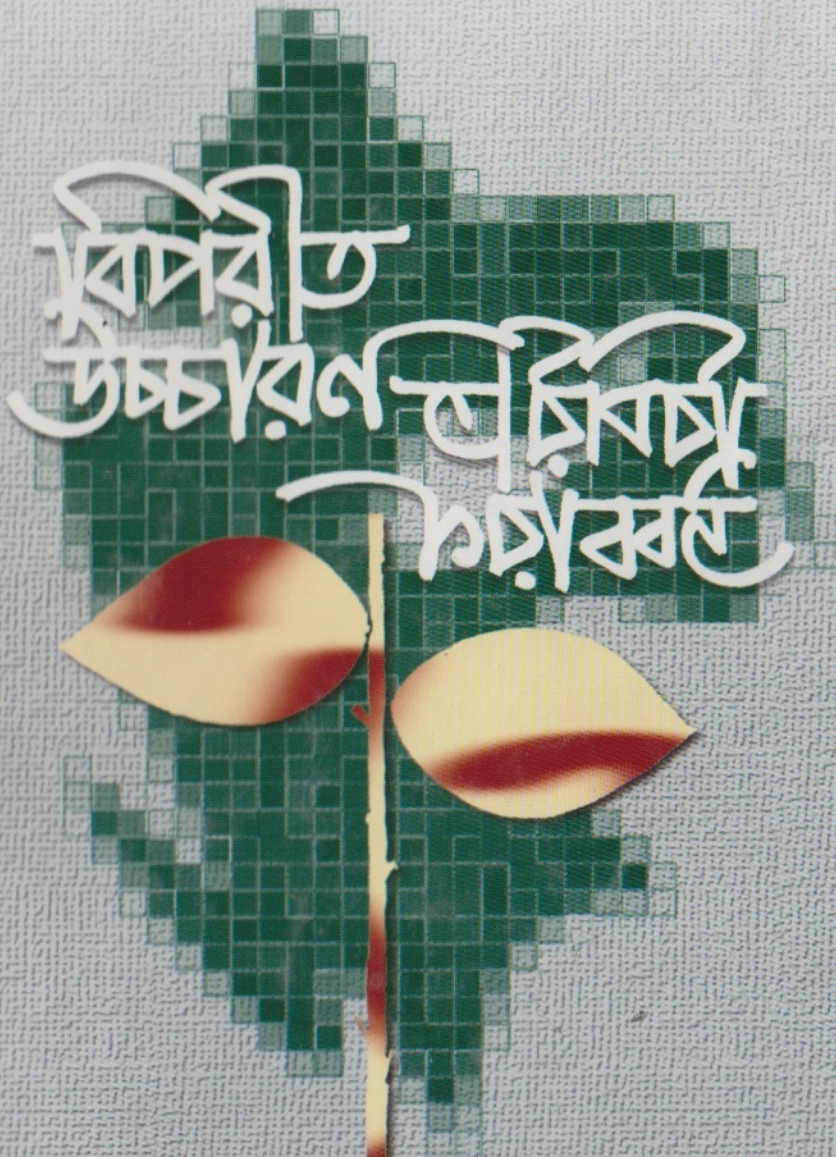

উৎসর্গ :
ছড়াকার
আহমদ ময়েজকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

কবি ফররুখের মত জ্বলজ্বলে তাঁর এক জোড়া চোখ, তেমনি আপোষহীন আদর্শের প্রশ্নে এবং এ জন্যে যদি ত্যাগ করতে হয় বড় কিছু, তবু লড়ে যান নীতির প্রশ্নে– তিনি ফরীদ আহমদ রেজা। একজন কবি, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ। তবে কবিতায় এবং প্রবন্ধেই বোধ করেন বেশি স্বচ্ছন্দ।

কবিতা লিখেছেন কম এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার অধিকাংশই। কম লেখলেও কবিতার পংক্তিগুলো বড় জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল। তার কবিতা পাঠকের কাছে সহজবোধ্য, কিন্তু নন্দন তত্ত্ব মার খায়নি।

তার লেখা প্রবন্ধগুলো মুলত সমসাময়িক ভাবনার প্রতিচ্ছবি। কারন ফরীদ আহমদ রেজা সময়ের দাবীকে অস্বীকার করেননি কখনো। এ জন্যে জীবনের শুরুতে সমবেত হয়েছেন আদর্শিক কাফেলার পতাকাতলে। এক সময় ইসলামী ছাত্র শিবিরের পুরো বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন কাধে।

ছাত্র জীবন ইতি টানতেই মানুষ গড়ার কারিগরের পেশা বেছে নেন। এই পেশায় এখনো অব্যাহত। সুদূর বৃটেনে বসবাস গড়ে তুললেও এখনো সেই মানুষ বানাবার কারিগরই আছেন।

পারিবারিক ঐতিহ্যই তাকে এই পেশায় নিরন্ত ব্যাপৃত রেখেছে। দাদা পীর মজির উদ্দীন ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক। রচনা করেছেন অসংখ্য মরমী গান। সেই জগন্নাথপুরের ভাটি অঞ্চল থেকে মোমেনশাহীর ভাটির মুল্লুকে ছড়িয়ে আছে তার গান অজস্র ভক্তের মুখে মুখে। পিতা মরমী কবি মনফর উদ্দীন আহমদও ছিলেন একজন মরমী কবি। আর তাই পুত্র রেজা যখন প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলেন বাড়ীতে, তখন পিতা তার হাতে কোন বানিজ্যের বেসাতি তুলে দেননি, দিয়েছিলেন পারিবারিক পাঠাগারের চাবিকাঠি। সেই যে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বইয়ের হরফে রেজা রেখেছিলেন চোখ, এখনো সেই চোখ অপলক বইয়ের হরফে। এখান থেকে আহরিত জ্ঞান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষন নিজের অনুভব বিশ্লেষনকে রূপায়িত করতে বেছে নেন গদ্যে কথকতা। এক সময় সিলেটের সবগুলো দৈনিক-সাপ্তাহিক, ঢাকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রায় নিয়মিতই 'কলাম' নামের গদ্য লিখতেন। তারপর যুক্তরাজ্যে বসবাসে থেকেও 'কলাম' লিখছেন সেখানকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

এ সকল কলামের বাছাই সমষ্টিই ফরীদ আহমদ রেজার 'বিপরীত উচ্চারণ' গ্রন্থটি এবং এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

এক নজরে ফরীদ আহমদ রেজা ঃ জন্ম-৩০শে জুলাই ১৯৫২, পিতা - মনফর উদ্দীন আহমদ, মাতা - সৈয়দা সুফিয়া আহমদ, শিক্ষা জীবন ঃ সৈয়দপুর মডেল প্রাইমারী স্কুল, সুনামগঞ্জ / এইচ এম পি হাই স্কুল, সুনামগঞ্জ / সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট/ এম সি কলেজ, সিলেট/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। কর্মজীবন ঃ চুনারুঘাট কলেজ, হবিগঞ্জ এবং তাজপুর কলেজ, সিলেট-এ অধ্যাপনা। সাপ্তাহিক সিলেট সংবাদ-এ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক সিলেটের ডাক-এ সহকারী সম্পাদক, দৈনিক জালালাবাদী-তে সহকারী সম্পাদক, সাপ্তহিক বিক্রম-এ সহকারী সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন। ইংলেন্ডে ইসলামীক কলেজ, লন্ডন-এ অধ্যাপনা এবং বর্তমানে ষ্ট্রাটফোর্ড স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ার-এর সেক্রেটারী পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম গ্রন্থ- যিসাসের আগমন অনিবার্য (কাব্য গ্রন্থ)। সংসার জীবন ঃ স্ত্রী-নীলুফার খানম, পুত্র-নাফে আনাম ও রাবি নিয়াম, কন্যা- রিদা হিসান ও ওয়ারদাহ নিসওয়ান।

সেলিম আউয়াল
চেয়ারম্যান
কইতর প্রকাশনী, সিলেট।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

কখন কিভাবে লেখালেখি শুরু করেছি সে কথা আজ আর মনে নেই। দাদাজানের নাগরী হরফে লেখা পুঁথি ও গানের বই নিয়ে আব্বাকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। আব্বা নিজেও ছিলেন মরমী কবি। বই এবং খাতা-কলম ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আমি প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসার পর আব্বা তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের চাবি আমার হাতে তুলে দেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বই পুস্তকের পাশাপাশি ছিল কোলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে প্রকাশিত বহু সাহিত্য সাময়িকী। এগুলো ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে একদিন দেখলাম লেখালেখি শুরু করে দিয়েছি। এরপর থেকে লিখছি, লিখছি ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এবং গান। মাঝে মাঝে অনুবাদও করছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত বই আকারে কোন কিছু প্রকাশিত হয়নি। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে দু' দু'বার পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছি। পরে তা হারিয়ে গেছে। নানা কারণে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বা সিলেট রেডিও থেকে প্রচারিত বিভিন্ন লেখা সংগ্রহের উদ্যোগ নানা কারণে নেয়া সম্ভব হয়নি। এগুলোর কোন কপিও নিজের কাছে সংরক্ষিত নেই।

আমার কলামধর্মী লেখার শুরু ১৯৭৪ সালে, আব্দুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক জনপদে। ১৯৮৫ সালে সিলেটের তাজপুর কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি বছর খানেক সাপ্তাহিক সিলেট সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। তখন থেকে নিয়মিতভাবে কলাম লেখা শুরু করি। এরপর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সিলেট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিক্রমে নিয়মিত কলাম লিখেছি।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে বৃটেন আসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় লেখা শুরু করি। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক পূর্বদেশে এবং পরে সালাম বাংলাদেশে বিপরীত উচ্চারণ নামে নিয়মিত কলাম লিখেছি। গত কিছুদিন থেকে একই নামে নতুন দিনে এবং নেপথ্য সংলাপ শিরোনামে ইসলামিক সমাচারের জন্যে কলাম লিখছি। নতুন দিন এবং ইসলামিক সমাচারে প্রকাশিত কলামগুলো থেকে বাছাইকৃত কয়েকটি লেখা নিয়ে বিপরীত উচ্চারণ বের হলো। খবরের কাগজের জন্যে লেখা কলামে সাধারণতঃ সাময়িক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে এর কিছুটা স্থায়ী আবেদনও অস্বীকার করা যায় না। সে দিক বিবেচনা করেই তা গ্রন্থাগারে পাঠকদের সমীপে পেশ করা হল। যাদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন কবি রাগিব হোসেন চৌধুরী, বিক্রম সম্পাদক মাসুদ মজুমদার, ছড়াকার আহমদ ময়েজ, স্নেহভাজন সেলিম আউয়াল প্রমুখ।

আমার এ সকল সুহৃদ এবং অন্যান্য যারা বহুদিন থেকে আমাকে বই প্রকাশের জন্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন, তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ফরীদ আহমদ রেজা
লন্ডন
৩১ আগষ্ট ২০০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পরিবার প্রথার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের জেহাদ	১৪
প্রধানমন্ত্রী এবং লেজ কাটা শেয়াল	১৮
টাওয়ার হ্যামলেটসের বাঙালিসমাজ কেমন আছেন	২৩
বৃটেনে বাংলা শিক্ষার হালচাল	২৮
কে মৌলবাদী এবং কে নয়?	৩৩
লন্ডনী কন্যা ও কন্যাদায়গ্রস্থ মা-বাবা	৩৯
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী?	৪৩
পাদটীকা ঃ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী?	৪৮
হুন্ডি-হাইকমিশন এবং প্রসঙ্গিক বিষয়	৫২
বিয়েহীন সমাজে বিয়ে নিয়ে কেন এতো হৈ চৈ?	৫৬
দান-দক্ষিণা এবং আমাদের আলেম সমাজ	৬০
টনি ব্লেয়ারের কুরআন অধ্যয়ন এবং বাঙালীর সাঈদী প্রতিরোধ আন্দোলন	৬৪
বিলাতে ঈদুল আজহা	৬৭
বিলাতের ওলামায়ে কেরাম সমীপেষু -১	৭০
বিলাতের ওলামায়ে কেরাম সমীপেষু -২	৭৪
বৃটেনে বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট কার স্বার্থে?	৭৮
মদ ছাড়া কি ইসলাম অচল হয়ে পড়বে?	৮১
কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং আমাদের বুদ্ধিজীবি মহল	৮৪
দলাদলি ও বাঙালী	৮৭
ডান বাম এক আওয়াজ ঠেকাও মৌলবাদ	৯১
ছাত্ররাজনীতি ও আমাদের দায়	৯৫
টাওয়ার হ্যামলেটসঃ বাঙালী কাউন্সিলারগণ কি করেন?	৯৮
কমিউনিজমের পতন এবং আমেরিকার উদ্বাহু নৃত্য	১০১
বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ	১০৫
বর্ণবাদ ও একজন তাহির হোসেন	১০৯
হরতাল কতটুকু গণতান্ত্রিক বা ইসলাম সম্মত?	১১২
লন্ডনে বাঙালী ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?	১১৫
যারা সুরত মিয়ার মত লাশ হতে চান না তারা কথা বলুন	১২০
জেনারেল ওসমানীর অপরাধ কি?	১২৫
বাংলাদেশ ও পলিটিক্স	১২৯
মিলেনিয়াম উৎসবের এপিঠ ওপিঠ	১৩৩
আমাদের বিয়ে কেন ভাঙছে?	১৩৮
ওআইসি কনফারেন্সের-এর এজেন্ডা কার হাতে?	১৪২
সিলেট ও সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ	১৪৭

www.pathagar.com

ওরা মুক্তিযোদ্ধা না টেররিস্ট?

আজকের লেখা একটি চুটকি দিয়ে শুরু করছি। ছেলে নার্সারি স্কুলে পড়ে এবং সবেমাত্র স্কুল থেকে ঘরে এসেছে। মা লক্ষ্য করে দেখলেন ছেলের কপালের পাশটায় কালসিটে। মা বুঝে নিলেন ছেলে স্কুলে কারো সাথে মারামারি করেছে। তিনি বললেন,'তোমার কপালে এ কালো দাগ কোত্থেকে এলো বাবা ? তোমাকে তো বলেছি ভালো ছেলেরা স্কুলে মারামারি করেনা।'

'হ্যাঁ মা, তুমি ঠিকই বলেছ এবং আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি যে ভালো ছেলেরা স্কুলে মারামারি করেনা। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি, আমি ভেবেছিলাম ছেলেটি খুব ভালো, মারামারি জানেনা। তাই তাকে একটু ধাক্কা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম ছেলেটি সে রকম নয়। সে এমন ভাবে ধাক্কা দিল যে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।' ছেলে জবাব দিলো।

চুটকিটি মনে পড়ে গেল বাংলা কাগজে চেচনিয়া সংক্রান্ত একটি খবর দেখে। ঐ কাগজ চেচনিয়ার খবর দিতে গিয়ে সেখানকার স্বাধীনতাকামী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারী বলে উল্লেখ করেছে। খবরটি পড়ে হাসবো না কাঁদবো ঠিক করে ওঠতে পারিনি। রুশ সরকারের দৃষ্টিতে চেচনিয়ার সকল মানুষই দুষ্কৃতিকারী, ওই নার্সারী স্কুলের ছেলের মত। যুদ্ধ হচ্ছে চেচনিয়ার ভূখন্ডে, রাশিয়ায় নয়। রাশিয়ার চেচনিয়ায় অবস্থান জবরদখলকারী হিসেবে। এমনকি মস্কোয় যে বোমা হামলার দায়ে রাশিয়া চেচনিয়াকে অভিযুক্ত করেছিল তাও যে সাজানো নাটক ছিল সম্প্রতি সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। চেচেনদের হাতে বন্দী রুশ সামরিক গোয়েন্দা অফিসার আলেক্সি গ্যাল্‌টিন এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। অবশ্য রাশিয়া যে সকল সংবাদ সরবরাহ করে সেগুলোতে তারা সব সময় চেচনিয়ার মুক্তিকামী জনগণকে সন্ত্রাসী,মৌলবাদী,বিদ্রোহী এবং দুষ্কৃতিকারী হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছেও কি তারা সন্ত্রাসী,মৌলবাদী,বিদ্রোহী এবং দুষ্কৃতিকারী ? এমনটি হওয়ার তো কথা নয়। বাংলাদেশ সরকার চেচনিয়াকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি এ কথা ঠিক। আফগান সরকার ছাড়া কেউই তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। তাই বলে কি বাংলা কাগজে তাদের দুষ্কৃতিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে ? এ ভাবেই তো ইয়াহিয়া খানদের কাছে বাংলার মানুষ ছিল দুষ্কৃতিকারী, তাই না ? ইসরাইলের কাছে ফিলিস্তিনি এবং ভারতের কাছে কাশ্মীরি জনগণ একই ভাবে চিহ্নিত। ভারত, ইসরাইল এবং রুশ সরকারের সাথে গলা মিলিয়ে

www.pathagar.com

বাংলা কাগজে চেচনিয়ার জনগণকে এভাবে চিহ্নিত করার বহু কারণ থাকতে পারে। যারা পত্রিকার টেবিলে কাজ করেন হতে পারে তারা এত ব্যস্ত যে কোথায় কি নিউজ যাচ্ছে তা দেখার তাদের সময় নেই। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায়না যে খোদ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ হয়তো এ জাতীয় মনোভাব পোষন করেন। অন্যদের কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদের শেষে সংশ্লিষ্ট বার্তাসংস্থার নাম, তথ্যবিবরণী, প্রেসবিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি লিখে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। কোন কিছু লেখা না থাকলে বুঝতে হবে পত্রিকা নিজ দায়িত্বে খবর দিচ্ছে।

চেচনিয়ার সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেও বাংলা পত্রিকা এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারে। লন্ডন-আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে চেচনিয়ার দূরত্ব খুব বেশি না হলেও যোগাযোগের অভাব ও ভাষাগত সমস্যার কারণে চেচনিয়া সম্পর্কে আমরা খুব কমই ওয়াকিবহাল আছি। এর পাশাপাশি মুসলমানদের সম্পর্কে পাশ্চাত্য মিড়িয়ার একপেশে প্রচারণার প্রভাবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ যা-ই হোক না কেন চেচনিয়ার ব্যাপারে আমাদের ধারণা পরিস্কার হওয়া দরকার। চেচনিয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বহু প্রাচীন এক মুসলিম জনপদের নাম। বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানের জনগনের অনেক পূর্বে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) এর সময় চেচনিয়ায় ইসলামী শাসন কায়েম হয়। আব্বাসীয় খেলাফতের সময় চেচনিয়া মোঙ্গলদের দখলে চলে যায়। মোঙ্গলরা তখন অমুসলমান ছিলো। এ সময় এমন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ আছে। মোঙ্গল অধিকৃত চেচনিয়ার মুসললমানদের দাওয়াতী কাজের ফলে মোঙ্গলরা ইসলাম কবুল করে নেয়। চেচনিয়ার পরাধীন মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও চরিত্র মাধুর্যের এ সোনালী কহিনী পৃথিবীর যেখানে যারা ইসলামকে বিজয়ী করার পক্ষে কাজ করছেন তাদের সকলের জন্য প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস। চেচনিয়ার মুসলমানরা আফগান মুসলমানদের মতই সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী। তারা যেমন জার সম্রাটদের বশ্যতা স্বীকার করেননি তেমনি কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধেও জীবন বাজী রেখে লড়াই করেছেন। ইমাম শামিল, শায়খ মনসুর, ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখের নেতৃত্বে চেচনিয়ার জনগণ নিজেদের স্বধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। স্টালিনের সময় পাইকারী ভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে হাজার হাজার চেচনিয়কে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। বলতে গেলে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত চেচনিয়রা রাশিয়ায় যাযাবরের মত জীবন যাপন করেছেন। কম্যুনিস্ট শাসন পতনের পর রাশিয়ার অন্যান্য এলাকার অনুসরণে চেচনিয়াও দুদায়েভের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়। রাশিয়া অন্যান্যদের স্বাধীনতা মেনে নিলেও চেচনিয়াকে জবর দখল করে রাখতে চায়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে মুসলিম অমুসলিম

www.pathagar.com

নির্বিশেষে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। রাশিয়া তার সকল শক্তি নিয়ে চেচনিয়ার ওপর হামলা চালায়। সুদীর্ঘ ২১ মাস ব্যাপী পরিচালিত যুদ্ধে রুশ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি ও চেচনিয় বাহিনীর সাফল্য পৃথিবীকে অবাক করে দেয়। তাই রুশ সরকার চেচনিয়ার সাথে আপোস করতে বাধ্য হয়। সম্মুখ সমরে চেচনিয়া বিজয়ী হলেও কূটনৈতিক যুদ্ধে রাশিয়া এখন এগিয়ে রয়েছে। এটা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠছে যে চেচনিয়া ইস্যু নিয়ে রুশ-মার্কিন শক্তি একটা সমঝোতায় পৌছে গেছে। একসময় তারা পাশ্চাত্য মিডিয়ার ভাল কাভারেজ পেয়েছিল। তখন মুসলিম বিশ্বও এ ব্যাপারে কিছুটা হৈ চৈ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এক অদৃশ্য সূতোর টানে চারদিকে সুনসান নিরবতা বিরাজ করছে। রুশ বাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আনাতলী করনুকভ এ জন্যেই বোধহয় দম্ভভরে বলেছেন, 'রাশিয়া ইরাক বা যুগোশ্লাভিয়া নয়।' তা ছাড়া সদ্যসমাপ্ত ওএসসিই কনফারেন্সে চেচনিয়া প্রশ্নে রাশিয়ার উপর বড় ধরনের কোন চাপ আসেনি। রাশিয়া চেচনিয়ার রাজধানী গ্রজনী অবরোধ করে রেখেছে এবং ঘোষণা দিয়েছে, যারা রাজধানী শহরে অবস্থান করবে তাদের সবাইকে সন্ত্রাসী বিবেচনা করে হত্যা করা হবে। মুসলিম বিশ্বের চোখের সামনেই মুসলমানদের হত্যা ও বিতাড়ন চলছে। মুসলমান শাসক আছেন, বাদশাহ আছেন, কিন্তু সবাই নিরব নিশ্চুপ। সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। রুশ দূতাবাসের সাথে দেনদরবার, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন ইত্যাদি দূরের কথা মৌখিক প্রতিবাদও কারো মুখ থেকে শোনা যাচ্ছেনা।

রুশ জেনারেলের এ কথা ঠিক যে রাশিয়া ইরাক বা যুগোশ্লাভিয়া নয়। তবে এ কথা তার জানা আছে যে চেচনিয়া বসনিয়া নয়। চেচনিয়ার সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা তিনি জানেন এবং এর কিছু আলামত তিনি গত যুদ্ধে দেখেছেন। তার এ কথা মনে রাখা দরকার যে চেচনিয়া আফগানদের ভাই। আফগানিস্তানে রুশ শ্বেতভল্লুকের দল যেভাবে নাকানি চুবানি খেয়েছে চেচনিয়ায়ও এর ব্যতিক্রম হবেনা ইনশা আল্লাহ । এর প্রমাণ আর কেউ না দেখলেও রুশসরকার হাতে নাতে দেখতে পাচ্ছে। রাশিয়া কর্তৃক পরিবেশিত খবরের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য সমাজ গ্রজনীর পতন সংবাদ শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু সে খবর আর আসছেনা। এ থেকে কি বোঝা যায় ? আর গ্রজনীর পতন হলেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এ কথা মনে করা ঠিক নয়। তখন হয়তো চলবে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ। স্টালিন যাদের বশে আনতে পারেননি তাদের বশে আনা ইয়েলৎসিনের ভারবাহী পুতিনের জন্যে এত সহজ নয়। সেদিন চেচনিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত ওমর সভগাইপভের সাথে আলাপের মাধ্যমে এ কথাটা আমি আরো ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছি। ওমর প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদেভ এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বৃটেন সফর করছেন। তিনি ইংরেজী জানেন না, তাই তার দোভাষী আহমাদের মাধ্যমে তার সাথে আলাপ হল। আহমাদও চেচনিয়ার অধিবাসী, তবে তিনি বিলাতে থাকেন। চেচনিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিলাতের জনগণকে ওয়াকিবহাল করাই তার

www.pathagar.com

সফরের উদ্দেশ্য। তিনি যা বললেন এর সার কথা হল চেচনিয়ায় কি হচ্ছে সে সম্পর্কে বাইরের দুনিয়া খুব কমই জানতে পারছে। এর প্রধান কারণ কূটনৈতিক দিক থেকে চেচনিয়া এখন একঘরে। পৃথিবীর কোন সরকারই তাদের পক্ষে কথা বলার সাহস দেখাতে পারছেনা। রাশিয়া চেচনিয়ার জনগনের সাথে যা করছে একে এক কথায় নির্বিচার গণহত্যা বলে অভিহিত করতে হয়। সেখানে এ পর্যন্ত ৩০ হাজারের অধিক লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ লাখ লোক শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম এবং শহরের পর শহর মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। রিলিফ ওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীরাও তাদের আক্রমন থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। কিন্তু এর মানে এ নয় যে চেচনিয়ার জাগ্রত জনতা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তারা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বললেন, রাশিয়ার সাথে চেচনিয়ার এ যুদ্ধ নতুন কিছু নয়, দীর্ঘকাল থেকে এ যুদ্ধ চলছে। পার্থক্য শুধু এই যে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর বিশ্ববাসী তা জানতে পারছে।

আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তারা কেউই চেচনিয়ার ভাষা জানতাম না। তবে ওমর যখন কথা বলছিলেন তখন তার চোখ-মুখ ছিলো প্রত্যয়ে দীপ্ত এবং কণ্ঠ ছিলো গুরুগম্ভীর ও বলিষ্ঠ। আমার এগারো বছর বয়সের ছেলে নাফে আমার সাথে ছিলো। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে বললো, 'রাশিয়া এদের সাথে পারবেনা। চেচনিয়ার সকল মানুষ যদি এরকম ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয় তা হলে কেউ তাদের পরাজিত করতে পারবেনা। তা ছাড়া কি উঁচু-মোটা ও বলিষ্ঠ চেহারা ! তারা সবাই কি এ রকম আব্বু ?' জবাবে আমি বললাম, 'জানিনা চেচনিয়ার সকল মানুষ এরকম উঁচু-মোটা ও বলিষ্ঠ কি না। তবে বছর চারেক আগে লেস্টারে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে চেচনিয়ার বেশ কয়েকজন লোকের সাথে আমার দেখা হয়। তাদের মধ্যে তিন-চার জন মহিলাও ছিলেন। ওদের মধ্যেও আমি একই প্রকার শারীরিক শক্তি ও মানসিক বলিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করেছি।'

আসলে রাশিয়া চেচনিয়ার মাটি চায়, মানুষ চায়না। রুশ জেনারেল গেনাডি ট্রশেভ সম্প্রতি শালি অবরোধ করে যে ঘোষণা দেন তা এ প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য। তিনি ঘেষণা দেনঃ 'Shali will be cleansed, and if anybody is left there, they will simply be destroyed. Of course, it would be better if there was less bloodshed. But war is war.'

অপর দিকে চেচনিয়ার সাথে পরিচালিত অসমযুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ও যুদ্ধের গতি দেখে খোদ রাশিয়ার অনেক বিশেষজ্ঞ এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ শুরু করেছেন। রাশিয়ার উত্তর ককেসাস বিশেষজ্ঞ এমিল পেন গত ১৬

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মস্কোয় অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে বলেন, এ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত। ১৯৯৫ সালের যুদ্ধে শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা ছিলো রাশিয়ার দখলে। কিন্তু সে যুদ্ধেও রাশিয়া পরাজিত হয়েছে, কারণ এ যুদ্ধ বিজয়ের ছিলোনা। তিনি চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দুস্কৃতিকারীদের মধ্যে পার্থক্য করা সরকারের কর্তব্য। চেচনিয়ায় সামরিক অভিযানকে মস্কোর আরো কিছু রাজনীতিবিদ ভালো চোখে দেখেননি। যুদ্ধ যদি আরো দীর্ঘায়িত হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বাড়তে থাকে তা হলে তা হলে স্বাভাবিক কারণেই তারা আরো উচ্চকণ্ঠ হবেন। তখন হয়তো ভ্লাদিমির পুতিনকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হবার আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিতে হবে। চেচনিয়া সমস্যার মূল কিন্তু আরো গভীরে। এ সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা অর্জনের জন্যে আমি এখানে দুটো উদ্ধৃতি দিতে চাই। ১৯৯১ সালে রাশিয়ার পতন ঘটে এবং ১৯৯২ সালের ১২ জানুয়ারী সানডে টাইমস পত্রিকায় We ignore march of Islam শীর্ষক একটি নিবন্ধে বলা হয়ঃ "For 100 years the west failed to understand communism. In the end it did not matter, there was nothing worth understanding. For more than 1000 years the west has failed to understand Islam. This time it matters: a system driven by God will always be more subtle, durable and rational than one driven solely by economics.....In the calculations and fears of many, Islam is now on the verge of replacing Communism in the front line of Global opposition to western liberal democracy. The Iranian revolution has proved more persistent and successful than anybody expected. The Algerians vote in large numbers for the Islamic Salvation Front and new Islamic states with nuclear weapons on their soil are rising from the ashes of Soviet Union. The confusion and incomprehension such ideas produce in the west are significant. On the other hand a certain type of depravity does seem to be infecting our societies: underclass's are expanding. Crime is increasing. Strategically, the implications are obvious. Islamic states run along the southern shore of the Mediterranean. They still control the world's key oil supplies, surround Israel, and soon will probably have the right weaponry as opposed to the out-dated tank battalions of Saddam Hussain. With the break up of the Soviet Union they also now run along the southern edge of Asia. If the present incompetent ruling classes are replaced by the people inspired by the

www.pathagar.com

new Islamic thinkers, then this region will soon make a mockery of our derisive ignorance of Islam..... The Liberal west is constructed on spiritual vacuum and this may will turn out to be a real political failing....."
(Bryan Appleyard: Sunday Times, 12 January'92)

অর্থাৎ 'গত একশ' বছর পশ্চিমা জগত কমিউনিজমকে বুঝতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এ জন্যে কিছু যায় আসেনি। কেননা এতে বোঝার মতো কিছু ছিলো না। এক হাজার বছর থেকে অধিক সময় যাবত পাশ্চাত্য সমাজ ইসলামকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত এ ব্যবস্থা নিছক অর্থনীতির উপর পরিচালিত ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর সুক্ষ্মদর্শী, টেকসই এবং যুক্তিনির্ভর। অনেকের ধারণা ও ভয় হচ্ছে বর্তমানে ইসলাম পশ্চিমা উদারনীতিকে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে কমিউনিজমের স্থান দখল করার পর্যায়ে উপনীত। ইরান বিপ্লবের স্থায়ীত্ব ও সাফল্য সকলের ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। আলজেরিয়ার জনতা ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্টকে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসাবশেষ থেকে পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থান ঘটছে। এ সকল বিষয় পাশ্চাত্য সমাজের কাছে পরিষ্কার নয় এবং তারা বিষয়টা বুঝতে পারছেনা। ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে আমাদের সমাজে নীতিহীনতা ছড়িয়ে পড়ছে। বিত্তহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধ বড়ছে। কৌশলগত দিক বিচারে এর পরিনতি সুস্পষ্ট। ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ভুমধ্যসাগরের দক্ষিণতীর ঘেষে বিস্তৃত। তারা এখনো বিশ্বের প্রধান তেল সরবরাহকারী। তারা ইসরাইলকে ঘিরে রয়েছে। তারা হয়তো শীঘ্রই সাদ্দাম হোসেনের সেকেলে ট্যাংক ব্যাটেলিয়ানের পরিবর্তে উপযোগী অস্ত্রসস্ত্রের অধিকারী হয়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর এখন এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রনে। বর্তমান অযোগ্য শাসকদের অপসারণ করে নতুন ইসলামী চিন্তাবিদদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ যদি ক্ষমতা দখল করে নেয় তাহলে এই অঞ্চল শীঘ্রই ইসলাম সম্পর্কে আমাদের হাস্যকর অজ্ঞতাকে নিয়ে উপহাস করবে। উদার নৈতিক পশ্চিমা জগত আধ্যাত্মিক শূণ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঠিক পরপর তদানীন্তন ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান সংবাদপত্রে এক সাক্ষাতকার প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক নিউজ ম্যাগাজিন নিউজ উইকের জুলাই সংখ্যা তা প্রকাশ করে। সেখানে তিনি বলেন– 'It would be a mistake to dissolve this asset (NATO), to waste the cohesion that has been built within this security organisation..... and you can Imagine that the confrontation between Communism and the

www.pathagar.com

market economics could be replaced by a confrontation between the western and Islamic world.'

(News Week: Gianni De Mechels: July 1991)

অর্থাৎ 'এ শক্তিকে (অর্থাৎ ন্যাটো) ভেঙে দেয়া, এই নিরাপত্তা সংস্থায় গড়ে ওঠা সংহতিকে বিনষ্ট করা ভুল হবে। এবং আপনারা অনুমান করে দেখবেন কমিউনিজম ও বাজার অর্থনীতির সংঘাত পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিমা জগত ও ইসলামী বিশ্বের সংঘাতে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'।

উপরে দেয়া উদ্ধৃতিদুটো থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং নতুন নতুন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয়কে আধুনিক পাশ্চাত্য জগত কোন্ চোখে দেখছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওরা যেভাবে ইচ্ছা বিষয়টাকে দেখুক, কিন্তু আমরাও কি তাদের চশমা চোখে দিয়ে তা দেখবো?

লন্ডন ৩১ জানুয়ারী ২০০০

www.pathagar.com

পরিবার প্রথার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের জেহাদ

পাঠকদের সমীপে একটি প্রশ্ন দিয়ে আজকের লেখা শুরু করতে চাই। এমন এক পৃথিবীর কথা কল্পনা করুন যেখানে বিবাহপ্রথা নেই এবং চতুর্দিকে শুধু গে,লেসবিয়ান ও অবিবাহিত দম্পতি। এ রকম কোন পৃথিবীর কথা কি আমরা ভাবতে পারি? না, আমরা পারিনা। কিন্তু জাতিসংঘ এবং এর মোড়লরা আমাদের পৃথিবীকে সেভাবেই গড়তে চায়। নীতিবোধ, নৈতিকতা, বিবাহপ্রথা ও পারিবারিক মূল্যবোধ যেটুকু পৃথিবীতে অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার নতুন এক পায়তারা তারা শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জাতিসংঘ সে উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক ভাবে তা মেনে চলতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে এ জন্যে ধন্যবাদ যে,যখন গোটা পৃথিবীব্যাপী পারিবারিক মূল্যবোধ এক প্রবল হুমকির সম্মুখীন তখন তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে এর পক্ষে কথা বলছেন ও তা সংরক্ষণ করছেন। শুধু তাই নয়, নিজ পিতার নামানুসারে নবজাতক পুত্রের নাম রাখার মাধ্যমে তিনি পূর্বসুরীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেও সক্ষম হয়েছেন। টনি ব্লেয়ার পরিবার নিয়ে জীবন যাপন করছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবন নিয়ে যে ছেলেখেলা শুরু হয়েছে আমি জানিনা টনি ব্লেয়ার তা কতটুকু বুঝতে পারছেন এবং তা প্রতিরোধে তার কোন ভূমিকা থাকবে কি না।

জুন ২০০০ সালে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় 'উইমেন ২০০০: জেন্ডার ইকুয়্যালিটি, ডেভেলাপমেন্ট এন্ড পিস ফর টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি।' নামটা খুবই গালভরা এতে কোন সন্দেহ নেই। মহিলাদের সমান অধিকার এবং একবিংশ শতকের পৃথিবীর উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে কথা বললে সবাই উৎফুল্ল হবার কথা। কিন্তু গালভরা এ নামের আড়ালে এবার জাতিসংঘ কতিপয় জঘন্য বিষয় পাশ করতে যাচ্ছে। কোন দেশ যদি কোন কারণে তা মানতে সম্মত না হয় তা হলে তাদের ইরাক, লিবিয়া বা সুদানের মত পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাদের উপর জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে এবং তারা সকল প্রকার সাহায্য-সহায়তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাদের শিশুরা যদি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, খরা বা প্লাবনের কারণে যদি সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেখা দেয় তা হলেও কেউ তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে পারবেনা। উক্ত বৈঠকে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র নামে যে দলিল পাশ হবে তা ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

বৈঠকের প্রস্তুতি কমিটি গত ২০ এপ্রিল ২০০০ দলিলখানা তৈরি করে ফেলেছে। বৈঠকের সময় বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র এ ব্যাপারে শুধু দায়সারা গোছের কিছু কথা বলবে এবং তারপর এর পক্ষে সম্মতি দিয়ে দস্তখত করবে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যশনাল মে, ২০০০, সংখ্যায় এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত দলিলের কিছু উদ্ধৃতিও সেখানে প্রদান করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত দলিলের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

'102 J. Take action to end discrimination on the basis of sexual orientation; review and repeal laws that criminalise homosexuality, since such laws contribute to creating a climate which encourages discrimination and violence against women who are, or percieved to be, lesbians; and address violence and harassment against them.'

সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবারপ্রথার প্রচলন রয়েছে। জাতিসংঘের পরিভাষা অনুযায়ী এ সকল পরিবার বলতে লেসবিয়ান, গে এবং অবিবাহিত দম্পতিকে বোঝানো হয়। সব কথার সার কথা হল এ যুদ্ধ বিবাহ ও পরিবার প্রথার বিরুদ্ধে। আমরা সবাই উন্নয়ন চাই, আমরা চাই মহিলাদের সকল প্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা। কিন্তু মহিলাদের অধিকার প্রদানের নামে, উন্নয়নের নামে নীতি ও নৈতিকতাহীন সমাজ আমরা চাইনা। একটা কথা আমাদের বোঝা দরকার। সকল ধর্ম বিবাহ ও পরিবারিক জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কিন্তু সকল সমাজেই সব সময় কিছু লোক ধর্মীয় বিধিনিষেধকে বুড়ি আঙ্গুলি দেখিয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবন বেছে নিতে দেখা যায়। তারা উপভোগ করতে চায় কিন্তু দায়িত্ব নিতে চায়না। পারিবারিক জীবন ও বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাদের দারুণ ক্ষোভ। অথচ এ কথা সবাই জানেন যে পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত। পরিবার প্রথা না থাকলে সন্তান লালন পালনের প্রশ্নই আসেনা এবং পরিণতিতে সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছু লোকের পরিবারহীন জীবন যাপন বা ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা কখনো সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু ইদানীং সে স্বেচ্ছাচারিতার সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান শীর্ষস্থানে। মুসলিম বিশ্বে গে ও লেসবিয়ানদের এবং বিবাহহীন দম্পতির কোন স্থান নেই। এমনকি বিবাহহীন দম্পতির ঘরে জন্ম নেয়া ছেলেমেয়েরও সেখানে কোন সামাজিক মর্যাদা নেই। জাতিসংঘ যে দলিল পাশ করতে যাচ্ছে তা শুধু ইউরোপ বা আমেরিকার জন্যে নয়, বরং তা সমগ্র

www.pathagar.com

পৃথিবীর জন্যে। ইউরোপ-আমেরিকায় গে, লেসবিয়ান এবং বিবাহহীন দম্পতি ও তাদের সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় জাতিসংঘের আসল টার্গেট এরিয়া হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব। ইউরোপ-আমেরিকার মত মুসলিম বিশ্ব থেকেও যাতে পরিবার প্রথা লোপ পেয়ে যায় এবং গে ও লেসবিয়ানরা যাতে শক্তি অর্জন করতে পারে সে জন্যেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

প্রস্তাবিত দলিলে বার বার মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদার কথা বলে আসলে ভাওতা দেয়া হচ্ছে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়া। জাতিসংঘের ভাষায় বেশ্যারা হচ্ছে 'সেক্সুয়্যাল ওয়ার্ককার' এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে জাতিসংঘের পক্ষথেকে সারা বিশ্বের প্রতি নির্দেশনামা জারি হতে যাচ্ছে। দলিলে এ কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'হাউজহোল্ড ওয়ার্ক' এবং 'রিপ্রডাক্টিভ ওয়ার্ক' এ উভয় প্রকার কাজের জন্যে মহিলাদের বেতন প্রদান করতে হবে। মহিলাদের ঘর-সংসারের কাজ না করার প্রতি সেখানে উৎসাহিত করা হয়েছে। 'ম্যারিটাল রেইপ' নামক পাশ্চাত্য কায়দার নতুন ধরণের অপরাধের কথা বলে সেখানে স্বামীদের হাত থেকে স্ত্রীদের রক্ষার জন্যে পারিবারিক আদালতের সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

'103 c.56(m). Establish family courts and adopt legislation to handle criminal matters relating to domestic violence including marital rape and sexual abuse.'

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে মহিলাদের রক্ষা করা খুবই জরুরী এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'ম্যারিটাল রেইপ' বলে কি বোঝানো হচ্ছে তা আশাকরি পাঠকরা বুঝতে পারছেন। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের উপরও হস্তক্ষেপ করার নির্দেশনামা জারী করে বলা হয়েছেঃ

'Ensure that national legislative and adminstrative reform processes give respect to women's equal rights with men to economic resources, including property and inheritance rights.'

বিষয়টা এখানেই শেষ নয়, মহিলাদের 'রিপ্রডাক্টিভ রাইট' এর কথা বলে জেনা,ব্যভিচার ও এ্যবরশন এর পাইকারী লাইসেন্স দেয়ার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে। তাদের ভাষায়ঃ

'There is non-recognition of women's and girl's reproductive rights as human rights as included in the Beijing Platform for Action, paragraph 95.'

জাতিসংঘ যাতে নৈতিকতা বিরোধী, পারিবারিক জীবন বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী এ দলিল পাশ না করতে পারে এ জন্যে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে এগিয়ে আসতে

www.pathagar.com

হবে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে এ ঈমানী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করার দায়িত্ব নিজ নিজ দেশের জনগণের। মনে রাখা দরকার যে যদি এ দলিল পাশ হয়ে যায় তা হলে দেশে দেশে প্রচলিত আইনকে - তা কুরআনের আইন হোক আর দেশীয় আইন হোক - এর আলোকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। কেননা সেখানে বলে দেয়া হয়েছেঃ '102 d. Ratify the convention on the elimination of all forms of discrimination against women, limit the extent of any reservations to it and withdraw all reservations which are incompatible with the object and purpose of the convention or otherwise incompatible with applicable international treaty law.

102 e. Review all existing, as well as future legislation to ensure compatibility and full compliance with the convention on the elimination of all forms of discrimination against women.

মুসলিম বিশ্ব ও এশিয়ার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে তছনছ করে দেয়ার জন্যে আলোচ্য ঘোষণাপত্রের চেয়ে জঘন্য কোন কিছু অতীতে তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হয়না। পাশ্চাত্যে বিবাহ প্রথা শেষ হয়ে গেছে। কারো প্রতি কারো আস্থা নেই, নেই বিশ্বাস। অবাধ যৌন স্বাধীনতা এখানকার পারিবারিক জীবন এবং সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। আমরা যারা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলাতে বসবাস করছি তারা এ সভ্যতার হাল হকিকত কিছুটা বুঝতে পারছি। সভ্য সমাজে সভ্যতার নামে যা চলছে একে যদি সভ্যতা বলা হয় তা হলে অসভ্যতা কোন্ জিনিসের নাম? জাতিসংঘ এখন জাতিসংঘ সনদের নামে উলঙ্গ সভ্যতার রীতিনীতি মুসলিম বিশ্বে চালু করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বিবাহহীন পারিবারিক জীবন, গে ও লেসবিয়ান ধারার জীবন যাপন ইত্যাদি বাংলাদেশে চালু হওয়া কি আমরা সমর্থন করতে পারি? না পারলে এ ব্যাপারে সময় থাকতে সোচ্চার হতে হবে। জাতিসংঘ ন্যায়নীতির নতুন নিয়ম তৈরি করবে, পাপ ও পূন্যের নতুন মানদন্ড ঠিক করবে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের নয়া নির্দেশনা জারি করবে এবং আমরা নীরবে তা মেনে নেব তা হতে পারেনা। ৯৪ সালে জাতিসংঘের কায়রো আধিবেশনে যখন এ বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় তখন বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে কিছু কথাবার্তা এসেছিল। তারপর সবাই ব্যাপারটা ভুলে গেছেন। কিন্তু উলঙ্গ সভ্যতার যারা উদ্ভাবক ও রক্ষক তারা বিষয়টা ভুলেনি। ছ' বছরের প্রস্তুতির পর আসছে ৫ থেকে ৯ জুন নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিষয়টা চূড়ান্ত হতে চলেছে। সুতরাং যারা নীতি ও নৈতিকতার পক্ষে রয়েছেন, যারা পারিবারিক জীবন ও বিবাহ প্রথাকে সংরক্ষণ করতে চান এবং যারা ইসলামী নৈতিকতায় বিশ্বাসী তারা এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসুন।

লন্ডন ৩০ মে ২০০০

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী এবং লেজ কাটা শেয়াল

আজ লাজ-শরমের মাথা খেয়ে এমন একটি বিষয়ে লিখছি যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। প্রথমে ভেবেছিলাম বিষয়টা হজম করে নেব। কিন্তু পরে ভাবলাম, লেখক হিসেবে পাঠকদের সাথে আমার একটা অঙ্গীকার আছে। এ ব্যাপারে বোবা শয়তানের ভূমিকা গ্রহণ করলে পাঠকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ১৯৮৮ সালের স্থানীয় সরকার আইনের ২৮ ধারা বাতিলের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। আমি এখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা নয়, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: টনি ব্লেয়ারের কথা বলছি। এর মাধ্যমে টনি ব্লেয়ার কি অর্জন করতে চাচ্ছেন তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে আমার মোটা বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝতে পারছে তা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ওয়াদা এবং বিভিন্ন সময় দেয়া বক্তব্যের সাথে এ উদ্যোগ সরাসরি সাংঘর্ষিক।

প্রথমে জানা দরকার লোকাল গবর্ণমেন্ট এক্ট ১৯৮৮ এর ২৮ ধারায় কি বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, লোকাল কাউন্সিল বিভিন্ন স্কুলে সমকামিতার পক্ষে প্রচারণা চালাতে এবং সমকামী হিসেবে জীবন যাপনকে পারিবারিক জীবনের বিকল্প হিসেবে শিক্ষা দিতে পারবেনা। এ ধারা বাতিল করা হলে 'জীবনের বাস্তবতা' শেখানোর নামে স্কুলগুলো বিনা দ্বিধায় এবং নির্বিঘ্নে কোমলমতি ছাত্রদের সমকামিতা শিক্ষা দিতে পারবে।

ধারা ২৮ বাতিলের পক্ষে যে যুক্তি দেয়া হচ্ছে তা হচ্ছে, এ ধারার কারণে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, শিক্ষকরা ছাত্রদের যথাযথ ভাবে 'ফ্যাক্টস অব লাইফ' সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন না। অপর দিকে গে ও লেসবিয়ানদের মতে এ ধারা স্কুলগুলোতে 'হমোফবিক বুলিয়িং' বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

ধারা ২৮ বাতিলের পক্ষে যে সকল কথা বলা হচ্ছে এর কোনটাই আমার মাথায় ঢুকছেনা। টলারেন্স বা সহনশীলতার দোহাই দিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের আমরা নোংরা বিষয় শিক্ষা দিতে পারিনা। সহনশীলতা অর্থ যারা দ্বিমত পোষণ করেন বা ভিন্ন ধারায় জীবন যাপন করেন তাদের অভিমতকে মূল্য দেয়া। এর মানে এ নয় ভুল জিনিসকে শুদ্ধ এবং নোংরা বিষয়কে সুন্দর বলতে হবে। গোটা দুনিয়ার সকল সভ্য

www.pathagar.com

সমাজে প্রচলিত নীতি-নৈতিকতার মাপকাঠিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কিছু লোক একটা জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরন করতে চাচ্ছে। যারা চায় তারা তা করুক। কিন্তু তা আমাদের কচি কচি শিশু-কিশোরদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা কেন ?

প্রথমে আমাদের বোঝা দরকার আমরা ফ্যামিলি লাইফ চাই, না গে ও লেসবিয়ান লাইফ চাই। লেবার পার্টি তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে জাতিকে ওয়াদা দিয়েছে যে তারা 'ফ্যামিলি ভ্যালুজ' লালন ও সংরক্ষণের পক্ষে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে পারিবারক ভাবে জীবন যাপন করেন। তার এ কথা অনুধাবন করা দরকার যে ধারা ২৮ বাতিলের মাধ্যমে তিনি পারিবারিক জীবনের উপর এক প্রচন্ড আঘাত হানতে যাচ্ছেন। ধারা ২৮ বহাল রেখেও সমকামীদের সুয়োগ সুবিধা দেয়া যায় এবং দেয়া হচ্ছে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সোসাল সার্ভিসের দেয়া গ্রান্ট নিয়ে সমকামিরা বিভিন্নস্থানে ইউথ প্রজেক্ট চালাচ্ছে। গোটা দেশব্যাপী এ ধরনের অসংখ্য প্রজেক্ট পরিচালিত হচ্ছে। ইকুয়াল অপুরচুনিটির দোহাই দিয়েই এগুলো চলছে। স্কুলের মাইনর ছেলেমেয়েদেরও এ সকল প্রজেক্টে জড়িত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এখন স্কুলেও যদি এ সব শিক্ষা দেয়ার আয়োজন করা হয় তা হলে ফ্যামিলি লাইফকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হবে। এটা নিশ্চিত যে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্যে সুস্থ ও সুন্দর পরিবারের কোন বিকল্প নেই। স্কুল বা হোস্টেল পরিবারের বিকল্প হতে পারে না।

এখানে বাংলাদেশী তথা এশিয়ান সমাজ সম্পর্কে এবং তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এশিয়ান সমাজে, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবার প্রথা অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বৃটেনে এসেও পরিবার প্রথাকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখি এবং একে লালন ও সংরক্ষনের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। ইউরোপ বা মার্কিন ধারায় পারিবারিক দায়-দায়িত্বহীন একত্র বসবাস বা লিভিং টুগেদার এশিয়ান সমাজে অচল। একই ভাবে গে এবং লেসবিয়ান ধরনের জীবন যাপনও কারো কাছে অনুমোদিত নয়। এ কথা ঠিক যে গে ও লেসবিয়ানদের প্রসঙ্গ এলে আমরা সাধারণতঃ লজ্জায় চুপ করে থাকি। কিন্তু আমরা লজ্জায় চুপ করে আছি বলে কি আমাদের ছেলেমেয়েরা তা জানতে পারছেনা ? আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা শুধু স্কুলে নয়, টেলিভিশন এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও সব সময় এ সম্পর্কে টাটকা ও তরতাজা খবর পাচ্ছে। তাদের সাথে আলাপ করে দেখবেন তারা এ ব্যাপারে অন্ধ ও মুর্খ নয়। প্রধানমন্ত্রীর 'ফ্যাক্টস লাইফ' সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অবহিত আছে। এখন ধারা ২৮ বাতিল হলে আমাদের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করা দরকার। আমরা যদি মনে করি ধারা ২৮ বহাল রাখা প্রয়োজন তা হলে এ ব্যাপারে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। লর্ড সভায় এবং হাউজ অব কমনসে যারা আমাদের প্রতিনিধি তাদের কাছে আমাদের উদ্বেগের কথা সময় থাকতে পৌছে দেয়া দরকার।

www.pathagar.com

ধারা ২৮ যাতে বাতিল করা না হয় এ জন্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। আনন্দের বিষয় যে যাদের পক্ষ থেকে এ যাবৎ দাবি এসেছে তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় 'চিলড্রেন অব আবরাহাম'এর সবাই রয়েছেন। কথাটা পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করা দরকার। গত বছর মে মাসে 'মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন' আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

'My children are brought up in the Christian faith but I would like them to know and understand other faiths and to find that an enriching experience. We are all children of Abraham and there is so much that we have in common.'

প্রধানমন্ত্রী এখানে সঠিক কথাই বলেছেন। ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান এ তিন সম্প্রদায়ের কাছে নবী ইবরাহীম (আঃ) সমান ভাবে সম্মানিত। সে হিসেবে এ তিন ধর্মের অনুসারীরা আবরাহামিক ফেইথের সন্তান এবং ধারা ২৮ বহাল রাখার দাবি তিনটি সম্প্রদায় থেকেই অত্যন্ত জোরালো ভাবে এসেছে।

বৃটেনের ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান ড. জনাথন স্যাকস্ এক বিবৃতিতে ধারা ২৮ বহাল রাখার দাবি জানিয়ে বলেন,

'There is a real danger that abolition of Section 28 will lead to the promotion of a homosexual lifestyle as morally equivalent to marriage. Not only will this confuse many young people whose sexual identities are still fluid, it will frustrate any attempt to educate children the importance of marriage as the basis of a stable and caring society.'

রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং চার্চ অব ইংল্যান্ড এর পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বৃটেনের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের সেক্রেটারী জেনারেল ইকবাল সাকরানী ধারা ২৮ বাতিলের উদ্যোগের প্রতি নিন্দা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিবাহ প্রথা পরিবারের ভিত্তি এবং পরিবার হচ্ছে সমাজের ভিত্তি। বিবাহের প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করা বা ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সভ্য সমাজের ঐতিহ্যকে আঘাত করা।' তিনি সকল মুসলমান, মসজিদ কমিটি এবং ইসলামী প্রতিষ্টানসমূহের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, 'আপনারা নিজ নিজ পার্লামেন্ট সদস্যের কাছে আপনাদের গভীর উদ্বেগের কথা পৌঁছে দিন।'

www.pathagar.com

এ থেকে বোঝা গেলো ইবরাহীম (আঃ) এর সন্তানদের সবাই সরকারের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এখন আবরাহামিক ফেইথের সন্তান হিসেবে মি. টনি ব্লেয়ার কি পদক্ষেপ নেন তা আমরা দেখতে চাই।

স্কুলে যারা যায় তাদের বয়স ৫ থেকে ১৬ বছর মাত্র। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের আপনি যা শেখাবেন তাই তারা শিখবে। পৃথিবীতে কি শিখার জিনিসের এতই অভাব দেখা দিয়েছে যে তাদের সমকামিতা এবং গে ও লেসবিয়ানদের লাইফ স্টাইল শিক্ষা দিতে হবে ? ইকুয়াল অপরচুনিটির সুবিধা কি শুধু গে ও লেসবিয়ানদের জন্যে ? ইকুয়াল অপরচুনিটির দাবি কি এটাও নয় যে আমরা যারা পারিবারিক জীবনকে মর্যাদার চোখে দেখি তাদের সন্তানদের সমকামিদের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে ?

অবশ্য ইউরোপের কোন কোন দেশে ইতোমধ্যে সমকামিদের বিবাহিত দম্পতির মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। ফ্রান্সে সমকামিরা আইনগত ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং টাউন হল থেকে তারা দস্তুর মত সার্টিফিকেট লাভ করে। স্বামী এবং স্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য সকল সরকারী সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করে। হলান্ডেও সমকামিদের জন্যে প্রায় একই রকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বলা যায়না, হয়তো বৃটেনও সে পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর পথ প্রশস্ত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ধারা ২৮ বাতিলের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বৃটেনে প্রায় ২০ লাখ মুসলমান বাস করেন। গে ও লেসবিয়ান ধরনের জীবন যাপনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কি তা মুসলমান হিসেবে আমাদের জানা থাকা দরকার। কেননা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তানদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা বা সমমৈথুন এক জঘন্য অপরাধ। একদিকে তা মানুষের প্রকৃতি বিরোধী এবং ওপর দিকে তা সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের পথে এক বিরাট অন্তরায়। একটি সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হচ্ছে পরিবার। পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলে সমাজ টিকে থাকতে পারেনা। সমকামিতা পরিবার প্রথার বিরুদ্ধে এক কুৎসিত চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। গ্রীক দার্শনিকরা এক সময় সমকামিতার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। বর্তমানে ইউরোপ এবং আমেরিকায় এর জয় জয়কার চলছে। কুরআন এ কাজকে এক ঘৃণ্য ও কদর্য কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছে। হজরত লূত (আঃ) এর জাতির লোকেরা এ কাজে জড়িত ছিলো। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের উপর পাথর বর্ষন করা হয়েছে এবং এর পর ঘরবড়ি ও সকল মানুষসহ পুরো জনপদকে

www.pathagar.com

উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী বর্তমান ট্রান্সজর্দান এলাকায় এ জাতির বসবাস ছিলো। তাদের স্মৃতির একমাত্র নিদর্শন হিসেবে মৃতসাগর বা ডেড সীকে চিহ্নিত করা হয়।

কুরআন মজিদের বহু জায়গায় লুত (আঃ) এর জাতির কথা এসেছে এবং শুধু এ কথা বলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে তারা অত্যন্ত জঘন্য এক গোনাহের কাজে লিপ্ত ছিলো যার কারণে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নাজিল হয়। যারা এ ধরণের পাপে লিপ্ত হবে তাদের কি শাস্তি দিতে হবে সে ব্যাপারে মহানবী (সঃ) এ সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেন, যে এ অপরাধ করে এবং যার সাথে করে তাদের উভয়কে হত্যা কর। রাসুল (সঃ) এর সময় এ ধরনের কোন মামলা ইসলামী আদালতে আসেনি। হজরত আলী রাঃ এবং হজর আবুবকর রাঃ এর এক মত অনুযায়ী এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে তরবারি দিয়ে হত্যা করে লাশ দাফন না করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হজরত ওমর (রাঃ) এবং হজরত ওসমান (রাঃ) এর মতে অপরাধীকে কোন ভগ্নপ্রায় বিল্ডিং এর পাশে দাঁড় করিয়ে দালানটিকে তার উপর ধ্বসিয়ে ফেলতে হবে। আমি আশাকরি মহানবী (সঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের এ সকল বক্তব্য থেকে সমকামিদের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ কি তা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সবশেষে একটা গল্প দিয়ে আজকের লেখা শেষ করছি। লেজ কাটা শেয়ালের গল্পটি হয়তো আপনাদের অনেকের জানা আছে। শেয়াল গিয়েছিল গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে। সাহসী গৃহস্থবৌ বটি দা নিয়ে তাকে তাড়া দেয়। শেয়াল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তার লেজটা গৃহস্থবৌ বটি দিয়ে কেটে রেখে দেয়। সবাই জানেন জন্তু জানোয়ারের মধ্যে শেয়াল খুব বুদ্ধিমান। লেজ হারিয়ে শেয়ালটি এক বুদ্ধি আঁটলো। সকল শেয়ালকে নিয়ে সে এক সভার আয়োজন করলো। সে সভায় সে সবাইকে বুঝিয়ে দিলো যে লেজ থাকাটা একটা ফালতু ঝামেলার ব্যাপার। যারা বুদ্ধিমান তাদের লেজ থাকেনা। প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ সব চেয়ে বুদ্ধিমান, কিন্তু মানুষের লেজ নেই। সে যেহেতু শেয়ালদের মধ্যে বুদ্ধিমান তাই সে তার লেজ কেটে ফেলেছে। অনেক সময় লেজ নিয়ে অনেক বিপদে পড়তে হয়। তা ছাড়া শেয়ালের লেজ সিংহ বা বাঘের লেজের মত সুন্দরও নয়। এখন ইচ্ছে করলে তারা সবাই লেজ নামক বাড়তি ঝামেলাটা কেটে ফেলে দিতে পারে। লেজকাটা শেয়ালের কথায় একমত হয়ে একে একে সকল শেয়াল তাদের লেজগুলো কেটে ফেললো।

গল্পটা হয়তো এখানেই শেষ। কিংবা হতে পারে এর কিছুটা বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু আমার বক্তব্য পরিষ্কার করার জন্যে গল্পের এটুকুই যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, যারা পারিবারিক জীবনের আনন্দ ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত তারা পুরো বৃটিশ জাতিকে তাদের মত তৈরি করার উদ্দেশ্যেই ধারা ২৮ বাতিলের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিচ্ছে । সত্যিই কি তাই?

লন্ডন, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০০

www.pathagar.com

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাঙালিসমাজ কেমন আছেন

ইষ্ট লন্ডনকে বলা হয় মিনি বাংলাদেশ। পুরো ইষ্ট লন্ডন না হলেও টাওয়ার হ্যামলেটস বরাকে সঠিক অর্থেই বাঙালি পাড়া বলা যায়। বাঙালি অধ্যুষিত এ বরায় এলে মনে হয় বাংলাদেশে আছি। স্কুলে বাঙালি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্য, হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেটে বাঙালি নারী-পুরুষের ভীড় এবং রাস্তাঘাটে বাঙালি তরুণদের দলবদ্ধ পদচারণা কারো চোখে না পড়ার কথা নয়। স্কুল-কলেজ, হাউজিং, সোস্যাল সার্ভিস, হাসপাতাল, ডাক্তারের সার্জারি, শপিং সেন্টার যেখানে যাবেন সেখানেই অসংখ্য বাঙালির সাথে আপনার দেখা হবে। শুধু সেবা গ্রহণকারী নয়, যারা সেবা দিচ্ছেন বা কাজ করছেন তাদের মধ্যেও বাঙালির সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। টাওয়ার হ্যামলেট বরায় মোট ৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২০ জন বাঙালি কাউন্সিলর রয়েছেন। রাস্তার নামফলক বাংলায় লেখা, দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা, এমনকি কাউন্সিলের বিভিন্ন বিভাগের নোটিশ বোর্ডে ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা লেখাও শোভা পাচ্ছে। এখানে রয়েছে ওসমানী স্কুল, কবি নজরুল স্কুল, বঙ্গবন্ধু স্কুল, বাংলা টাউন, শাহজালাল এষ্টেট, আলতাব আলী পার্ক এবং আরো কত কিছু। এক কথায় বাঙালির জন্যে কি নেই টাওয়ার হ্যামলেটসে! ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর। টাওয়ার হ্যামলেটস এ ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। দু'পা গেলেই এখানে মসজিদ পাওয়া যায়। এখানে জীবন যাপন করতে হলে ইংরেজী ভাষা জানার দরকার পড়েনা। ইংরেজী না জেনে এবং না বলে এখানে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়। এ সকল কারণে লন্ডনের বাইরে বসবাসকারী বাঙালিদের মনে টাওয়ার হ্যামলেটস, বিশেষ করে বাংলা টাউন ব্রিকলেনের প্রতি আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। যারা বাইরে কাজ করেন তারা অনেকেই ছুটির দিনে ব্রিকলেনে চলে আসেন, সারাদিন এখানে আড্ডা দিয়ে গোটা সপ্তাহের ক্লান্তি ভোলার চেষ্টা করেন। এখানে এলে তারা ফেলে আসা প্রিয় জন্মভূমির ছোঁয়া অনুভব করে পরিতৃপ্ত হন। বৃটেনের অন্যান্য শহর থেকে কোন পরিবার লন্ডনে এসে বসবাস করতে চাইলে টাওয়ার হ্যামলেটসকে তারা অগ্রাধিকার দেন। টাওয়ার হ্যামলেটসে যারা বাস করেন তারা কাউন্সিল কর্তৃক অন্য বরায় বাসগৃহ দেয়ার প্রস্তাবকে সবসময় চোখ বন্ধ করে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশ থেকে যে সকল বাঙালি এ দেশে বেড়াতে আসেন তাদের অনেকের কাছে ইষ্ট লন্ডন এলাকা এক স্বপ্নের জগত।মিনি বাংলাদেশে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে তারা বিদেশে স্বদেশের স্বাদ অনুভব করেন।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা এ দেশের সকল বাঙালি জানেন,এতে নতুনত্ব কিছু নেই এবং এ সবই আনন্দের কথা। তবে আমার মনে হয় একটু চিন্তা করলে আরো কিছু দিক দিয়ে বাংলাদেশের সাথে টাওয়ার হ্যামলেটস বা ইস্ট লন্ডন এলাকার অনেক সাযুজ্য আমরা দেখতে পাব। তখন হয়ত আমাদের এ আনন্দ বিষাদে পরিণত হতে পারে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দারা যে সকল সমস্যায় জর্জরিত সেগুলোর সাথে বাংলাদেশে বিরাজমান সমস্যাবলীর অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস বৃটেনের রাজধানী শহরের একটি বরা এবং অবস্থানগত দিক দিয়ে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্র সিটি অব ওয়েষ্টমিনিষ্টারের পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু অবস্থা এমন যে সিটি থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় ঢোকার পর রাস্তার নামফলক না পড়েই বুঝতে পারবেন আপনি একটি অবহেলিত জনপদে প্রবেশ করেছেন। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ঘরবাড়ি এবং মানুষের চেহারা সর্বত্রই এর ছাপ সুস্পষ্ট। রাস্তাঘাটে আবর্জনার স্তুপ, দোকানপাট জৌলুসহীন, মেরামতহীন ঘরবাড়ি এবং বেকার মানুষের সংখ্যাধিক্য লাকের চোখে পড়ার মত। বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো তরুণরা দল বেঁধে হাঁটছে অথবা কোথাও জটলা করছে। তাদের নিজেদের যেমন কোন দায় নেই, তেমনি তাদের প্রতিও মনে হয় নেই কারো দায়িত্ববোধ। ঢাকার মৌচাক বা মালিবাগের মোড়ে ভ্রাম্যমান তরুণদের সাতে এদের মিল রয়েছে আবার গরমিলও রয়েছে। মিল হচ্ছে উভয় দলই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন। তাদের বুকে বল ও মনে আশা দেয়ার যেন কেউ নেই। গরমিল হচ্ছে দু'দিক থেকে। ওরা তৃতীয় বিশ্বে বাস করে এবং গরীব হলেও বাংলাদেশ নামক একটি দেশের নাগরিক হিসেবে ওরা গর্ব করতে পারে। এরা উন্নত বিশ্বে বাস করে, কিন্তু শিকড়হীন পরগাছার মত। এ দেশে তাদের পরিচয় বাংলাদেশী হিসেবে, আবার বাংলাদেশে তাদের পরিচয় লন্ডনী হিসেবে। অর্থাৎ মনের জোর দিয়ে স্বদেশ বলে গর্ব করতে পারে এমন কোন ভূখন্ড পৃথিবীতে তাদের নেই। অবশ্য অঙ্গুলিমেয় কিছু বাঙালি তরুণ-তরুণী লেখাপড়ায় ভাল করছে, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়নি। বৃটিশ সমাজের সাথে প্রতিযোগিতা করে সেখানে যথাযোগ্য আসন দখল করার জন্যে চেষ্টা করছে। এ অসম প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও মূল্যায়ন না পেলেও সাহসের সাথে ময়দানে টিকে আছে। এরা ছাড়া অধিকাংশ বাঙালি তরুণের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

এর পরও অধিকাংশ বাঙালি টাওয়ার হ্যামলেটসে এলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষা, পদবি ও অর্থ-বিত্তে যারা নিজেদের অভিজাত শ্রেনীর লোক বলে মনে করেন, যাদের বৃটেনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা নেই এবং যারা ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করেন তাদের মনোভাব একটু ভিন্ন বলে আমার ধারণা। অবশ্য আমার মত যারা দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও টাওয়ার হেমলেটসে ছেলেমেয়ে নিয়ে মাথাগুঁজার ঠাঁই করতে না পেরে বাধ্য হয়ে অন্য বরায় গিয়েছেন তাদের ব্যাপার

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র। এ সকল ব্যক্তিত্ব টাওয়ার হ্যামলেটে আসেন সামাজিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশী মাছ আর শাক-শবজী নিতে। কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা বাস করেন অন্য এলাকায়। অনেকে আসেন চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা-বানিজ্যের সুবাদে। কাজ শেষ হলে চলে যান নর্থ লন্ডন, ওয়েষ্ট লন্ডন অথবা কমপক্ষে ওয়ালথামষ্টো এলাকায় অবস্থিত নিজ বাসগৃহে। ব্যাপারটা ঠিক ঢাকা শহরের মত। আভিজাত্যজ্ঞান যাদের টনটনে তারা কেউ পুরান ঢাকায় থাকতে চায়না। অর্থনৈতিক কারণে সেখানে থাকলেও পুরান ঢাকায় বাস করেন এ কথা বলতে তাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এখন আবশ্য ঢাকার ধানমন্ডি এলাকাকে আর তেমন অভিজাত পাড়া বলে বিবেচনা করা হয়না, এখন গুলশান, বনানী, বারিধারা তাদের স্বপ্নের আবাসস্থল।

বৃটেনের উঠতি অভিজাত শ্রেনীর কাছে টাওয়ার হ্যামলেটস বসবাসের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। সকল কারণ যে অযৌক্তিক তাও নয়। হাউজিং সমস্যা, অসুন্দর ও অসামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিনোদন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব ইত্যাদির পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা এর একটি বড় কারণ। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের যে সকল খবর লন্ডনের বাংলা পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় তা পাঠ করে মাঝে মঝে আমাদের গা শিউরে ওঠে। কয়েক বছর আগে ঢাকার সাপ্তাহিক বিচিত্রা, শেখ রেহানা কর্তৃক দখলের আগে, 'রাজনীতিবিদদের ছেলেমেয়েরা কে কোথায়' শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিল। সেখানে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করছে। তাদের মতে এর কারণ একটাই, বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ নেই। অথচ কে না জানে রাজনীতিবিদ এবং বিত্তশালীদের কারণেই বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন আজ সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের দখলে। টাওয়ার হ্যামলেটসের স্কুলগুলোর অবস্থা ঠিক একই রকম না হলেও এ ব্যাপারে বহু কথা আছে। এখানে সেখানকার মত সন্ত্রাস বা মাস্তানী নেই, আছে বর্ণবাদী হামলা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ। তবে তা নিয়ে কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত নয় এবং তা সর্বত্রই আছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের অভিভবকদের ভয় অন্যত্র। তাদের কথা হচ্ছে, স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা অকথা-কুকথা ও অকাজ-কুকাজ শিখে আসে। আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি তারা হয়ে পড়ে বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু বৃটিশ মূল্যবোধও তারা শিখতে পারেনা। ফলে তাদের অবস্থা হয় 'না ঘর কা না ঘাট কা'। বখাটে ছেলেদের সংখ্যা এখানে বেশী এবং হোমওয়ার্কের ব্যাপারে স্কুল থেকে তেমন চাপ থাকেনা । সেকেন্ডারী স্কুলে যাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা যেন হয়ে যায় এক ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ড্রাগস ব্যবসায়ীদের নিরাপদ টার্গেট হচেছ সেকেন্ডারী স্কুলের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা এবং ড্রাগস থেকে ছেলেমেয়েদের রক্ষার জন্যে অন্যান্য এলাকায় যে খবরদারি ও সতর্কতা রয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় তা নেই।

www.pathagar.com

পাঠকরা অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন যে এ সকল অভিযোগের কোনটিই একেবারে মিথ্যা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ সকল কথা যদি আংশিকও সত্য হয় তা হলে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। টাওয়ার হ্যামলেটসে ২০ জন বাঙালি কাউন্সিলর আছেন, আছেন বহু স্কুলশিক্ষক ও প্যারেন্টস গবর্ণর। কাউন্সিলের বিভিন্ন বিভাগে ছোট-বড় বিভিন্ন পদে কর্মরত বাঙালির সংখ্যাও কম নয়। অসংখ্য কমিউনিটি সংগঠন বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা ও সেবামূলক কাজের অঙ্গীকার নিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসে কাজ করছে। বাংলাস্কুল, সাপ্লিমেন্টারী স্কুল, ইভনিং স্কুলের সংখ্যাও এখানে কম নয়। সর্বোপরি আছেন আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। বাংলা পত্রিকার পাতায় বিভিন্ন সভা-সমিতির খবরা-খবর এবং আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতি পাঠ করে মনে হয় বৃটেনে বাঙালি কমিউনিটির উন্নতির জন্যে তারা জান-মাল বিলিয়ে দিচ্ছেন। এত জনশক্তি ও এত সুযোগ-সুবিধা থেকে আমরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছি? এ সব কিছুর নেট রেজাল্ট তাহলে কি? আমাদের ছেলেমেয়েরা কি মানুষ হচ্ছে? আমরা কেন আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত? রাস্তায় রাস্তায় বখাটে ছেলেদের এত আড্ডা কেন? কেন টাওয়ার হ্যামলেটসের কোথাও গাড়ি রাখলে গাড়ির কাঁচ ভেঙে ভেতর থেকে রেকর্ডপ্লেয়ার চুরি হওয়ার ভয়ে সবাই তা খুলে নিয়ে যান? কেন বাঙালি তরুণদের ড্রাগস ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার দায়ে জেলে যেতে হয়? প্রিজন সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করে দেখবেন, জেল হাজতে বাঙালির সংখ্যা কি হারে বাড়ছে? সরকার কি করলো সে বিচারে না গিয়ে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কি করছি তা ভেবে দেখা দরকার। কেউ রাগ করলে আমি দু:খিত, আমাকে সত্য কথা বলতে হবে। এখানেও আমরা ঠিক বাংলাদেশের স্টাইলে কাজ করছি। আমরা কেউ কাজ করতে চাই না। যাদের কাজ করার যোগ্যতাই নেই এবং শেখার বয়সও নেই তাদের কথা না হয় বাদ দিলাম। বাকিরা কি করছি? আসলে সমালোচনা এবং সরকারের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করতেই আমরা ওস্তাদ। সিলেটী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, কথায় বার্তায় সুপারিশ, মাঠা নেছতে খলই আনিছ। আমাদের অবাস্থা হচ্ছে সে রকম। আমরা চাই শুধু পত্রিকায় নাম ছাপাতে, ছবি ছাপাতে। আমরা সবাই নেতা হতে চাই, কর্মী হতে চাইনা। নেতৃত্বের জন্যেই আমরা পাগল, লবেজান। এ কারণেই সভা-সমিতিতে শ্রোতার চেয়ে বক্তা বেশী। বিশেষ অতিথিদের লিষ্ট তৈরী করতে উদ্যোক্তাদের হিমশিম খেতে হয়। আমরা কমিউনিটি নেতা, আমরা জানিনা আমাদের ছেলেমেয়েরা কোন ক্লাসে পড়ে। আমাদের সময় নাই তাদের নিয়ে বসার। আমরা সব সময় ব্যস্ত। কি নিয়ে ব্যস্ত? সভা-সমিতি নিয়ে ব্যস্ত, কোন্দল নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কোন্দল করি চেয়ারম্যান-সেক্রেটারী হওয়ার জন্য আর কেউ কোন্দল করি নির্বাচিত চেয়ারম্যান-সেক্রেটারীকে লেজে ধরে টেনে নামাতে। অবিকল বাংলাদেশী কায়দা। কারো সময় ব্যয় হয় কোন্দল করতে এবং কারো সময় ব্যয় হয় কোন্দল মিটমাট করতে। বাঙালি শিক্ষক, বাঙালি প্যারেন্টস গবর্ণর, বাঙালি অফিসার আছেন। কিন্তু তাদের মেধা, দক্ষতা এবং এ দেশের সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহারের চিন্তা বা পরিকল্পনা আমাদের নেই। এখন পর্যন্ত

www.pathagar.com

এ সকল যোগ্য লোকদের নিয়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর ফোরাম আমরা গড়ে তুললে পারিনি। যে দুয়েকটা ফোরাম আছে সেগুলো প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে তেমন সাড়া জাগাতে পারছেনা। অবশ্য শিক্ষিত ও পেশাজীবী বাঙালিদের কারো কারো ব্যাপারে অভিযোগ আছে, তারা বাঙালির স্বার্থের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পয়সার ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আসলে পয়সার ধান্দা কার নেই? অর্থনৈতিক কারণেই আমরা অধিকাংশ মানুষ এ দেশে এসেছি। সততার সাথে পরিশ্রম করে কেউ আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করলে তা অন্যায় নয়। ওপরদিকে তাদের অভিযোগ হচ্ছে, আমরা লেজে ধরে টানাটানি ও ল্যাং মরামারি পসন্দ করিনা। তাদের মতে, বাঙালি কমিউনিটি মানে দলাদলি ও গলাবাজি। ওসবে আমরা নেই, থাকতে চাইনা।

যাক সে সব কথা। আমাদের আসলে স্কুলে যেতেই ইচ্ছা হয়না । এমন কি প্যারেন্টস ইভনিং এ পর্যন্ত আমরা যেতে পারিনা বা যাইনা। কারণ সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ নেই, পত্রিকায় সে খবর ছাপা হবেনা। সুতরাং সেখানে গিয়ে কি লাভ? বরং বাংলাদেশ থেকে নেতা-নেত্রী এলে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমরা দৌড়ে যাই, দিনের পর দিন তাদের সেবায় সময় দেই। তাদের সাথে ছবি তুলি এবং সে ছবি ছাপাতে বাংলা পত্রিকাগুলোর অফিসে ধর্ণা দেই। বৃটেনের বাঙালিরা আমাদের ছবি দেখে তখন বাহ্‌বা দেবে। কি দরকার স্কুলে যাওয়ার! ১৬ বছর পার হলেই মেয়ে চলে যাবে শশুড় বাড়ি এবং ছেলেকে পাঠিয়ে দেব রেস্টুরেন্টে। সুতরাং অকাজে সময় নস্ট করার মানে নেই। মেয়েলী কায়দায় পরচর্চা করে অথবা আর কিছু না পেলে ইন্ডিয়ান ফিল্ম দেখে সময় কাঠানো আমাদের কাছে অধিকতর উপভোগ্য।

এতো বাঙালি টাওয়ার হ্যামলেটসে, কিন্তু এর পরও আমাদের ভবিষ্যত এ জন্যেই অন্ধকার। আমাদের পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির লোকেরাও এখানে আছে। তাদের দেখেও আমরা শিখতে পারছিনা। কেউ কেউ ভাবেন প্রতি বছর বৈশাখী মেলা, ৫টি বাংলা পত্রিকা, ২০ জন বাঙালি কাউন্সিলর, বাঙালি কিসে পিছিয়ে? কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা কি? তাদের উপরই আমাদের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। তাদের তৈরী করতে না পারলে আমাদের হারিয়ে যেতে হবে। মাল্টিকালচারেল দেশের কসমোপলিটান শহরে টিকে থাকার অসম যুদ্ধে আমরা এখনো ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার হয়ে আছি। মনে রাখবেন, বাংলাদেশী রাজনীতির জন্য জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ দিয়ে অথবা বাংলাদেশী কায়দায় পত্রিকার পাতায় গলাবাজী করে সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। দয়া করে টেলিটাবী ল্যান্ড থেকে নেমে এসে আমাদের ছেলেমেয়েদের দিকে একটু নজর দিন। আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মর্যাদার স্বাথে বৃটিশ সমাজে সমাসীন করতে হলে, বক্তৃতা নয়, গঠনমূলক কাজে নিজেদের মূল্যবান সময়, মেধা এবং জনশক্তিকে ব্যবহারের পথে সময় থাকতে সবাই এগিয়ে আসুন।

লন্ডন,১২ জানুয়ারী ২০০০

www.pathagar.com

বৃটেনে বাংলা শিক্ষার হালচাল

বৃটেন থেকে পাঁচটি বাংলা পত্রিকা বের হয়। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি এ গুলোর পাঠক কারা? আমাদের ছেলেমেয়েরা কি বাংলা পত্রিকা পড়ে? পড়লে তাদের সংখ্যা কত? আমি জানিনা পাঠকরা আমার সাথে কতটুকু একমত হবেন। আমার মতে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা পত্রিকা পড়েনা। যে দুয়েকজন পড়ে তারা শুধু শিরোনাম পড়েই পত্রিকা রেখে দেয়। এর কারণ সুস্পষ্ট। বাংলা পত্রিকা পড়ে তারা বুঝতে পারেনা এবং আরো বড় কথা হচ্ছে ,বাংলা পত্রিকা তাদের মনে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনা। যদি বাংলা ভাষাভাষী ছেলেমেয়েদের কাছে বাংলা পত্রিকার কোন আবেদন না থাকে তাহলে এ সকল পত্রিকার ভবিষ্যত কি?

অবশ্য ভবিষ্যতের চিন্তা করে পত্রিকার মালিকদের কেউ হয়তো পত্রিকা বের করছেন না। যারা পত্রিকা নামক হাতির খরচ বছরের পর বছর বহন করে যাচ্ছেন তারা ভবিষ্যতের থোড়াই কেয়ার করেন। এমনকি পাঠকদের কথা তারা কতটুকু চিন্তা করেন সে ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পত্রিকার মালিকগোষ্ঠী পাঠকদের রুচি বা মতামতের তোয়াক্কা করলে বৃটেনের বাংলা পত্রিকাগুলোর চেহারা অন্য রকম হতো। মালিকদের খরচ করার মত অর্থ আছে এবং পত্রিকার পেছনে সে অর্থ ব্যয় করে একটা আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন বলেই তারা পত্রিকা চালাচ্ছেন।

আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা পত্রিকা না বোঝার কারণ কি? এটা কি এ জন্যে যে বাংলা পত্রিকাগুলো খুব কঠিন ভাষায় লেখা হয়? আসলে তা মোটেই নয়। আসল কারণ হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা জানেনা এবং বাংলা শিখছেনা। আমি এর আগেও এ ব্যাপারে দুয়েকবার লিখেছি। কিন্তু আমাদের নীতিনির্ধারক ব্যক্তিবর্গ হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেননি। এ দেশে বাংলা শেখার বহু সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়েছে। বাংলা শেখানোর নামে অর্থ উপার্জনের বহু পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল পথ আমরা যারা কৌশলের সাথে ব্যবহার করতে পারছি তাদের নগদপ্রাপ্তির পরিমান মোটামুটি কম নয়। কিন্তু যাদের জন্যে এতো উদ্যোগ-আয়োজন তাদের অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে আমি বুঝতে পারছিনা। পাঠক হয়তো বলবেন, প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী জিসিএসই পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের অনেকে বাংলায় এ স্টার পাচ্ছে। এ দেশের শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে যারা 'এ' পায় তারা কি বাংলা জানেনা? শিক্ষাবোর্ড তো মামা-খালু নয় যে ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা তাদের 'এ' দিয়ে দিবে।

www.pathagar.com

আমি পাঠকদের সাথে একমত যে শিক্ষাবোর্ড তাদের মামা-খালু নয়। কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার রায় হচ্ছে 'এ' পাওয়ার পরও আমাদের খুব কম ছেলে এবং মেয়েই বাংলা শিখছে।

প্রশ্ন হচ্ছে এতো উদ্যোগ এতো আয়োজন সত্তেও বাংলা না শেখার কারণ কি? পাড়ায় পাড়ায় বাংলা স্কুল, মসজিদে মসজিদে বাংলা শেখার আয়োজন এবং মেইন স্ট্রীম স্কুলে বাংলা ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরে গৃহশিক্ষকরা ঘরে ঘরে গিয়েও বাংলা শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষা দেয়ার এসকল উদ্যোগ আয়োজন সবই কি তা হলে বৃথা যাচ্ছে? আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আমি যদি ভুল বলি তা হলে পাঠকগণ আমাকে শোধরে দেবেন। এ ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে ,যেখানে মা-বাবারা একটু সচেতন সেখানে ছাড়া আর কোথাও আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা শিখছেনা। না বাংলা স্কুলে, না মসজিদে এবং না মেইন স্ট্রীম স্কুলে। যারা কিছুটা শিখছে তারা শিখছে শুধুমাত্র মা-বাবার যত্ন ও চেষ্টার ফলে। কিন্তু কেন এ অবস্থা? যে মেয়ে বা ছেলে জার্মান ভাষা শিখছে উৎসাহ নিয়ে, ফরাসী ভাষা শিখছে আগ্রহের সাথে, বাংলা শিক্ষার সময় সে আগ্রহ এবং উৎসাহ যায় কোথায়? সবাই জানেন, তখন তার মধ্যে কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না,তার সকল উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়। এর কারণ কি আমরা কখনো অনুসন্ধান করে দেখেছি? কেন এ অবস্থা? এ জন্যে দায়ী কি আমাদের ছেলেমেয়ে, না কি এর দায় আমাদের? আমি ব্যক্তিগতভাবে এ জন্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের মোটেই দায়ী করিনা। আমার মতে এ জন্যে আমরা বাঙালী শিক্ষক ও অভিভাবকরাই দায়ী এবং এ দায় শতকরা একশ' ভাগই আমাদের।

আমার কথায় হয়তো বাংলা ভাষার সন্মানিত শিক্ষকবৃন্দ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তবে আপনাদের অবগতির জন্যে বলছি, আমি নিজেও পেশায় একজন শিক্ষক এবং আমি বাংলা পড়াই। সুতরাং এ সমালোচনা আমার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমার দোষ স্বীকার করে নিয়েই আমি এ ব্যাপারে কলম ধরেছি।

প্রথমেই দেখা দরকার আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কোন্ পরিবেশে বাংলা পড়াই এবং অন্যান্য ভাষা তারা কোন্ পরিবেশে শিক্ষা নেয়। যে কোন জিনিষ শেখাতে হলে এর জন্যে যথাযথ পরিবেশ তৈরি করতে হয়। এ দেশে এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়া হয় এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা নার্সারী স্কুল থেকেই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে ইস্ট লন্ডনের দুয়েকটি স্কুলে হয়তো ক্লাসরুমে বাংলা শেখার পরিবেশ রয়েছে। নতুবা অধিকাংশ বাংলা স্কুল, সাপ্লিমেন্টারী স্কুল এবং মসজিদে শিক্ষার পরিবেশ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মতে ছাত্রছাত্রীরা এ সকল স্থানে আসতে চায় না এবং না চাওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনেক কারণের মধ্যে ক্লাসরুমের পরিবেশ একটা বড় কারণ। বহু শিক্ষকের সাথে আমার এ ব্যাপারে আলাপ হয়েছে। তারাও আমার সাথে একমত যে এ সকল স্কুলে নিয়মিত

www.pathagar.com

হাজিরা দিয়ে নিছক সময় কাটানো ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের অন্যকোন লাভ হচ্ছেনা। এ ধরনের পরিবেশে, বিশেষ করে এ দেশে, শিক্ষা দেয়া যায় না। মা-বাবা ও অভিভাবকদের অনেকে এ কথা ভালোভাবে জানেন এবং বুঝেন। কিন্তু তাদের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই। অবশ্য কেউ কেউ এ কথাও মনে করেন যে ঘরে থেকে অথবা রাস্তায় গিয়ে দুষ্টুমি করার চেয়ে স্কুল বা মসজিদে ঘন্টা দুয়েক সময় কাটানো অনেক ভালো।

ক্লাসরুমের পরিবেশের মতই শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতি। কি ভাবে শিক্ষা দেয়া হবে বা শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা আলোচনা করতে গেলে দুটো বিষয় এখানে খুবই বিবেচনার দাবি রাখে। প্রথমেই আসে শিক্ষক প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উপকরণ। শিক্ষকদের বুঝতে হবে, কোন্ মান এবং কোন্ মানসিকতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকে আমি শেখাতে এসেছি, আমি কি শেখাতে চাই, কতটুকু শেখাতে চাই। আমরা বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জগন্নাথপুর বা ছাতকের কোন স্কুলের শিক্ষক নই। আমরা যাদের শিক্ষা দিচ্ছি তারা লন্ডনের প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাছে বিভিন্ন বিষয় শিখছে। এ সকল শিক্ষকের অসংখ্য দোষত্রুটি আছে, থাকতে পারে। কিন্তু একটি গুণ তাদের আছে, তারা যা শেখাতে চায় তা শেখাতে পারে। সবাই জানেন যে আমরা যখন আমাদের শিশুসন্তানদের তাদের হাতে তুলে দেই তখন তাদের অনেকে বাংলা-ইংরেজী কিছুই জানেনা। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই আমরা কি দেখি? আমরা দেখি আমাদের কচি কচি শিশুরা ইংরেজী বলা, পড়া এবং লেখা তিনটি জিনিষই শিখে ফেলেছে। এ থেকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাদের দক্ষতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। আমরা যখন আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখাতে যাই তখন এ কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এ কথা ভাবা ভুল হবে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা একেবারে গবেট ও মুর্খ অথবা তারা অশিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছে। আমাদের প্রতিটি সন্তানই মূল্যবান ও সম্ভাবনাময়। উপযুক্ত পরিবেশ ও যত্ন প্রদান করলে তারা এক একটি উজ্জল নক্ষত্র হতে পারে। অন্যান্য বিষয় যদি তারা শিখতে পারে তা হলে বাংলা শিখতে না পারার কোন কারণ নেই। অন্যরা এ কথা না বুঝলেও আমরা বাংলার শিক্ষকদের কথাটা বুঝতে হবে। আমাদের সন্তানরা আমাদের ভবিষ্যত। কোন ভাবেই আমরা তাদের অবহেলায়-অনাদরে নষ্ট হতে দিতে পারিনা। শুনেছি বাংলা শিক্ষকদের একটা সমিতি রয়েছে। সমিতির যারা কর্মকর্তা আমি এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে চাই। আমি জানিনা তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য কি অথবা তাদের কর্মতৎপরতার আওতা কতটুকু। বাঙালী স্কুল গবর্নরদেরও একটা তৎপর ফোরাম ইস্ট লন্ডনে রয়েছে। আমার মনে হয় তারা সবাই মিলে ইচ্ছে করলে বাংলাভাষা শিক্ষাপ্রদান কাজে জড়িত শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কাউন্সিলের বাই-ল্যাংগুয়াল এবং মাদার টাং এন্ড সাপ্লিমেন্টারী এডুকেশন বিভাগের সহযোগিতায় তারা শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে

www.pathagar.com

বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। কাউন্সিলের শিক্ষা বিভাগে যে সকল বাঙালী অফিসার কাজ করেন, এ ব্যাপারে তাদের নিকট থেকেও সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। আরেকটি বিষয় বলা দরকার। বিভিন্ন বাংলাস্কুলে যে সকল শিক্ষক কাজ করেন তাদের শিক্ষাপ্রদানের যোগ্যতা কতটুকু তা যেমন আমাদের দেখতে হবে তেমনি তাদের আমরা কত বেতন দেই তাও আমাদের বিবেচনা করা দরকার। ভালো বেতন ছাড়া উন্নত মানের শিক্ষা আশা করা যায়না। শিক্ষক ভালো হলেও তাকে যদি বেতন কম দেয়া হয় তা হলে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি পরিশ্রম করার প্রেরণা পান না। এটা তার দোষ নয়, এটাই বাস্তবতা। বাংলাস্কুল পরিচালনার সাথে জড়িত সবাই বিষয়টা বুঝেন না। যারা বুঝেন তাদের উচিত অন্য সবাইকে তা বুঝানো।

বাংলা শিক্ষার উপায়-উপকরন সম্পর্কে বলতে হলে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের অনেকের ধারণা বাংলাদেশে প্রকাশিত বই-পুস্তক দিয়ে এখানে বাংলাভাষা শিক্ষা দেয়া সম্ভব। আসলে এটা একটা অবাস্তব ধারণা। বাংলাদেশের জন্যে লেখা বই এখানকার ছেলেমেয়ের জন্যে মোটেই উপযোগী নয়। দ্বিতীয়তঃ এ দেশের ছাত্ররা যে পদ্ধতিতে পাঠগ্রহণে অভ্যস্থ বাংলা শিক্ষা দেয়ার সময় সে পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বেমালুম ভুলে যাই। আমরা শিক্ষক-অভিভাবক সবাই তখন একই সমতলে এসে দাঁড়াই। তৃতীয়তঃ বৃটেনে বাংলাভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে সকল সামগ্রী পাওয়া যায় এর অনেকগুলোই এ দেশের ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়। এর চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে এগুলো যে এ দেশের ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয় এ কথা বলার এবং বোঝার লোকও আমাদের মধ্যে খুব কম রয়েছেন। এ দেশে বাংলা বই-পুস্তক যারা লিখেছেন তারা সবাই পন্ডিত লোক। তাদের অনেকের হয়তো বাংলাদেশী ও বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা আছে এবং শিক্ষার উপর অনেকগুলো ডিগ্রিও রয়েছে। এর পরও আমি বলবো এ সকল বই-পুস্তক আমাদের ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়। এগুলো ঢাকার ছেলেমেয়ের জন্যে উপযোগী হতে পারে, লন্ডনের ছেলেমেয়ের জন্যে নয়। পাঠকরা আমার সাথে কতটুকু একমত হবেন আমি জানিনা। আমার মতে বৃটেনের বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা দৈনন্দিন যে সকল শব্দ শোনে ও ব্যবহার করে তাদের জন্যে লেখা বই-পুস্তকে সে সকল শব্দ খুব একটা পাওয়া যায়না। শুধু তাই নয়, জিসিএসই পরীক্ষার রাইটিং টেস্ট, লিসেনিং টেস্ট এবং রিডিং টেস্টে আমাদের ছেলেমেয়েদের বোধগম্য ভাষায় বাংলা লেখা ও বলা হলে তারা পরীক্ষায় আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারবে।

এ জন্যে এ দেশের লোকদের দোষারোপ করার কিছু নেই। এ জন্যে আমরাই দায়ী। মাঝে মাঝে কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত বাংলা লিফলেট বা পুস্তিকা বুঝতে আমার নিজেরই অসুবিধা হয়। একবার কথাপ্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের এক কর্মকর্তাকে কথাটা বলেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, ' আমরা যাদের বাংলা

www.pathagar.com

অনুবাদ করতে দেই তাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং বাংলাভাষার ব্যাপারে তারা পন্ডিত।' আসলে পন্ডিতদের হাতে পড়েই আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলাশিক্ষার বারোটা বাজছে। পন্ডিত নয়, আমাদের প্রয়োজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক যারা বাস্তবতা বোঝেন। রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন, 'সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে / সহজ করে যায়না লেখা সহজে।' ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে লেখা সহজ কাজ নয়। এ জন্যে গবেষণা ও অধ্যবসায় দরকার। পন্ডিত হলেই তা লেখা যায়না।

যারা আমাদের ছেলেমেয়ের বাংলাশিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেন এবং যারা মাঝে মাঝে এ নিয়ে বিভিন্ন সভামঞ্চে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন তারা যদি বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন তা হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

লন্ডন, ১৫ এপ্রিল ২০০০

www.pathagar.com

কে মৌলবাদী এবং কে নয়?

২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর নিয়ে বহু কথা বাজারে চালু আছে। আমার কাছে যে বিষয়টা সবচেয়ে হাস্যকর মনে হয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের প্রচার দফতরের পক্ষথেকে মৌলবাদ বিষয়ক পুস্তিকা বিতরন। বিরোধী দলের আন্দোলনকে মৌলবাদীদের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করার সরকারী এ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সরকারের জন্যে বোমেরাং হয়ে দেখা দেয়। এমনিতেই উসামা বিন লাদেনের নাম শুনলে মর্কিন প্রশাসনের গায়ে জ্বর আসে। সকল মুসলিম দেশ এবং ইসলামী কাজের সাথে উসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক আবিষ্কারের একটা প্রবনতা মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নিজে উসামা বিন লাদেনের প্রচারণায় নেমে পড়ে সে প্রবণতাকে উস্কে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট উসামা বিন লাদেনের কল্পিত সহযোগিদের হামলার ভয়ে সাভার ও জয়পুরা যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। কি সুন্দর যুক্তি ! একেই বলে এক ঢিলে দু পাখি শিকার। প্রচন্ড শক্তিধর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্ভয়ে গোটা দুনিয়া চষে বেড়ান, যেতে পরেননা শুধু সাভার। মার্কিন ও বাংলাদেশ প্রশাসনের এ অদ্ভূত প্রচারণা কে কতটুকু বিশ্বাস করেছেন আমি জানিনা। তবে খবরটা পাঠ করে আমি মনে মনে খুব হেসেছি।

শেখ হাসিনা তার বিরোধীদের মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না, তিনি নিজেও মার্কিন প্রশাসনের কাছে সন্দেহের উর্ধে নয়। সকল মুসলমানই মার্কিনী প্রশাসনের কাছে মৌলবাদী। অধিকন্তু মাথায় কালোকাপড় ধারন, বার বার হজ্বে গমন, নামাজ ও তসবিহ পাঠের মাধ্যমে তিনি মার্কিন প্রশাসনের কাছে তার গোড়া মৌলবাদী পরিচয় তুলে ধরেছেন। পক্ষান্তরে খালেদা জিয়া এসব থেকে অনেকটা মুক্ত আছেন। অতএব সাধু সাবধান!

আসল কথা হচ্ছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা বর্তমান যুগে এক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এক সময় তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবিরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদের বিরুদ্ধে এমনি ভাবে কথা বলতেন। এখন কেউ পুজিবাদকে মানবতার দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেননা, অথবা চিহ্নিত করার সাহস রাখেননা। এর কারণ কি? পুজিবাদ কি বর্তমানে মানবতার আর্শীবাদে পরিণত হয়েছে? পুজির শোষণ কি বন্ধ হয়ে গেছে? না কি কুমিরের সাথে বিবাদ করে জলে বাস করা সম্ভব নয়, এ উপলব্ধি থেকে পুজিবাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেন না? এ কথা ঠিক যে সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সাহায্য-

www.pathagar.com

সহযোগিতা এখন পুজিবাদের মোড়লদের নেতৃত্বে চলছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক নেতৃত্ব যাদের হাতে তাদের সাথে বিরোধ করে পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে টিকে থাকা কঠিন, এ সরল কথাটা তৃতীয় বিশ্বের বাম চিন্তা ধারার নেতৃবৃন্দ হঠাৎ করে যেনো বুঝে নিয়েছেন। তাই এতদিন যে বন্দুক পুজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাক করা ছিলো তা এখন অন্যদিকে ঘুরে গেছে। ওপর দিকে এতদিন পুজিবাদের বন্দুক ছিলো সমাজতন্ত্রের দিকে তাক করা। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর তাদের দৃষ্টি এখন ইসলাম বা মুসলিম বিশ্বের দিকে একক ভাবে নিবদ্ধ। বর্তমান অবস্থা এমন যে ডান-বাম নির্বিশেষে সকল মহলের কাছে মৌলবাদ বা ইসলাম হচ্ছে প্রধান দুশমন। যুক্তি বিজ্ঞানের ফর্মূলা অনুযায়ী দুশমনের দুশমন বন্ধু হওয়ার কথা। কিন্তু মৌলবাদের ক্ষেত্রে সে ফর্মূলা কাজে লাগেনি। এর অর্থ কি এই যে পুজিবাদী শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মানবতা এখন মুক্ত? নাকি পুজিবাদের পক্ষপুটে সমাজতন্ত্র সুখের নীড় বেঁধেছে?

বর্তমানে পন্ডিত এবং মুর্খ সকলের মুখে এক কথা, ঠেকাও মৌলবাদ। ডান-বাম নির্বিশেষ সবাই এক কথার সাথে একমত যে মৌলবাদ আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার জন্যে এক মারাত্মক হুমকি। যে করেই হোক একে প্রতিহত করতে হবে। আটলান্টিকের ওপার থেকে এর ডাক এসেছে এবং এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা তথা গোটা পৃথিবী যেনো সে ডাকে সাড়া দিয়ে জেগে ওঠেছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় সংস্থা, আশিয়ান সংস্থা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ আইন প্রনয়ন করেছে । কিছুদিন আগে একজন স্বনামধন্য বাঙালী কলামিষ্ট বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদির জন্যে মৌলবাদকে দায়ী করে সিরিজ নিবন্ধ লিখেছেন। তার মতে এ সকল দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার প্রধান কারণ হচ্ছে মৌলবাদ। মৌলবাদকে উৎখাত করতে না পারলে ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশলতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে নারী নির্যাতন, মাদকদ্রব্যের প্রসার এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশ উদ্বিগ্ন নয়? ইউরোপ এবং আমেরিকা কি এর বাইরে? বৃটেনে এবং আমেরিকায় কি আমাদের নারী সমাজ নিরাপদ? ড্রাগস প্রতিরোধ করতে বৃটেন প্রতিবছর কি পরিমাণ শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে এর হিসাব কি তার কাছে নেই? এখানেও কি একই কারণে এগুলোর প্রসার হচ্ছে? ইউরোপ এবং আমেরিকায় মৌলবাদ কি এতই শক্তিশালী?

মৌলবাদ যদি এতো মারাত্মক ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে। যারা মাঠে-ময়দানে মৌলবাদের বিরুদ্ধে খৈ ফোটান তারা বিষয়টা কতটুকু বুঝেন আমার জানা নেই। তবে তাদের অনেকের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় এ সম্পর্কে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই।

www.pathagar.com

বাংলা মৌলবাদ শব্দটি এসেছে ইংরেজী এলভঢটবণর্ভটফধ্রব শব্দ থেকে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত Advanced Dictonary of Current English এর মতে এর অর্থ হচ্ছে, "Maintenance of the traditional beliefs of the Christian Religion (Such as th accuracy of everything in the Bible)". অর্থাৎ ফান্ডামেন্টালিজমের অর্থ খৃষ্টধর্মের প্রচারিত বিশ্বাস সমূহের প্রতি আস্থাশীল থাকা। (যেমন, বাইবেলে যে সকল কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে সঠিক মনে করা)। ওপর দিকে "Encyclopaedia of Religion" গ্রন্থের দৃষ্টিতে "Fundamentalism is a sub-species of evangelicalism. The term originated in America in 1920 and refers to evangelicals who consider it a chief christian duty to combat uncompromisingly modernist theology and certain Secularizing cultural trends". অর্থাৎ মৌলবাদ হচ্ছে এভেঞ্জেলিক (সুসমাচার) আন্দোলনের একটি উপদল। ১৯২০ সালে আমেরিকায় শব্দটির উদ্ভব হয়। এ দ্বারা সে সকল এভেঞ্জেলিক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা মনে করেন, আধুনিক ধর্মতত্ত্ব ও সেকুলার সাংস্কৃতিক ধারাকে আপোসহীন ভাবে প্রতিরোধ করা খৃষ্টানদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মৌলবাদ শব্দটির উৎপত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। খৃষ্টানদের একটি উপদলকে উদ্দেশ্য করে সর্বপ্রথম তা ব্যবহৃত হয়। ১৯১০ সালে নয়েগ্রায় এক বাইবেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে খৃষ্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ বিশ্বাসগুলোকে সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্যে গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম হচ্ছে ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ও বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তনে মৌলবাদের সংজ্ঞা বদলে গেছে। 'মৌলবাদকে রুখতে হবে' বা 'ঠেকাও মৌলবাদ' বললে এখন আর কারো মনে খৃষ্টধর্মের কথা জাগেনা। বর্তমানে মৌলবাদ ইসলামের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। মার্কিন প্রোটেষ্টানদের কাছে ফান্ডামেন্টালিষ্ট শব্দটি ছিলো অহংকারের বিষয়। তারা এক সময় নিজেদের মৌলবাদী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। ১৯১৯ সালে তারা World Christian Fundamentalist Association প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীব্যাপী তাদের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়।

কখন কি ভাবে মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটি ইসলামের উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু হয়, এ ব্যাপারে The Runnymede Trust কর্তৃক প্রকাশিত Islamophobia: A challenge for us all নামক রিপোর্টে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মতে ১৯৫৭ সালে Middle East Journal সর্বপ্রথম ইসলামের ব্যাপারে মৌলবাদ শব্দটি ব্যবহার করে। এর পর ১৯৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর

www.pathagar.com

Anthony Burgess লন্ডনের অবজারভার পত্রিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত এক নিবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে বা বলতে মৌলবাদ শব্দটির পাইকারী ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এর দ্বারা ইসলামকে বুঝিয়ে থাকে। বিস্ময়ের বিষয় যে বহু মুসলমানও বুঝে না বুঝে শব্দটি ব্যবহার করেন।

কোন কোন পন্ডিত (?) অবশ্য এ কথা বলতে চেষ্টা করেন যে মৌলবাদ মানে ইসলাম নয়, বরং ধর্মান্ধতা। কখনো তারা 'রাজনৈতিক ইসলাম' এবং 'ধর্মীয় ইসলাম' এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বলেন যে তারা ধর্মীয় ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু আপনি এবং আমি শব্দটিকে কি ভাবে ব্যবহার করছি তা নিতান্তই গৌন বিষয়। গোটা দুনিয়া ব্যাপী এ শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয় সেটাই বড় কথা। ইউরোপ এবং আমেরিকার পত্র-পত্রিকা ফান্ডামেন্টালিজম বলতে কি বোঝায় তা আমাদের লক্ষ্য করা দরকার।

আমাদের এটা জানা দরকার যে ধর্মান্ধতা ইসলামে নেই। মুসলমান যদি ফেনাটিক হয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সে ইসলাম মেনে চলছেনা। তাকে বোঝানো এবং প্রয়োজনে প্রতিহত করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। ধার্মিকতা ও ধর্মান্ধতা যে এক জিনিস নয় তা যে কোন বোকা বা মুর্খও বুঝে।

যারা ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ বলতে ধর্মান্ধতাকে মিন করে সাফাই দেন তাদের ১ মার্চ '৯৭ তারিখে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত "I Believe in Islamophobia" নিবন্ধটি পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। সেখানে Peregrine Worsthorne সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে গোটা দুনিয়ার সকল মুসলমানকেই তারা নির্যাতন ও সন্ত্রাসের পক্ষের লোক বলে মনে করেন। সেখানে তিনি বলেন, " How Islam will react if Saddam Hussein, out of the blue, succeeded in dropping a nuclear bomb on Israel? Would Islamic people as a whole recoil in horror, or would they dancing in the street? Based on what we know of the Islamic world's reaction to the earlier atrocities of Saddam, I think we can guess at the answer. Just as not one reproach was heard from a single mosque about these atrocities, including genocide, so there would be not one word of reproach from a single mosque if he incinerated Tel Aviv by a sneake nuclear attack. Nor, in all likelihood, would there be any more if a city belonging to the great Satan, America, were to suffer the same fate... Contempory Islam... is a truly frightening force. When Nazis erupted in a

www.pathagar.com

Christian country, the other Christian countries combined to smother that evil. The other Muslim countries have done very little to smother either Saddam or the Iranian Ayatollah and still less to put down terrorism. To worry about contemorary Islam is not mad, It would be mad to do otherwise.'

অর্থাৎ 'সাদ্দাম হোসেন যদি অকস্মাৎ ইসরাইলে এটম বোমা ফেলে দিতে সক্ষম হয় তা হলে মুসলিম বিশ্বে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে? মুসলিম বিশ্ব কি তখন ভয়ে চুপসে যাবে, না তারা রাস্তায় নৃত্য করবে? সাদ্দামের অতীত অন্যায়ের মোকাবেলায় তারা কি করেছে তা থেকে এ প্রশ্নের জবাব আমরা অনুমান করতে পারি। যে ভাবে একটা মসজিদ থেকেও সাদ্দামের গণহত্যাসহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শোনা যায়নি, ঠিক সে ভাবে সে যদি তস্করের মত এটমিক বোমা হামলা চালিয়ে তেল আবিব জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় তা হলে কোন একটি মসজিদ থেকে এর নিন্দা জানিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হবেনা। 'গ্রেট শয়তান' আমেরিকার কোন শহরে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে একই অবস্থা হবে। বর্তমান সময়ের ইসলাম সত্যিকার ভাবেই এক ভীতিজনক শক্তি। হিটলার যখন কোন খৃষ্টান দেশ আক্রমন করে তখন অন্যান্য খৃষ্টান দেশসমুহ সে অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সাদ্দাম বা ইরানী আয়াতুল্লাকে প্রতিরোধ করতে অন্যান্য মুসলিম দেশ সামান্যই কাজ করেছে, এবং টেররিজম দমনে তারা কিছুই করছেনা। বর্তমান সময়ের ইসলাম নিয়ে দুশ্চিন্তা করা পাগলামি নয়। দুশ্চিন্তা না করাই বরং পাগলামি।'

স্যামুয়েল হান্টিংটন এর লেখা "The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order" একটি বহুল আলোচিত বই। হার্ভাড ইউনিভার্সিটিতে পেশকৃত আলোচনার উপর ভিত্তি করে তিনি বইটি লিখেছেন। এ বইয়ে তিনি সত্য কথাটা খোলামেলা ভাবে বলে দিয়েছেন। বইটির ২১৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, The Underlying problem for the west is not Islamic Fundamentalism. It is Islam, a different civilisation whose people are convinced of the superiority of their culture and are obsessed with the inferiority of their power.' অর্থাৎ ' পাশ্চাত্যের আসল সমস্যা ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম নয়, বরং সমস্যা হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা এবং এর অনুসারীরা তাদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে যে তারা নিম্নপর্যায়ে অবস্থান করছে, এ কথাটা তাদের মনে বদ্ধমুল হয়ে আছে।'

www.pathagar.com

স্যামুয়েল হান্টিংটন এর এ বক্তব্যের পর এ কথা বলার আর অবকাশ নেই যে মৌলবাদ বলতে ইসলাম নয়, বরং ইসলামের নামে ধর্মান্ধতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকার কাছে মৌলবাদ মানে ইসলাম, পূর্ণইসলাম। মৌলবাদী মানে সকল মুসলমান। ইসলামী ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি সবকিছুই তাদের লক্ষ্যবস্তু। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানে পুজিবাদী সভ্যতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানে বস্তুবাদী সভ্যতা। এ সভ্যতার জন্যে বর্তমানে ইসলামই একমাত্র সম্ভাবনাময় হুমকি। নিউ ওয়ার্লড অর্ডারের নেতা তাই গোটা দুনিয়ার সকল মানুষকে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ প্রয়াস যে কিছুটা সফল হচ্ছে এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ডান-বাম, মুসলিম(?)-অমুসলিম সবার কণ্ঠে তাই শোনা যাচ্ছে 'ঠেকাও মৌলবাদ'।

যারা সত্যিকার মুসলমান এবং যারা শোষণ ও নির্যাতন মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন তাদের এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। আমাদের দেখা দরকার পুজিবাদ বা বর্তমান সভ্যতা পৃথিবীকে কি দিয়েছে? দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র, এবং দুনিয়াজোড়া হতাশা ও অবিশ্বাস ছাড়া তাদের গর্ব করার কি আছে? দুনিয়ার মানুষকে এ সভ্যতার অভিশাপ এবং পুজির শোষণ থেকে মুক্তি দিতে হলে কি করা দরকার সে প্রশ্নের উত্তর আরেক দিন অন্বেষণের অঙ্গীকারসহ আজকের লেখা এখানেই শেষ করছি।

লন্ডন ২৪ এপ্রিল ২০০০

www.pathagar.com

লন্ডনী কন্যা ও কন্যাদায়গ্রস্থ মা-বাবা

লন্ডনী কন্যা নাটক দেখার বা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। যারা দেখেছেন তাদের কাছ থেকে জেনেছি, বৃটেনে বসবাসকারী সিলেটী জনগোষ্ঠীকে অত্যন্ত খরাপ ভাবে সেখানে চিত্রিত করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় নাটকটি প্রচারিত হওয়ার পর সিলেটে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মিছিল, প্রতিবাদ সভা এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। অবশ্য নাটকের লেখক শাকুর মজিদের কপাল ভালো তিনি সাঈদী নন। তিনি মাওলানা সাঈদীর মতো মৌলবাদী হলে সিলেটের মাটি তার জন্যে হারাম হয়ে যেতো।

শাকুর মজিদের সাথে আমার পরিচয় নেই, তার কোন লেখাও আমি পড়ে দেখার সুযোগ পাইনি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, তিনি কন্যা বা পুত্র দায়গ্রস্থ কোন পিতা নয় এবং কন্যা বা পুত্র দায়গ্রস্থ পিতা-মাতার সমস্যা অনুধাবন করার জন্যে যে সংবেদনশীল মনের দরকার তা আল্লাহ্ তাকে দান করেননি। ছোটবেলা আমরা ভেকের গল্প পড়েছি। আরো অনেকে হয়তো গল্পটি পড়েছেন। একটি ডোবায় ছিল কয়েকটি বেঙ। এক দল দুষ্টু ছেলে নিছক ফুর্তি করার জন্যে বেঙগুলোর প্রতি ঢিল মারতে শুরু করে। ঢিলের চোটে অতীষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বেঙ ছেলেগুলোর উদ্দেশ্যে বলে, দয়া করে তোমরা ঢিল মারা বন্ধ কর। তোমাদের কাছে বিষয়টা অর্থহীন আনন্দ, কিন্তু আমাদের জন্যে তা বাঁচা-মরার প্রশ্ন। যারা বিলাত প্রবাসীদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেন তারা ওই গল্পের ছেলেদের মত। শাকুর মজিদ অবশ্য লন্ডনী কন্যা নাটক নিছক আনন্দের জন্যে লিখেননি। এ নাটকের মাধ্যমে সামান্য হলেও তার কিছু নগদ প্রাপ্তি ঘটেছে। নাটক লেখক হিসেবে মানুষের কাছে বাড়তি কিছু আদর-কদর পাবেন সে আশা-আকাঙ্খাও তার মনে ছিল। তবে দর্শকদের তিনি অবশ্যই আনন্দ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তার নাটক নিয়ে সিলেটে এ রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে একথা তিনি হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

বাঙালির বিলাত আগমনের সাধ শেষ হয়নি, জানিনা কোনদিন তা শেষ হবে কি না। এ দিক দিয়ে সিলেটবাসীর অবস্থান শীর্ষে। বাংলদেশে এমন তরুণের সংখ্যা খুব কমই আছে যারা বিলাত আসতে চায়না। আমরা যারা শখে শখে এসে বিপদে পড়েছি তারা যখন দেশের তরুণদের দেশে থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে চেষ্টা করি তখন তারা মনে করে আমরা তাদের সাথে দুশমনী করছি। তাদের মতে, আমরা তাদের কল্যাণ

www.pathagar.com

চাইলে তাদের জন্যে সহজেই একটা ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু আমরা কতটুকু সুখে আছি তা আমরা জানি। মাঝে মাঝে আমি বলি, বৃটেন হচ্ছে দিল্লী কা লাড্ডু। যে খেয়েছে সেও পস্তায়, যে খায়নি সেও পস্তায়। আমাদের ছেলেমেয়ের কথা মনে হলে সে আফসোস আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ছেলেমেয়ে বড় হতে থাকে আর আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। বিয়ে-শাদী দেয়ার পর তা কিছুটা প্রশমিত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ে দেয়ার পরও উদ্বেগ শেষ হয়না। আমি নিশ্চিত যে শতকরা ৯৯ জন মা-বাবা আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেন। প্রায় দশ বছর যাবত আমি ইস্ট লন্ডনে বাস করছি। শুধু ইস্ট লন্ডন নয়, গোটা বৃটেনের অসংখ্য মা-বাবার সাথে আমার যোগাযোগ আছে। তারা তাদের সুখে দুঃখে আমাকে শরিক করেন। তাদের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস আমার মনেও কান্না ও দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করে। এ সকল উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত মা-বাবার সেন্টিমেন্ট নিয়ে যারা হাসি তামাশা করে তারা মানুষ হিসেবে উন্নত মানের নয়। মননের চর্চা করলেও তাদের মধ্যে মননশীলতা যে নেই তা চোখ বোজে বলে দেয়া যায়। এদেশে শাকুর মজিদের বিবাহযোগ্য কেউ হয়তো নেই। অথবা থাকলেও তিনি হয়তো এ দিক দিয়ে মহা ভাগ্যবান যে এ নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নয়। এ জন্যেই বোধহয় তিনি লন্ডনী কন্যা নাটক লিখতে সাহস দেখিয়েছেন।

বাঙালী লন্ডনী কন্যার জন্যে পাগল, লন্ডনী পয়সার জন্যেও পাগল। কিন্তু তারা লন্ডনীদের আদর করতে, সম্মান দিতে রাজী নয়। বাংলাদেশে লন্ডনীদের যে চিত্র অংকণ করা হয় তা আমাদের জন্যে সম্মানের নয়। ডিশ ওয়াশিং আর ওনিয়ন কোম্পানীর ম্যানেজারগিরি নিয়ে বাংলাদেশে হরহামেশা তুচ্ছ-তচ্ছিল্য করতে শোনা যায়। স্বদেশগামী যাত্রীদের পেশা শেফ, কুক ইত্যাদি দেখে ঢাকা বা সিলেট এয়ারপোর্টের কর্মকর্তাদের সবসময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রবাসীদের নিকট থেকে দান-দক্ষিনা এবং উপরি আদায়ে তারা কখনো পিছিয়ে নেই। তাদের ধারণা, এ দেশে যারা আছে সবাই অশিক্ষিত ও মুর্খ। হতে পারে প্রথম যারা বিলাত আসেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। কিন্তু বর্তমানে যারা আসছেন তারা সবাই শিক্ষিত। তারাও অনেকে এসে ডিশ ওয়াশিং আর ওনিয়ন কোম্পানীতে কাজ করছেন। এতে লজ্জার কিছু নেই। এদেশে এসে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি যে পেশা হিসেবে কোন পেশাই অপমানের নয়। চুল কাটলে নাপিত আর মাছ বিক্রি করলে জেলে এ ধরনের মানসিকতা এ দেশে নেই। থানার দালালী ও টাউট-বাটপাড়ি করে বাংলাদেশে যারা অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছেন তারা যখন ডিশ ওয়াশিং আর ওনিয়ন কোম্পানীর কথা বলে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তখন তাদের মুর্খতা দেখে করুণা হয়। তা ছাড়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা যা-ই থাক, আমাদের ছেলেমেয়েরা এ দিক দিয়ে মোটেই পিছিয়ে নেই। এখানে প্রতি বছর শত শত বাঙালী ছেলেমেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরুচ্ছে। অধিকন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা সে সব কলেজ বা ভার্সিটীতে লেখাপড়া করছে যে সব কলেজ বা ভার্সিটীতে লেখাপড়ার জন্যে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা

www.pathagar.com

পাগল হয়ে আসে।

শিক্ষা আমাদের আছে, সাথে সাথে আমাদের কষ্টও আছে। এ কষ্ট ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে নিয়েই। কিন্তু লন্ডনী কন্যার মা-বাবাদের কষ্টের কথা লেখার জন্যে কোন শাকুর মজিদ নেই। আমাদের বলা হয় আমরা আমাদের মেয়েদের বিক্রি করতে দেশে নিয়ে যাই। কথাটার মধ্যে লেশমাত্র সত্যতা নেই। এটা একটা মিথ্যা অপবাদ। কারো মধ্যে এ ধরনের মনোভাব থাকলে সে ব্যতিক্রম। এ রকম ব্যতিক্রম লোক বাংলাদেশেও আছে যারা ছেলেমেয়েকে পন্যসামগ্রীর মত মনে করে।

যারা এ দেশের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছেন তারা অবশ্য ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই আছেন। তাদের মেয়ে যদি শিখ ছেলের সাথে ঘর বাঁধে অথবা ছেলে যদি হিন্দু মেয়ের সাথে লিভ টুগেদার করে তা হলে তাদের কিছু যায় আসেনা। সমস্যা হচ্ছে আমরা অধিকাংশ বাঙালী বা সিলেটী এখনো অতটুকু 'আধুনিক' (?) হতে পারিনি। বাংলাদেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি আছেন যারা অমুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা করে গর্বিত। আমাদের কাছে তা গর্বের নয়, অপমানের। আমরা চাইনা আমাদের নাতি-নাতনিরা অমুসলমানের ঔরসে জন্ম নিয়ে অমুসলমান হোক। বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের উদ্বেগের এটা একটা বড় কারণ। আমরা দেখছি আমাদের ছেলেরা শিখ মেয়েকে ঘরে এনে তুলছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি আমাদের মেয়েরা আফ্রো-ক্যারিবিয়ান ছেলের হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে। আমার পাশের বাড়ির মেয়ে যদি প্রেমিকের হাত ধরে বেরিয়ে যায় তা হলে ছেলেমেয়ের মা অথবা বাপ হিসেবে আমি শংকিত না হয়ে পারিনা। আমার এ উদ্বেগ বা শংকা যদি শাকুর মজিদরা না বুঝেন তা হলে সেটা তাদের মুর্খতা। তাদের জন্যে আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

সত্য কথা হচ্ছে, আমরা প্রথমে এ দেশে আমাদের মেয়েদের জন্যে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করি। কিন্তু পোড়া কপাল আমাদের, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা পসন্দসই পাত্র পাইনা। কেন পাইনা সে আরেক কাহিনী। অনেক সময় পত্র-পত্রিকায় পাত্র চাই বিজ্ঞাপন দিয়েও কাজ হয়না। তখন বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের মেয়েদের নিয়ে দেশে যাই। বিবাহযোগ্যা মেয়ে নিয়ে দেশে গিয়ে আমরা কি যে বিপদে পড়ি তা একমাত্র তারাই বলতে পারেন যারা কখনো মেয়ে নিয়ে দেশে গেছেন। এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথে মধুর চাকে পিপড়া যেভাবে লেগে থাকে ঠিক সে ভাবে ঘটকরা আমাদের পিছু নেয়। হাটতে বসতে সব সময় ওরা আমাদের পেছনে লেগে থাকে। ওদের জন্যে কোথাও নিরিবিলি বসার বা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ আমরা পাইনা। এটা কতটুকু যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগীরা শুধু বুঝবেন। বাইরের ঘটকদের পাশাপাশি রয়েছে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের চাপ। পাত্র উপযুক্ত হোক বা না হোক, আমার মেয়ে তার ছেলেকে পসন্দ করুক বা নাই করুক, তিনি যেহেতু আমার নিকটাত্মীয় সেহেতু তার ছেলের কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে। দু দিনের জন্যে দেশে গিয়ে এ ধরনের বহুমুখি চাপে পড়ে

www.pathagar.com

আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাই তখন অনেক সময় আমরা অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকি। যারা দেশে আছেন তারা আমাদের সমস্যা বুঝতে পারেন না, তাদের জন্যে বুঝতে পারা সহজও নয়। এ জন্যে কে দায়ী? লন্ডনী কন্যা, তার বাপ-মা, না তারা যারা লন্ডনী কন্যাকে বধু বা পুত্রবধু হিসেবে দেখতে চান ? লন্ডনী মেয়ে নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার দায় কোনক্রমেই বিলাত প্রবাসী লোকদের উপর চাপানো যায়না। এর জন্যে শতকরা একশ' ভাগ দায়ী বাংলাদেশের সে সব লোক যাদের নিজে বিলাত আসা বা ছেলে-ভাতিজাকে বিলাত পাঠাবার জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আরেকটি বিষয় আমরা অনেকে জানিনা অথবা জানলেও খেয়াল করিনা। হিন্দু সমাজের যৌতুক বা পণপ্রথা এবং মুসলমানদের মোহরানা এক জিনিস নয়। অনেক সময় দুটোকে এক করে নিয়ে আমরা তালগোল পাকিয়ে ফেলি। পণ বা যৌতুক বরপক্ষের দাবির প্রেক্ষিতে কন্যাপক্ষ আদায় করে থাকে। পক্ষান্তরে মোহরানা বরের পক্ষথেকে কনেকে প্রদান করা হয়। ইসলামী বিধান মতে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব। কন্যার পক্ষথেকে মা-বাবা যদি বেশী মোহরানা দাবি করেন এবং বরপক্ষের সে সঙ্গতি থাকে তা হলে এতে দোষের কিছু নেই। আমরা লন্ডনী মা-বাবারা যা দাবি করি এর নাম মোহরানা, পণ বা যৌতুক নয়। আবার সে মোহরানার একটা বড় অংক পর্যায়ক্রমে আদায়ের শর্তে বকেয়া পড়ে থাকে। মোহরানা বাবদ আদায়করা অর্থ মা-বাবারা ভোগ করিনা, তা কন্যা-জামাতার হাতেই আমরা তুলে দেই।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমরা বেশী অংকের মোহরানা দাবি করে থাকি। এ কথা কি বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়? আজকাল বাংলাদেশের বিয়ে-শাদীতে দুলাখ পাঁচলাখ টাকা মোহরানা কোন ব্যাপারই নয়। কমপক্ষে সে অনুপাতে এ দেশে মোহরানা আদায় করতে হবে। তা ছাড়া আজকাল যে হারে বিয়ে-শাদী ভাঙছে সে দিক বিবেচনা করলে অধিক মোহরানা অনেক সময় বিয়ের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। এ জন্যে অনেক মা-বাবা মেয়ের বিয়েতে অধিক মোহরানা দাবি করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, মেয়ের জন্যে মোহরানা দাবি করা মেয়েকে পণ্যসামগ্রী বানানো নয়। তা ছাড়া আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে আমি আপনাকে বাধ্য করছিনা। আপনার সঙ্গতি না থাকলে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে আসবেন না। কে আপনাকে দিব্যি দিয়েছে যে আমার মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে?

দেশের মানুষের কাছে লন্ডনীরা খারাপ, লন্ডনী কন্যাও খারাপ। দেশে গেলে আমরা লন্ডনী, বিলেত এলে বাংলাদেশী এথনিক মাইনরিটি গ্রুপের সদস্য - এটাই আমাদের পরিচয়। মনে হয় আমাদের কোন স্বদেশ নেই। দেশ থেকে লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ - সবাই এ দেশে আসেন, আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বিলাত ঘুরে বেড়ান, তারপর বিপুল অর্থ ও মাল্য নিয়ে দেশে ফিরে যান। দেশে গিয়ে আমাদের কথা তারা ভুলে যান। যারা মনে রাখেন তারা শাকুর মজিদ বা সুরত মিয়ার হত্যাকারীদের মত আমাদের মনে রাখেন। আপনি যদি চান আপনাকে কেউ ভিন্নভাবে স্মরণ করুক তা হলে এ জন্যে আপনাকে কথা বলতে হবে।

লন্ডন ২২ মে ২০০

www.pathagar.com

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী?

বৃটেনে বাংলাভাষা শিক্ষার সাথে জড়িত সুধীমহলের উদ্দেশ্যে আমার প্রশ্ন, আমরা সিলেটীদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী?

টাওয়ার হ্যামলেটস বরার মাদার টাং ও বাইল্যাঙ্গুয়াল বিভাগে কর্মরত সকল বাঙালী বিভিন্ন ভাবে বাংলাভাষা শিক্ষার সাথে জড়িত রয়েছেন। এ ছাড়া গোটা বৃটেনের বিভিন্ন স্থানে উইকেন্ড স্কুল, ইভনিং স্কূল, সাপ্লিমেন্টারী স্কুল, প্রাইভেট স্কুল ও কাউন্সিল পরিচালিত স্কুলগুলোর মধ্যে বহু স্কুলে বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়। এ সকল স্কুলে কর্মরত শিক্ষকরা সবাই বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন। তারা সকলের কাছেই আমি প্রশ্নটি রাখতে চাই। যারা এ লেখা পড়বেন তারা দয়া করে পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রকাশে এগিয়ে এলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো।
সত্যি কথা বলতে কি প্রশ্নটি আমি নিজেকে বহুবার করেছি। কিন্তু এর সঠিক উত্তর খুজে পাইনি। আমি টাওয়ার হ্যামলেটস ও নিউহাম বরার বিভিন্ন স্কুলে বাংলা শিক্ষা দেই। বাংলা শিক্ষা দিতে গিয়ে অনেক সময় আমার ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই আমাকে লাজওয়াব হয়ে যেতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে দুয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

একবার এক স্কুলে আমার ছাত্রছাত্রীকে বাক্যরচনা করার জন্যে কয়েকটি শব্দ দেই। শব্দগুলো ছিল আমি, তুমি, মেঘ, আকাশ। এক জন ছাত্রী শব্দগুলো দিয়ে এ ভাবে বাক্য তৈরি করেঃ আমি বাংলা হিকতে আইছি, তুমি আও, মেঘ ফড়ছে, আকাশ লিলুয়া। মেয়েটি যে সকল সিলেটী শব্দ ব্যবহার করেছে সবগুলো আমি কেটে দিলাম। এর মানে একটি বাক্যও তার শুদ্ধ হয়নি। এতে মেয়েটি খুব আহত হয়ে বললো, 'বুঝলামনা স্যার কি হল। আমরাতো ঘরে মা-বাবার সাথে এ ভাবেই কথা বলি।'

আমি তাকে বললাম, 'তুমি লিখেছ সিলেটী বাংলা, লিখিত বাংলা নয়। লিখিত বাংলায় মেঘ পড়েনা। মেঘ মানে ইংরেজী ক্লাউড এবং ইংরেজী রেইন মানে বৃষ্টি। মেঘ আকাশে উড়ে এবং বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়ে। আকাশ লিলুয়া নয়, আকাশ নীল। তুমি আও নয়, তুমি এস। আমি বাংলা হিকতে আইছি নয়, আমি বাংলা শিখতে এসেছি।'
মেয়েটি আমার সব কথা মেনে নিলেও দুটো আপত্তি উত্থাপন করলো। বললো, 'আপনি যা বলছেন সেটা ঢাকাইয়া বাংলা। ঢাকার বাংলা আমি কেন শেখবো? এ ভাষায় তো

www.pathagar.com

আমার মা-বাবা বা দাদী-নানী কথা বলেন না। আমি বাংলা শিখতে এসেছি মাদার টাং হিসেবে। দাদী-নানী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে যাতে ভালভাবে কথা বলতে পারি সে জন্যে। ঢাকাইয়া বাংলা শিখে আমার কি লাভ? তা ছাড়া ওই 'বৃষ্টি' শব্দটা আমার মাথায় ঢুকছেনা। আম্মা সব সময় বলেন, মেঘ আইছে - মেঘ আইছে। আপনি বলছেন মেঘ মানে ক্লাউড। কথাটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।'

আরেকটি স্কুলের ঘটনা। সে স্কুলে বাংলার শিক্ষক নেই। স্কুলের মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজের ভাপ্রাপ্ত শিক্ষক মি. ব্রাউন আমাকে জানেন। তিনি আমাকে তার ছাত্রদের জিসিএসই স্পিকিং টেস্ট নেয়ার অনুরোধ জানান। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হই এবং ছাত্র-ছাত্রীর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে এক দিন স্কুলে যাই। স্কুলে গিয়ে যখন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপ করছি তখন আসন্ন স্পিকিং টেস্ট নিয়ে তাদের চিন্তিত দেখে মি. ব্রাউন অবাক হয়ে তার ছাত্র-ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা তোমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষায় তোমরা সব সময় কথা বলো। মাতৃভাষায় কথা বলতে ভয় পাওয়ার কারণ কি?' মি. ব্রাউনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি তাকে বললাম, 'স্পিকিং টেস্টে ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলতে হবে। কিন্তু আমরা কথাবার্তার সময় সে বাংলা ব্যবহার করিনা। এ দেশের অধিকাংশ বাঙালী সিলেটী বাংলায় কথাবার্তা বলে।' আমার এ ব্যখ্যা মি. ব্রাউনকে আরো অবাক করে দেয়। বিষয়টা তার জানা ছিলনা। তিনি দুঃখ করে বললেন, তা হলে তার ছাত্র-ছাত্রীরা স্পিকিং টেস্টে তেমন সুবিধা করতে পারবেনা। আমার জানা মতে এ দেশে যারা বাংলা শিক্ষা দেন তারা সবাই কমবেশী এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মূখীন হন। বাংলায় কথা বললে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারেনা। তারা বলে, 'স্যার, ঢাকাইয়া কেন বলেন?' তাদের কাছে বাংলা হচ্ছে ঢাকার ভাষা এবং তাদের মাতৃভাষা হচ্ছে সিলেটী ভাষা। ঢাকার ভাষা তারা বুঝেনা, বলতেও পারেনা। আমার মনে আছে, এ দেশে বাংলা শিক্ষা দেয়ার বিড়ম্বনা বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী একবার একটি ঘটনা বলেছিলেন। অনেকদিন আগের শোনা ঘটনাটি মনে হয় এ রকম ছিল। তিনি একদিন একটি ছাত্রকে দাঁড়াবার জন্যে বার বার বলছেন। কিন্তু ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে, কোন সাড়াই দিচ্ছেনা। অবশেষে বিরক্ত হয়ে যখন বললেন 'স্ট্যান্ড আপ' তখন সে চট করে দাঁড়িয়ে গেল। বৃটেনে বাংলা শেখাতে গিয়ে আমরা যে অসুবিধার মুখোমুখি হই দেশে সিলেটের শিক্ষকদের সে অসুবিধার সম্মূখীন হতে হয়না। সিলেটের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা বুঝে এবং লিখতে ও বলতে পারে। কিন্তু বৃটেনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি উপরে যেসব কথা বলেছি এর মধ্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। বাংলা ভাষার শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ মা-বাবারা সবাই এক বাক্যে এর পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন বলে আমার বিশ্বাস। এ থেকে কি আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছব যে সিলেটীদের মাতৃভাষা সিলেটী ভাষা, বাংলা ভাষা নয়? সম্মানিত সুধীবৃন্দ এ ব্যাপারে কি বলেন?

প্রাসঙ্গিক ভাবে এ সম্পর্কে আরো কতিপয় প্রশ্ন এসে যায়। সিলেটী ভাষা বলে কি কোন ভাষা আদৌ আছে? সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস এ ব্যাপারে কি বলে? এ সম্পর্কে

www.pathagar.com

সিলেটের ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত কি? সিলেটে যদি সিলেটী ভাষা চালু না করা যায় তা হলে তা বৃটেনে চালু করার যৌক্তিকতা কোথায়? এ সকল প্রশ্নের জবাব অন্বেষণ করা আমাদের জন্যে খুবই জরুরী। আমি আশা করি এ দেশে বসবাসকারী সম্মানিত সুধীবৃন্দ এ সব বিষয়ে তাদের মূল্যবান অভিমত প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। আমি শুধু দুয়েকটি বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি।

সিলেটী ভাষা বলে কোন ভাষা আছে কি নেই এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে যেতে হবে মানুষের কাছে, পন্ডিতদের কাছে নয়। ভাষা পন্ডিতরা সৃষ্টি করেন না, ভাষা সৃষ্টি হয় মানুষের মুখ থেকে। পন্ডিতরা ভাষার লিখিত ব্যাকরণ তৈরি করেন এবং এর লিখিত রূপ দান করেন। সিলেটী মানুষের কাছে গেলেই বোঝা যায় তারা যে ভাষায় কথা বলেন তা বাংলা নয়। যারা জোর করে বলেন সিলেটী ভাষা বাংলারই কথ্য রূপ বা বিকৃত রূপ তাদের দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়। বাংলাদেশের সিলেটের ভাষা এবং কুমিল্লা বা ময়মনসিংহের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করলে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে সিলেটীদের ব্যবহৃত ভাষা বাংলার বিকৃত রূপ নয়, বরং এটা একটা আলাদা ভাষা। বহুভাষাবিদ ড.সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে সিলেটী একটি ভাষা এবং বহু দিক দিয়ে এ ভাষা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। সিলেটে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির অষ্টম জাতীয় ইতিহাস সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত ও বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক আসাদ্দর আলী সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ সিলেট দর্পণে এ সম্পর্কে ড. আলীর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়।

সিলেটী ভাষার আলাদা লিপিও রয়েছে এবং সে লিপির নাম সিলেটী নাগরী। সিলেট অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যের সেবা করার সাথে সাথে নাগরী লিপির মাধ্যমে সিলেটী ভাষার চর্চাও অব্যাহত রেখেছেন। উল্লেখ্য যে শুধু বাংলা নয়, আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যও সিলেটবাসীর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। নাগরী লিপি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অধ্যাপক আসাদ্দর আলী বলেন,"ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীকে সিলেটে এই লিপির প্রচলন কাল বলে অনুমান করেন। আমাদের বিবেচনায় শুধু চতুর্দশ শতাব্দীতে নয়, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই লিপিমালাটি জন্মলাভের পর মুসলমানদের দ্বারা সাহিত্য সাধনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত গোলাম হুছনের 'তালিব হুছন' নামের তত্ত্বগ্রন্থ ছাড়া এর আগে রচিত কোন গ্রন্থের নিদর্শন এখন আর পাওয়া যাচ্ছেনা। বেশীর ভাগ মুসলমান 'সিলটী নাগরী হরফ' এর সাহায্যে সাহিত্য সাধনা করলেও বাংলা লিপিকে এক দম বাদ দেননি। ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে এ পর্যন্ত 'সিলটী নাগরী হরফ'-এ লেখা ১৪০ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটা কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। 'সিলেটী নাগরীঃ লিপি, ভাষা ও সাহিত্য' নিয়ে গবেষণার পর জনাব গোলাম কাদির ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। একই বাংলা ভাষায় দুইটি আলাদা আলাদা লিপির মাধ্যমে সাহিত্য সাধনার এমন নিদর্শন নজিরবিহীন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর কোথাও নেই।"

নাগরী লিপির সাথে আমি কি ভাবে পরিচিত হই তা এখানে উল্লেখ করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। আমি আমার ফুফু মরহুমা আয়শা খাতুনের নিকট থেকে নাগরী লিপি

www.pathagar.com

শিখি। আমার দাদাজান মরহুম পীর মজির উদ্দীনের লেখা সকল গ্রন্থই ছিল নাগরী লিপিতে লেখা। আমি আব্বার কাছে দাদাজানের লেখা যে সকল গ্রন্থ দেখেছি সেগুলো হচ্ছে গুলরুখ, শাহাদতে বুজুর্গান, প্রেম মালা, প্রেম রতন ও ভেদজহুর। এ সকল বই অধ্যয়নের আগ্রহ থেকেই আমি ফুফুর নিকট নাগরী লিপি শেখানোর আব্দার করি। মজার ব্যাপার হল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ফুফুর নিকট থেকে আমি নাগরী লিপি শিখে ফেলতে সক্ষম হই। যে লিপি আমার মত মাঝারি মেধাসম্পন্ন বালক কয়েক ঘন্টায় শিখে নিতে পারে সে লিপি কতটুকু সহজবোধ্য তা সহজেই অনুমান করা যায়। এক সময় সিলেটের ঘরে ঘরে নাগরী লিপির চর্চা হত এবং প্রায় সকল শিক্ষিত লোক নাগরী পড়তে পারতেন বলে অনুমান করা যায়। বর্তমানে সর্বসাধারণের মধ্যে নাগরী লিপির চর্চা না থাকলেও আমাদের কিছু গবেষক এ ব্যাপারে বেশ পরিশ্রম করছেন। সিলেটে অধ্যাপক আসাদ্দর আলী, অধ্যাপক এরহাজুজ্জামান, সৈয়দ মোস্তফা কামাল প্রমুখ নাগরী লিপিকে ধরে রাখা ও এর সাথে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের যোগসুত্র স্থাপনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে সিলেটের নাগরী লিপি নিয়ে বর্তমানে বৃটেনে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়েছে এবং আমার মতে এর উদ্যোক্তা কোন সিলেটী নয়, নয় কোন বাঙালী। তিনি এক জন বৃটিশ নাগরিক এবং তার নাম মি. জেমস লয়েড উইলিয়াম। তিনি এবং তার স্ত্রী সু লয়েড উইলিয়াম মিলে গড়ে তুলেছেন 'সিলেটী ট্রান্সলেশন এন্ড রিসার্চ নামক একটি প্রতিষ্ঠান।' উইলিয়াম পরিবারের সিলেটী ভাষা নিয়ে গবেষণা ও সাধনা আমরা সিলেটীদের জন্যে রীতিমত ঈর্ষার বিষয়। আমরা লাখ লাখ সিলেটী যা করতে পারিনি তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে পেরেছেন। কম্পিউটারে নাগরী ফন্ট প্রবর্তন, সিলেটী বর্ণমালায় বই-পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা চিরদিনের জন্যে আমাদের ঋণী করে ফেলেছেন। তাদের কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট কলামিষ্ট রেণু লুৎফা বলেন,' সু এবং জেমসের গবেষণা ও সাধনা বৃথা যাবেনা সে ভরসা আমি হলফ করে তাদের দিতে পারি। সিলেটী ভাষা তার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য আর ইতিহাস নিয়ে ফিরে আসবেই।'

বৃটেনে সিলেটী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে সু ও জেমসের পাশাপাশি সর্বজনাব মতিয়ার রহমান চৌধুরী, রেণু লুৎফা, আব্দুল হামিদ প্রমুখের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। জনাব মতিয়ার রহমান চৌধুরীর লেখা 'সিলেট ও সিলেটী ভাষা' বইটিকে এ ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বইখানা প্রকাশ করে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আমাদের ঐতিহ্যমন্ডিত ভাষা ও লিপির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি এ বই দ্বারা বাংলাদেশ এবং বৃটেনের বর্তমান প্রজন্মের কাছে সিলেটী ভাষা ও লিপিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে সম্প্রতি বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের সহযোগিতায় সেখানে সিলেটী ভাষার উন্নয়ন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে 'সিলেটী ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট' চালু হয়েছে। এ প্রজেক্টের পক্ষথেকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস চলছে এবং বহু ছাত্র-ছাত্রী সেখানে নাগরী লিপি শিখছেন। আমার জানামতে জনাব আব্দুল হামিদ প্রমুখের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। এখানে আমার প্রশ্ন, কাউন্সিলের সহযোগিতায় সিলেটী ভাষা শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বার্মিংহাম যে মহতি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাঙালী অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস বরা কি তা অনুসরন করতে সক্ষম হবে? আমাদের সম্মানিত সিলেটী কাউন্সিলারগণ কি বলেন? সব শেষে জনাব রেণু লুৎফার লেখা থেকে জেমস লয়েড উইলিয়ামের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের মত পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে জেমস তাকে বলেন,

www.pathagar.com

'সিলেটীদের উচিত তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ করা। হারিয়ে যাওয়া অমূল্য সম্পদ ইতিহাস, সাহিত্য আর ভাষাকে নিয়ে পুরো আত্মবিশ্বাস সহ তাদের চর্চা করা উচিত।'

বৃটিশ জেমস যা বুঝতে পেরেছেন আমরা সিলেটীরা কখন তা বুঝতে সক্ষম হব?

লন্ডন ৬ জুন ২০০০

www.pathagar.com

পাদটীকা ঃ
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী?

লন্ডনের নতুন দিনে প্রকাশিত সিলেটী ভাষা বিষয়ক লেখা সম্পর্কে অনেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। কেউ পক্ষে বলছেন এবং কেউ বিরুদ্ধে বলছেন। অনেকে আমার ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে সরাসরি আমার সাথে কথা বলেছেন। কোন কোন উৎসাহী পাঠক লেখাটি ফটো কপি করে বিলি করছেন বলেও আমার কাছে খবর এসেছে। তবে সিলেটী ভাষার বৃটিশ গবেষক জেমস লয়েড উইলিয়ামের উৎসাহ সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি লেখাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে এ নিয়ে মতবিনিময় করছেন। এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা হোক সে আকাঙ্খা থেকেই আমি লেখাটি লিখেছি। তাই পক্ষে হোক অথবা বিপক্ষে হোক, যারাই এ ব্যাপারে কথা বলছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজকের লেখায় আমি পাঠকদের কতিপয় প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব। প্রশ্নগুলো বিভিন্ন ভাবে আমার কাছে এসেছে। কেউ কেউ বলছেন, সিলেটী ভাষা একটি আঞ্চলিক ভাষা। এ রকম আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়ও আছে। এমনকি খোদ সিলেটের চার জেলার ভাষা চার রকম। মৌলবীবাজারের সাথে হবিগঞ্জের ভাষার মিল নেই, সিলেট সদরের ভাষা ও সুনামগঞ্জের ভাষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য।

এ কথা ঠিক যে আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়ও আছে। বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই তা আছে। কিন্তু সকল আঞ্চলিক ভাষার লিপি বা বর্ণমালা নেই। যদি কোন অঞ্চলের নিজস্ব বর্ণমালা থাকে তবে তা, যে অঞ্চলেরই হোক না কেন, মানবজাতির জন্যে মূল্যবান এক সম্পদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত কথ্যভাষার মধ্যে কোন ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে বা কোনকালে ছিল বলে আমার জানা নেই। একমাত্র সিলেটী ভাষার তা আছে এবং তা লজ্জার কোন বিষয় নয়, বরং গোটা বাংলাদেশের জন্যে তা গৌরবের বিষয়। আমরা যদি আমাদের গর্বের ধন নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগি তা হলে তা-ই হবে লজ্জার বিষয়। যার উজ্জল ইতিহাস আছে সে কখনো হীনমন্যতায় ভোগতে পারেনা। এ কথা সুস্পষ্ট যে এ সম্পর্কে আমরা নিজেদেরই কথা বলতে হবে। অন্যেরা আপনার ঐতিহ্য সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেনা। আপনি-আমি এগিয়ে এলে অন্যেরা সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াতে পারে, নাও পারে। কিন্তু আমরা সোচ্চার না হলে কিছুই হবার নয়।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই। সিলেটের বাইরের লোকদের নিকট থেকে সব সময় অভিযোগ শোনা যায় যে সিলেটীদের বাংলা উচ্চারণ ভাল নয়, তাদের কথাবার্তায় আঞ্চলিক টান থাকে। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, আঞ্চলিক টান কার কথায় থাকেনা? ঢাকার ভাষা সম্পর্কে কোলকাতার লোকদের কি অভিমত? বরিশালের ভাষার ব্যাপারে মোমেনশাহীর লোকেরা কি বলে? রংপুর এবং নোয়াখালীর লোকদের কথার মধ্যে কি টান নেই? কিন্তু দোষ শুধু সিলেটীদের যে তারা বাংলা বলতে পারেনা। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে লেখা হয়, নাটক-নভেলে এ নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়। যারা মুর্খ তারা এ নিয়ে সমালোচনা করে মুর্খের মত। যারা পন্ডিত তারা চিনি মিশিয়ে বলে, 'তোমার মুখ থেকে কমলালেবুর গন্ধ আসে।' (নেপথ্যে বলে রাখা ভাল, সিলেটী ভাষায় খারাপ গন্ধকে গন্ধ বলে এবং সুগন্ধকে বলা হয় সুগন্ধ বা খুশবো।) এ ব্যাপারে আমার সাফ কথা। আঞ্চলিকতার টান ছাড়া কোন ভাষায় কথা বলতে পারা অবশ্যই একটা দক্ষতা। এ দক্ষতা কেউ অর্জন করতে পারলে ভাল। কিন্তু কেউ তা না পারলে এতে লজ্জার বা হীনমন্যতার কিছু নেই। আমার খুব হাসি পায় যখন দেখি লন্ডনের বিভিন্ন সভায় আমাদের কোন কোন কমিউনিটি নেতা অত্যন্ত কষ্টের সাথে বাংলায় বক্তৃতা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। সিলেটী ও বাংলা মিলিয়ে তারা এমন এক জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলেন যা শোনে খুব দ্রুত শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। যেখানে শ্রোতাদের শতকরা ৯৯ জনের বেশি সিলেটী সেখানে এত কষ্ট করে বাংলাভাষায় বক্তৃতা দেয়ার কি কোন দরকার আছে? আমি বুঝিনা কেন এ হীনমন্যতা? বাংলা বলা দোষের নয়, বলতে পারলে বলুন। কিন্তু না বলতে পারলে নিজেকে ছোট মনে করার কোন কারণ নেই। কেউ এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে থোড়াই কেয়ার করবেন। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান, প্রাক্তন আইজি ই এ চৌধুরী, এমনকি সৈয়দ মুজতবা আলী যেখানে ভাষার জন্যে সমালোচিত হয়েছেন সেখানে আপনাকে-আমাকে কি কেউ ছেড়ে দেবে? ইয়র্কশায়ারের লোকেরা বাসকে বুস বলে, এ কারণে তারা হীনমন্যতায় ভোগেনা। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং সিলেটী আমাদের মাতৃভাষা। এতে কোন ফাঁক নেই, এখানে লজ্জারও কিছু নেই।

সিলেটীদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও মাতৃভাষা সিলেটী- এ সত্য স্বীকার করার পরও কেউ কেউ মনে করেন যে আমরা যদি সিলেটী ভাষার চর্চা শুরু করি তা হলে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হব। আমরা এমনিতেই পিছিয়ে আছি, এর ফলে আরো পিছিয়ে যাব। আসলে মাতৃভাষার চর্চা করে কেউ কোন দিন পিছিয়ে যায়নি। এক সময় বাংলা শেখার বিরুদ্ধেও এ ধরণের অদ্ভুত যুক্তি দেয়া হত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সে যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, কিন্তু সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তারা লিখিত ভাবে নিজেদের মাতৃভাষার চর্চাও করে। পশ্চিম বাংলার লোকদের মাতৃভাষা বাংলা, পূর্বপাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে, পক্ষান্তরে গুজরাট অঞ্চলে

www.pathagar.com

গুজরাটী ভাষারই আধিপত্য চলছে। ভারতে প্রতিটি ভাষার লোকেরা নিরুদ্বেগে মাতৃভাষার চর্চা করছে এবং প্রত্যেক ভাষার রয়েছে নিজস্ব সমৃদ্ধ সাহিত্য। পাকিস্তানের ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। বেলুচিস্তানের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে এবং পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকদের মাতৃভাষা পাঞ্জাবী। প্রত্যেক এলাকার লোক তাদের মাতৃভাষা নিয়ে গর্ববোধ করে এবং তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় গড়ে তুলছে নিজস্ব সাহিত্য।

অতীতে সিলেটের কবি-সাহিত্যিকগণ শুধু বাংলা ও সিলেটী ভাষায়ই সাহিত্য চর্চা করেননি, এ দু ভাষার পাশাপাশি তারা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায়ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বলে বহু প্রমাণ মিলে। অধ্যাপক আসাদ্দর আলীর ভাষায়ঃ " সিলেটের হিন্দুগণ কেবলমাত্র সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী লিপির মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা করেছেন। পক্ষান্তরে সিলেটের মুসলমানগণ বাংলা, ইংরেজী, নাগরী, সিলটী নাগরী, আরবী, ফারসী ও উর্দু নামের সাতটি লিপির মাধ্যমে সাহিত্য সাধনা করেছেন বলে তথ্য মিলে। মধ্যযুগের সাহিত্যে সিলেটের মুসলমানগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। মুসলমানগণই মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মানবিকতার আমদানী করেন। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ ছগীরকে পথিকৃৎ বলে সম্মান দেয়া হয়। তার ইউসুফ-জুলায়খা একখানি মানবিক প্রণয় উপাখ্যান। অনুরূপ ভাবে দৌলতকাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর এবং মোহাম্মদ কবীরও প্রণয় উপাখ্যান রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এদেরকে চট্টগ্রামী গবেষকগণ তথ্যহীন অবস্থায় মনগড়া ভাবে চট্টগ্রামী বানিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু 'দৌলত-মাগন-কবীর-ছগীর এ চার রত্ন কি সিলেটের লোক ছিলেন না? ' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমরা তাদের অহেতুক দাবীকে যুক্তির নিক্তিতে তুলে বাতিল করেছি। এমনি ভাবে 'নবী বংশ' প্রণেতা মহাকবি সৈয়দ সুলতান এবং 'রসুল বিজয়' কাব্য প্রণেতা সাধক কবি শেখ চান্দকেও যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার খপ্পর থেকে উদ্দার করা হয়েছে।" (সিলেট পৌর পরিক্রমা,সাহিত্য চর্চায় সিলেটঃমুহাম্মদ আসাদ্দর আলী)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অতীতে সিলেটের লোকেরা অনেকগুলো লিপির চর্চা করেও পিছিয়ে যায়নি, বরং এগিয়ে গিয়েছে। অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সিলেটী ভাষার চর্চা তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

উৎসাহী পাঠকদের খেদমতে আরজ, আপনারা একটু খোজ নিয়ে দেখবেন, বৃটেনে যে সব পাঞ্জাবী বা গুজরাটী লোক আছে তারা নিজেরা কোন্ ভাষায় কথা বলে এবং মাতৃভাষা হিসেবে তাদের ছেলেমেয়েকে কোন্ ভাষা শিক্ষা দেয়। তারা সবাই তাদের রাষ্ট্রভাষা নয়, মাতৃভাষার চর্চা করে। তাদের ব্যাপারে কি এমন আজগুবি কথা বলা যাবে যে মাতৃভাষার চর্চা করে তারা পিছিয়ে পড়ছে? তা হলে আমরা সিলেটীরা কেন পিছিয়ে পড়ব?

তা ছাড়া আমরা বাংলাদেশে বাস করছিনা, অমরা বাস করছি বৃটেনে। বৃটেনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কথা বললে সিলেটী ভাষা শেখার পক্ষে আরো বলিষ্ট যুক্তি রয়েছে। গবেষণা

www.pathagar.com

ও অভিজ্ঞতা থেকে বৃটেনের শিক্ষাবিদগণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ইংরেজী,বিজ্ঞান ও অংক ভালভাবে বোঝার জন্যে মাতৃভাষা চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি ভালভাবে মাতৃভাষার চর্চা করে তা হলে এর মাধ্যমে তারা ন্যাশনাল কারিকুলামের বিভিন্ন বিষয় সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এ জন্যেই বৃটেনের শিক্ষাবিভাগ মাদার টাং শিক্ষার খাতে এত অর্থ ব্যয় করছে। বাংলাভাষা শেখার মাধ্যমে সিলেটী ছেলেমেয়েরা কিন্তু সে সুবিধা পাচ্ছেনা। বাংলাভাষার জন্যে প্রদত্ত এখানকার অধিকাংশ সাহায্য ও অনুদান মাদার টাং এর জন্যে দেয়া হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যে এ অনুদান ও সাহায্য আসে তাদের অধিকাংশই সিলেটী এবং এটা সুস্পষ্ট যে তাদের মাতৃভাষা বা মাদার টাং বাংলা নয়। এ কারণে এ অনুদান থেকে যে ফলাফল পাওয়ার কথা তা অমরা মোটেই পাচ্ছিনা।

গুজরাটি বা পাঞ্জাবী অভিভাবকরা এ সত্যটি বুঝেন বলেই তারা তাদের ছেলেমেয়েকে হিন্দি বা উর্দু না শিখিয়ে গুজরাটি বা পাঞ্জাবী ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। বৃটেনের সিলেটী ছেলেমেয়ের কাছে ঢাকার ভাষা আর গুজরাটি ভাষার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য আছে বলে আমার মনে হয়না। তাদের যদি সিলেটী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয় তা হলেই তারা বুঝবে যে তাদের মায়ের ভাষা তারা শিখছে। অমার এ কথায় যদি কোন প্রকার অতিরঞ্জন থাকে তা হলে আশা করি সচেতন পাঠক সমাজ আমার ভুল শোধরে দিবেন।

অপর এক পাঠক ফোন করে জানতে চেয়েছেন, আমি বাঙালী না সিলেটী। তার এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে আমাকে পচিশ-ত্রিশ বছর পেছনে যেতে হবে। ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে কৃষিবিভাগে কর্মরত এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাকে সবাই এডি বলে ডাকতো। তিনি ছিলেন বরিশালের লোক। আব্বা বলতেন, তার বাড়ি বেঙ্গল। একবার ভদ্রলোক নিজ বাড়িতে যান এবং কিছুদিন পর খবর আসে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এর পর আমাদের বাড়িতে আরেকজন এডি আসেন এবং তার বাড়ি ছিল কুমিল্লা। আব্বার দৃষ্টিতে তার বাড়িও ছিল বেঙ্গল। এর কারণটি ঐতিহাসিক। বৃটিশ ভারতে সিলেট ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। বৃটেনে বসবাসকারী অধিকাংশ বাংলাদেশী তরুণদের এ কথা জানা নেই। তখন বেঙ্গল ছিল আলাদা একটি প্রদেশ। তাই সিলেটের লোকেরা বেঙ্গল প্রভিন্সের অন্তর্গত সকল জেলার লোকদের বেঙ্গলী বলে সম্বোধন করতো। এখানে বেঙ্গলী মানে বাঙালী। এটা কোন গাল নয়,বরং এর মাধ্যমে পরিচয়কে সুস্পষ্ট করা হতো। সে অর্থে আমরা সিলেটীরা বাঙালী নয়। মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে যারা বাঙালী হয়েছেন আমরা সিলেটীরা সে অর্থেও বাঙালী নয়। বাঙালী বলতে যদি বাংলাদেশের বাসিন্দা বোঝানো হয় তা হলেই আমরা বাঙালী। আমার দেয়া এ সংজ্ঞা নিয়ে কেউ কূটতর্ক করতে পারেন,আবেগের বশে নানা কথা বলতে পারেন। কিন্তু গায়ের জোরে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা যায়না। আজ আবেগের বশে অস্বীকার করলেও কাল তা মেনে নিতে হবে।

লন্ডন ১২ জুলাই ২০০০

www.pathagar.com

হুন্ডি-হাইকমিশন এবং প্রসঙ্গিক বিষয়

ইদানীং হুন্ডি ব্যবসা নিয়ে বাংলাদেশে বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার সাফ কথা, বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিরা হুন্ডি ব্যবসা বন্ধের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। এর প্রমাণ স্বরূপ প্রথমে আমি আমার প্রতিবেশী লায়েক উদ্দীন সাহেবের ভোগান্তির কথা দিয়ে শুরু করতে চাই।

লায়েক উদ্দীন সাহেব মাঝে মাঝে বাংলাদেশে টাকা পাঠান এবং সাধারণতঃ পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু তার পাঠানো টাকা প্রাপকের কাছে পৌছতে ছয়মাস-নয়মাস চলে যায়। এ ব্যাপারে ঢাকায় বার বার লিখে তিনি কোন সন্তোষজনক জবাব পাননি। বরং ঢাকার ডাক বিভাগ মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে বিষয়টা ধামাচাপা দিতে চেয়েছে। লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনেও তিনি অনেকগুলো চিঠি দিয়েছেন। হাইকমিশনের পোষ্টাল উইংও তাকে নিরাশ করেছে। এ ব্যাপারে লেখা কিছু চিঠি-পত্র নিয়ে তিনি কয়েকদিন পূর্বে আমার কাছে আসেন। এ সকল চিঠির কোনটা বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কাছে লেখা এবং কোনটা লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে লেখা। দু'চার টাকা দেশে পাঠিয়ে এর পর এ টাকা উদ্ধারের জন্যে যদি বস্তার পর বস্তা চিঠি লেখতে হয় এবং এ সকল চিঠি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে হয় তা হলে কি তা মানুষের সহ্য হয়? মানুষের খেয়ে দেয়ে আরো কাজ আছে। বাংলাদেশ হাইকমিশন বলুন আর বাংলাদেশ সরকার বলুন, তাদের মত ফিতা কেটে এ দেশের মানুষ জীবন যাপন করেনা। আমি এখানে লায়েক উদ্দীন সাহেবের নিয়ে আসা সকল চিঠি বাদ দিয়ে শুধু বাংলাদেশ থেকে তার শাশুড়ী যে চিঠি দিয়েছেন এর কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি। তার শাশুড়ী লিখেছেনঃ "...টেলিফোনে...শুনিলাম...তুমি ২২.৮.৯৮ তারিখে ১০০ পাউন্ড পাঠাইয়াছ ও চিঠি দিয়াছ। আমি এই খবর শুনিয়া পোষ্ট অফিসে খোঁজ করিয়াছিলাম। পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, টাকা বা চিঠি আসিলে তিনি অবশ্যই দিতেন ও বলিলেন তিনি হেড অফিসে তাল্লাশি নিবেন। এর দুই দিন পরই (তাং মার্চ ৯৯ইং) টাকা ৭৬৫৪.৭১ পাইয়াছি। তুমি আগামীতে টাকা দিলে পোষ্ট অফিসে দিওনা। কারণ টাকা পাইতে গেলে খোঁজ নিতে হয় ও ৭/৮ মাস লাগে আর তোমার চিঠি পাইনা। .....ইতি। তোমার শাশুড়ী....।" এ চিঠির দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক, ২২ আগষ্ট ৯৮ তারিখে পাঠানো টাকা খোঁজ নেয়ার পর পাওয়া গেছে ৯৯ সালের মার্চ মাসে, অর্থাৎ সাত মাস পর। দুই, লায়েক উদ্দীন সাহেবের শাশুড়ী ডাকযোগে টাকা পাঠাতে সাফ নিষেধ করে দিয়েছেন। আসলে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা

www.pathagar.com

আমাদের সবার কাছেই আসে। দেশে বসবাসকারী আমাদের মাবাবা-ভাইবোনদের কারোই বাংলাদেশ ডাকবিভাগের উপর কোন আস্থা নেই।

শাজন মিয়া নামক আরেক ভদ্রলোকের কথা আমি জানি। তিনি কিছু টাকা ডাকবিভাগের মাধ্যমে দেশে পাঠিয়েছিলেন। তিনি অনেকদিন থেকে এ নিয়ে লেফট-রাইট করছেন, কিন্তু তার প্রেরিত টাকার কোন হদিস পাচ্ছেন না। বার বার এ ব্যাপারে হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু কোন সুফল পাননি। শেষ পর্যন্ত শাজন মিয়া তার স্থানীয় এমপি টনি ব্যাংকস এর শরণাপন্ন হন। মি. ব্যাংকস শাজন মিয়ার পক্ষ থেকে হাইকমিশনে চিঠি দিলে খোদ রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে এর জবাব আসে। প্রশ্ন হচ্ছে, নিজ দেশে দু পয়সার মানিওর্ডারের জন্যে বৃটিশ এমপির কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়ার সময়-সুযোগ ও মানসিকতা আমাদের ক'জনের আছে? তার চেয়ে ভানুর কৌতুকের মত ' তা হলে শালার যুদ্ধেই যামুনা ' বলে ঘোষণা দেয়া আমাদের জন্যে অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। আমরা অধিকাংশ বিলাত প্রবাসী বাস্তবে তা-ই করছি।

আমার এক পুরানো বন্ধুর নাম সিরাজুল ইসলাম। দেশের একটি হাইস্কুলের তিনি হেডটিচার ছিলেন। সপ্তাহ খানেক আগে তার সাথে দেখা। বাংলাদেশের ডাকবিভাগের উপর তিনি ক্ষেপে আছেন। তার রেজিষ্টার্ড চিঠি গায়েব হয়ে গেছে, চিঠির ভেতর ছিল ড্রাফট। আমি তাকে বললাম, বাংলাদেশে পাঠানো রেজিষ্টার্ড চিঠির ভেতর থেকে ড্রাফট, মূল্যবান দলিল ইত্যাদি গায়েব হয়ে যাওয়া কি কোন খবর? এগুলো হর হামেশা ঘটছে। এ নিয়ে খুব কম লোকই অভিযোগ করেন। সিরাজ সাহেবও এ ব্যাপারে কারো কাছে অভিযোগ নিয়ে যাননি। সত্যি কথা বলতে কি কেউ এ ধরনের আভিযোগকে পাত্তাই দেয়না। বাংলাদেশে খুন-ধর্ষনই যেখানে কোন খবর নয় সেখানে দু'চার টাকার কিছু ড্রাফট গায়েব হয়ে গেলে কিছু যায় আসেনা। যেখানে লুটপাট চলছে কোটি টাকার হিসেবে সেখানে দশবিশ হাজার টাকা কোন টাকাই নয়।

বাংলাদেশের ডাকবিভাগ ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সার্ভিসের উপর সন্তুষ্ট কি না - এ প্রশ্ন বিলাত প্রবাসী বাংলাদেশীদের করা হলে কয়জন বাঙালী ইতিবাচক জবাব দিবেন আমি জানিনা। তবে আমার পরিচিত এ দেশের কোন একজন বাঙালীও আমি পাইনি যার বাংলাদেশের ডাকবিভাগের উপর আস্থা রয়েছে। সবাই বলেন, বাংলাদেশে চিঠি, চেক, ড্রাফট ইত্যাদি গায়েব হয়ে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় আমরা প্রবাসীরা কোন্ ভরসায় এবং কেন ডাকযোগে দেশে টাকা পাঠাব? ডাক সার্ভিসের বিরুদ্ধে আভিযোগ করে ডাক বিভাগ বা লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে সন্তোষ জনক জবাব আশা করতে পারলেও কথা ছিল। বাঙালীর কপালে তাও নেই। বৈধ পথে টাকা পাঠালে যদি এ রকম ভোগান্তির শিকার হতে হয় তা হলে মানুষ বৈধ পথ বাদ দিয়ে অবৈধ পথে যেতে বাধ্য। যদি বলা হয়, বাংলাদেশের ডাক বিভাগ

www.pathagar.com

এবং সাথে সাথে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন এধরনের ব্যবহার প্রদর্শন করে মানুষকে অবৈধ পথ অবলম্বনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে তা হলে কি ভুল বলা হবে?

আমরা বিলাত প্রবাসী সবাই বলতে গেলে বাংলাদেশে টাকা পাঠাই। কেউ পাঠাই কালে ভদ্রে এবং কেউ পাঠাই প্রতি মাসে। কেউ পাঠাই লাখ লাখ আবার কেউ হাজার হাজার। কিন্তু কি ভাবে পাঠাই? ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে আমরা কয়জন দেশে টাকা পাঠাই? এক সময় ছিল যখন অধিকাংশ বিলাত প্রবাসী তাদের সকল টাকা সোনালী ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে দেশে পাঠাতেন। এখন খুব কম লোকই দেশে টাকা পাঠানোর জন্যে ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসে যান। কি পরিমান লোক ব্যাংক অথবা পোষ্ট অফিসে যান আমার কাছে এ ব্যাপারে কোন পরিসংখ্যান নেই। কে কার জন্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করবে বা জরিপ চালাবে? এ ব্যাপারে কি কারো দায়িত্ব আছে? ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে যদি আমরা সরাসরি বাংলাদেশে পাউন্ড পাঠাই তা হলে কে লাভবান হবে? এ কাজ করে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হবার সুযোগ থাকলে এ সম্পর্কে আপটু ডেট পরিসংখ্যান সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যেত। যেহেতু লাভ হোক লোকসান হোক তা হবে রাষ্ট্রের তথা জনগণের, তাই এ জন্যে আমাদের কারো মাথা ব্যথা নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ সম্পর্কে কোন জরিপ চালানোর কথা নয়। রাষ্ট্র যারা চালাচ্ছেন তারাই তা করবেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। কিন্তু আমাদের কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের চেয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজন সব সময় বড় বলে বিবেচিত হয়। তাই আরো দশটা প্রয়োজনের মত এ প্রয়োজনটিও অবহেলিত রয়ে গেছে।

বলা হয়, হুন্ডির মাধ্যমে বিলাত থেকে বিপুল পরিমান টাকা বাংলাদেশে যাচ্ছে। হুন্ডি ব্যবসার আরেক নাম কালোবাজার বা ব্ল্যাক মার্কেট। সরকারের কাছে এটা বেআইনী। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে তা বেআইনী নয়। বিলাত প্রবাসী বাংলাদেশীরাও এটাকে খারাপ চোখে দেখেন না। আমরা দেশে টাকা পাঠাই বিভিন্ন প্রয়োজন সামনে রেখে। কিন্তু ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠালে সে টাকা দেশে যেতে যেত যে কাজে টাকা পাঠালাম তা শেষ হয়ে যায়। বিনিময়মূল্য কম পাব তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ছয়মাসেও যদি প্রাপকের কাছে টাকা না পৌছে তা হলে এ ভাবে পাঠানোর কি কোন দরকার আছে?

জ্ঞানী-গুণীরা হয়তো বলবেন, আমাদের দেশপ্রেম নেই তাই আমরা হুন্ডি ব্যবসাকে খারাপ মনে করিনা। নীতিগত ভাবে জ্ঞানীদের কথা মেনে নিতে হয়। কিন্তু এর পরও কথা আছে। পাবলিক যখন দেখে যারা সরকার চালান তারা নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত তখন তারা আর কোন কথায় কান দিতে চায়না। মানুষ চোখ বন্ধকরেও অনুভব করতে পারে যে দেশে দস্তুরমত লুটপাটের রাজত্ব চলছে। ক্ষমতার মধুভান্ডের নাগাল যারাই পান তারাই নির্বিচারে লুন্ঠনকার্য পরিচালানা করেন। এ লুন্ঠনকার্য তারা একা নয়, গোষ্ঠীসুদ্ধ সবাই মিলে চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় পাবলিকের কি দায় পড়েছে যে তারা একা একা শুধু লোকসান দিবে? স্যাকরিফাইসের বেলায় পাবলিক, আর মধু খাওয়ার সময় মামু আর ভাগ্নে - যে দেশে

www.pathagar.com

এ নীতি বজায় থাকে সে দেশের জনগণকে দেশপ্রেম শিক্ষা দেয়া যায়না।

গত সংখ্যা নতুন দিনে এ হুন্ডি ব্যবসা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন চাপা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা চেম্বারের এক গোল টেবিল বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবর্ণর ডঃ এম ফরাস উদ্দিন তথ্য প্রকাশ করেন যে ভারতীয় মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্সের অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশে চোরাই পথে সে দেশের পন্য সরবরাহ করে এর অর্থ পরিশোধ করছে। তিনি আরো বলেন, অবৈধ হুন্ডি ব্যবসার কারণে বাংলাদেশ বিপুল অংকের রেমিটেন্স প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার মতে শুধুমাত্র বৃটেন থেকে বাংলাদেশ ৫০ কোটি ডলার রেমিটেন্স পাওয়ার কথা। এর মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ডলার আসছে ব্যাংকিং চ্যানেলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবর্ণর অবশ্য স্বীকার করেছেন যে ব্যাংকিং সিস্টেমের সহায়তা ছাড়া হুন্ডি ব্যবসা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় এবং দ্রুত পৌছানো ও এডভান্স পেমেন্টেসহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে প্রবাসীদের অনেকে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত হন।

আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবর্ণরের এ কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন বলুন আর ব্যবসা বলুন, জনগনের সুবিধার বিষয়টা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের কান্ডকারখানা দেখে মনে হয় আমরা মানুষের সুবিধার জন্যে আইন তৈরি করিনা, আমরা আইন তৈরি করি মানুষকে অসুবিধায় ফেলার জন্যে। অসুবিধায় পড়ে মানুষ আমাদের কাছে আসবে এবং তাদের অবৈধ সুবিধা দিয়ে আমরা টুপাইস কামাবো, এটাই মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য।

মানুষ হুন্ডির মাধ্যমে মানুষ দেশে টাকা পাঠায় সুবিধার জন্যে। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা মানুষকে বেশি সুবিধা দিচ্ছে তাই মানুষ হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কাছে যায়। ব্যাংক বেশি সুবিধা দিলে মানুষ ব্যাংকের কাছে যাবে। আমার মনে আছে, একবার ঢাকার দৈনিক বাংলা হুন্ডি ব্যবসার উপর একটি সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। এ উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার সিনিয়র ষ্টাফ রিপোর্টার জহিরুল হক সিলেট আসেন এবং অনেকের সাক্ষাতকার নেন। আমার সাথেও তিনি কয়েক দফা বসেন। তখন আমি তাকে যে কথা বলেছি আজো সে কথা বলতে চাই। আমার মতে আইন করে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ করা যাবেনা, সুবিধা দিয়ে বন্ধ করতে হবে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সুবিধার বিষয়টা আরো গুরুত্বপূর্ণ। কোন আইন-কানুনের দরকার হবেনা। প্রবাসীদের রিমিটেন্স বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক হলে তাকে সোজা কথায় দুটো কাজ করতে হবে। এক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে উন্নত সার্ভিসের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। মনে রাখা দরকার, গলাবাজি করে সার্ভিস উন্নত করা যায়না, এ জন্যে প্রয়োজন দক্ষতা ও আন্তরিকতার। দুই, যারা দেশে টাকা পাঠান তাদের আর্থিক দিক দিয়ে উন্নততর সুবিধা প্রদান করতে হবে। আর্থিক সুবিধা না দিতে পারলে শুধু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবেনা।

লন্ডন ২৪ জুলাই ২০০০

www.pathagar.com

বিয়েহীন সমাজে
বিয়ে নিয়ে কেন এতো হৈ চৈ?

যে সমাজ থেকে দিনে দিনে বিয়েই উঠে যাচ্ছে সে সমাজে বিয়েটা কি রকম হল তা নিয়ে যদি হৈ চৈ শুরু হয় তা হলে বুঝতে হবে ডাল মে কুচ কালা হায়। পাঠকই বলুন, ইউরোপে কি বিয়ে আছে? ইউরোপ-আমেরিকায় বিবাহিত দম্পতির সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? বৃটিশ সরকার সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বিয়েটা জোর করে দেয়া হলো না স্বেচ্ছায় হল তা বিচার করার জন্যে অর্থ, শ্রম ও মেধা ব্যয় করা শুরু করেছে।

বিয়ে ছাড়া আদর্শ পরিবার হয়না, আদর্শ পরিবার গড়ে উঠতে পারেনা। বস্তুবাদী সভ্যতা মানবজাতিকে যে সকল জঘন্য জিনিস উপহার দিয়েছে তার মধ্যে পরিবারহীন জীবন-যাপন অন্যতম। অপর দিকে এশিয়ান সমাজে আজো বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। মেয়ে-পুরুষ সকলের জীবনে তা একটি প্রয়োজনীয় এবং স্মরণযোগ্য ঘটনা। বিবাহ বিচ্ছেদ সেখানেও আছে এবং ইদানীং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তারা এখনো জুতো বা জামা-কাপড়ের মত বউ বা স্বামী বদলাতে চায়না। কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে পৃথিবী এখন খুব ছোট হয়ে আসছে। পৃথিবীর কোথাও কোনকিছু ঘটলে তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য বহু জিনিসের মত ইউরোপীয় কায়দায় বিবাহ-হীন বসবাসের প্রবণতাও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। অধিকন্তু এশিয়া, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে যাতে এ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় সে জন্যে জাতি সংঘের বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগের কথা অনেকের জানা আছে। আমরা যারা বিলাতে বসবাস করছি তাদের উপর এ সমাজের প্রভাব নিত্যই পড়ছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহের প্রতি উন্নাসিকতা লক্ষ্য করে আমরা উদ্বেগের মধ্যে আছি। বিলাতের সমাজে এমন অনেক মেয়ে এবং পুরুষ আছেন যারা বিশ্বাস করেন এক জন স্বামী বা স্ত্রীর চেয়ে একটি ওয়াশিং মেশিন বা মাইক্রোওভেনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, এখানে মেয়েতে মেয়েতে এবং পুরুষে পুরুষে বিয়ে হচ্ছে অথবা তারা স্বামী-স্ত্রীর মত ঘর-সংসার করছে। এ গ্রুপ এতই শক্তিশালী যে কেউ যদি তাদের গে বা লেসবিয়ান ধরণের জীবন যাপন নিয়ে কোন প্রকার অশোভন ইঙ্গিত করে অথবা তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব প্রকশ করে তা হলে উপায় থাকবেনা। তারা সরকারের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে এবং সরকারের উপর তাদের প্রবল চাপ

www.pathagar.com

অব্যাহত ধারায় চলছে। সকলের জানা যে লোকাল গবর্ণমেন্ট এক্ট ১৯৮৮ এর ২৮ ধারা বাতিলের চাপ এ গ্রুপ থেকেই আসছে। এমনি অবস্থায় বৃটিশ সরকার বিয়েটা কি রকম হল তা নিয়ে বাজার গরম করে তুলেছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে।

গত ২৯ জুন হোম অফিসের পক্ষ থেকে 'এ চয়েস বাই রাইট' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ফোর্স ম্যারেজ বা জোর পূর্বক বিবাহ। এ রিপোর্ট তৈরির ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন লর্ড সভার দু'জন এশিয়ান প্রতিনিধি, ব্যারোনেস পলা উদ্দীন এবং লর্ড আহমদ। অবশ্য মূল কাজ করেছেন অন্যান্যরা। তাদের মধ্যে রয়েছেন হোম অফিস, ফরেন অফিস, ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ, এমপ্লয়মেন্ট ও এডুকেশনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, উইমেন ইউনিট, রেইস রিলেশন ফোরামের তিন জন এশীয় সদস্য, আন-নিসা সোসাইটির এক জন প্রতিনিধি এবং সাউথ হলের ব্ল্যাক সিস্টার গ্রুপ। তবে জানা গেছে ব্লাক সিস্টার গ্রুপের হান্নাহ সিদ্দিকী ওয়ার্কিং গ্রুপের তৎপরতায় অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে ফেইথ গ্রুপের সাথে কতটুকু এবং কি পর্যায়ে যোগাযোগ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। যদিও এটা সুস্পষ্ট যে বিয়ে-শাদীর বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ সবচেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল এবং বিষয়টা তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান সহ সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ই বিবাহকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ফেইথ গ্রুপের সাথে এ বিষয়ে অধিকমাত্রায় আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সরকার এ ব্যাপারে আন্তরিক হলে সে ভাবেই পদক্ষেপ নেয়া হতো।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফোর্স ম্যারেজ নিছক একটা এশিয়ান ইস্যু নয়। ব্যারোনেস উদ্দীনের বরাতে মুসলিম নিউজে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, এশিয়ার বাইরে শুধু সোমালিয়ান কমিউনিটির সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়েছে। তা ছাড়া যে সকল কেইস নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছ বা এভিডেন্স আনা হয়েছে এর অধিকাংশই এশীয় পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চললেও এ সকল তৎপরতার আসল টার্গেট হচ্ছে এশিয়ানরা।

রিপোর্টে এ পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে ফোর্স ম্যারেজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে প্রচলিত আইনই যথেষ্ট, এ জন্যে নতুন করে আইন প্রনয়নের প্রয়োজন নেই। রিপোর্টের আলোকে সরকার কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে এটা বুঝা যাচ্ছে যে সরকার প্রচলিত আইনের উপর নির্ভর না করে ফোর্স ম্যারেজের বিরুদ্ধে নতুন ভাবে আইন তৈরি করবে এবং তা হবে আরো কঠোর।

আমাদের সমাজে কি পরিমান ফোর্স ম্যারেজের ঘটনা ঘটে এর কোন বাস্তব

www.pathagar.com

রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। কেউ এ বিষয়ে কোন জরিপ চালিয়েছে কি না আমার জানা নেই। বিভিন্ন ঘটনার কথা আলোচ্য 'এ চয়েস বাই রাইট ' রিপোর্টে ইঙ্গিত করলেও শতকরা কত ভাগ বিবাহ ফোর্স ম্যারেজ বা জোর পূর্বক বিবাহ তা প্রকাশিত হয়নি। এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে পয়লা কাজ এটাই ছিল যে এ সম্পর্কে একটা যথার্থ জরিপ চালানো হবে। চিলে কান নিয়ে যাচ্ছে শুনে চিলের পেছনে না দৌড়ে প্রথম কাজ হচ্ছে কানে হাত দিয়ে দেখা আপনার কান যথাস্থানে আছে কি নেই। এ দেশে ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ার অসংখ্য ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর শিকার প্রধানতঃ হচ্ছে মুসলমান নারী ও পুরুষরা। এ ব্যাপারে আইন প্রনয়নের জন্যে সরকারের কাছে বহুদিন থেকে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উত্থাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু সরকার সে দাবীর প্রতি মোটেই কর্ণপাত করছেনা। বর্তমানে ডারবি ইউনিভার্সিটির পক্ষথেকে এ ব্যাপারে রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে। সরকার সাফ বলে দিয়েছে, এ রিসার্চ ওয়ার্ক সম্পন্ন হওয়ার আগে ধর্মীয় কারণে বৈষম্য হচ্ছে কি হচ্ছেনা এবং হলে এর পরিমান কতটুকু তা বোঝা যাচ্ছেনা। তাই এ ব্যাপারে কোন কিছু করতে হলে প্রথমে রিসার্চের রিপোর্ট আসতে হবে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ফোর্স ম্যারেজ সম্পর্কে কেন কোন রিসার্চ ওয়ার্ক করা হলোনা? রিসার্চ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন আইন প্রনয়নের চিন্তা করা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত?

অনেকের দৃষ্টিতে ওয়াকিং গ্রুপের আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। মনে হচ্ছে এশিয়ান মুসলমানরাই তাদের টার্গেট গ্রুপ। কারণ ওয়ার্কিং গ্রুপের উভয় চেয়ার পার্সনই ছিলেন মুসলমান এবং এর সাথে এশিয়ার অমুসলমানদের কোন গ্রুপকে জড়িত করা হয়নি। এটা জানা কথা বিলাতের বাংলাদেশী সমাজের শতকরা ৯৯ জনের বেশী ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান। ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মতি ছাড়া বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার উপায় নেই। তবে আমরা এরেঞ্জ ম্যারেজে বিশ্বাসী। ছেলে এবং মেয়ে পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করলেও অভিভাবকদের সম্মতির ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হয়। নিছক লাভ ম্যারেজের চেয়ে এরেঞ্জ ম্যারেজ যে অনেক বেশী সুবিধাজনক ও টেকসই তা চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়। পারিবারিক বিরোধ মেটাতে আউট সাইড কোর্ট সালিশের গুরুত্ব আজকাল বৃটিশ সমাজ বিজ্ঞানীরাও অনুভব করতে পারছেন। এরেঞ্জ ম্যারেজের সব চেয়ে বড় দুটো সুবিধা হচ্ছে, প্রথমতঃ অপরিপক্ষ ছেলেমেয়েরা বড়দের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে যে কোন্ ফ্যামিলির সাথে তাদের এডজাষ্ট হবে এবং কোন্ ফ্যামিলির সাথে হবেনা। দ্বিতীয়তঃ কোন বিরোধ হলে সেখানে পরিবারের সদস্যদের বা মুরব্বীদের সহজে জড়িত করা যায়। পারিবারিক বিরোধে 'নান অব ইয়োর বিজনেস' বলে ব্যাপারটাকে কেউ উড়িয়ে দিতে পারেনা। এক সময় ছিল যখন এশিয়ান সমাজে প্রচলিত এরেঞ্জ ম্যারেজের বিষয়টি বৃটিশ সরকারকে বুঝাতে আমাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। এখন অবশ্য সে সমস্যা আর নেই। কিন্তু ফোর্স ম্যারেজ সংক্রান্ত আইন তৈরি হলে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হবে। কোন্টা ফোর্স ম্যারেজ আর কোন্টা এরেঞ্জ ম্যারেজ সে বিচার কে করবে এবং কি ভাবে করবে? এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স অফিসারের তা বোঝার সাধ্য হবেনা। তবে হ্যাঁ এ খড়্গ

www.pathagar.com

হাতে থাকলে যে কোন স্বামী বা স্ত্রীকে বছরের পর বছর মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা যাবে। আইনের দোহাই দিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী-সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা কোন্ ধরণের মানবতা? প্রাইমারী পারপাস রুল দিয়ে অতীতে তাই করা হয়েছে। এখন এর চেয়ে আরো জঘন্য জিনিস আমদানীর পায়তারা চলছে।

আমাদের মতে কোন সমাজে যদি ফোর্স ম্যারেজ চালু থাকে তা হলে তা বন্ধ হওয়া দরকার। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মেয়ে বা ছেলেকে জোর করে বিয়ে দেয়া যায়না। পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া বিয়ে হলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। একটা সুস্থ ও সুন্দর পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে বিয়েতে ছেলেমেয়ে উভয়ের সম্মতি। কিন্তু আইন করে কি ফোর্স ম্যারেজ বন্ধ করা যাবে? জেল হাজতের ভয় দেখিয়ে তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্যে যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে শিক্ষা ও সচেতনতা। মা-বাবা এবং ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত, বিশেষ ভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুললে এবং ধর্মীয় বিচারে ফোর্স ম্যারেজের খারাপ পরিণতির বিষয়ে সচেতন করতে পারলে মুসলমানদের মধ্যে ফোর্স ম্যারেজের অস্তিত্বই থাকবেন। এশিয়ান মেয়েদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা যদি বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য থাকে তা হলে এ কাজেই তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় করা দরকার। জরিপ চালিয়ে যদি দেখা যায় এ দেশে ব্যাপক হারে ফোর্স ম্যারেজ সংঘটিত হচ্ছে তা হলে তা প্রতিরোধের জন্যে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আলোচনা বা কনসালটেশন চালিয়ে একটা কর্মকৌশল তৈরি করা দরকার।

আমার মতে ফোর্স ম্যারেজ ইস্যুটির দুটো উদ্দেশ্য। একটি প্রাইমারী এবং ওপরটি এর অবশ্যম্ভাবী বাই প্রডাক্ট। প্রথমতঃ ফোর্স ম্যারেজ-এর অজুহাতে মানুষের চয়েস বাই রাইটের উপর আঘাত হানা। বউ বা স্বামী বাছাই করার অধিকার মানুষের জন্মগত। এ বাছাই কে কি ভাবে করলো তা নিয়ে মাথা ঘামানো কোন বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারেনা। বৃটিশ সমাজের কোন নারী বা পুরুষকে কি কেউ এ প্রশ্ন করার সাহস রাখেন যে তুমি কেন এ মেয়ে বা ছেলের সাথে ঘর করছো? কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে এ বৈষম্য কেন? এর নামই কি বৃটিশ ষ্টাইল ইকুয়াল অপরচুনিটি? জন্মগত এ বাছাইয়ের অধিকারকে হোম অফিস চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে ফোর্স ম্যারেজের দোহাই দিয়ে। দেশ থেকে স্বামী বা স্ত্রীকে আনা তাদের জন্যে তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে। জন্মগত এ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া যায়না। এর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ফোর্স ম্যারেজে ইস্যুকে কেন্দ্র করে কোন আইন তৈরি হলে ব্যাপকভাবে এর অপব্যবহার শুরু হবে এবং তা প্রতিরোধের কোন পথ খোলা থাকবেনা। যে কোন অজুহাতে যে কেউ এর দোহাই দিয়ে সুবিধা আদায় করতে চাইবে। পারিবারিক বিরোধ ফোর্স ম্যারেজ আইনের সাথে মিশে গিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। অতএব সময় থাকতে এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা দরকার।

লন্ডন, ২ আগষ্ট ২০০০

www.pathagar.com

দান-দক্ষিণা এবং আমাদের আলেম সমাজ

হঠাৎ করে সেদিন আমার বহু পুরানো এক বন্ধুর সাথে দেখা। পেশায় তিনি শিক্ষক, টাওয়ার হ্যামলেটস বরার এক স্কুলে পড়ান। অনেক দিন হল তার সাথে দেখা-সাক্ষাত নেই। ভাবলাম দু'বন্ধু মিলে কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের কথা বলে মনের ভার লাঘব করব। কিন্তু হা হতোহস্মি, এ দেশে কি তা করার জো আছে? আমার বন্ধুর বসারই সময় নেই। এর পরও যেটুকু সময় ছিল তা চলে গেল বাংলাদেশী ভিজিটরদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্দারে। দুজন এমপি আমার বন্ধুর মাথায় ভর করে আছেন। তাঁর ভাষায়, এদের দু'জনের কেউ-ই নিজের পয়সায় এ দেশে আসেন না। অপরের পয়সায় তারা আসেন, অপরের উপর ভর করে এখানে থাকেন, তার পর অপরের পয়সায় নিজেদের পকেট ভারি করে তারা এ দেশ ত্যাগ করেন। যে কোনদিন তাদের দেখেনি, নাম শুনেনি সেও তাদের সাথে হাত মেলাতে আসে। হাত মিলিয়ে কথা নেই বার্তা নেই পকেটে পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট গুজে দেয়। দান খয়রাত করা ভাল। তবে যাদের প্রয়োজন আছে, যারা অভাবগ্রস্থ তাদের জন্যে যত ইচ্ছা করুন। আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে দুনিয়া-আখেরে এর প্রতিদান দিবেন। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দেয়াকে দান-খয়রাত বলেনা, বলে তৈল মর্দন। আমার বন্ধুর মতে এ ধরণের তৈল মর্দনে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা ইদানীং খুবই নৈপুন্য প্রদর্শন করছি। আর যারা তৈল গ্রহণ করছেন তারা লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে দু হাতে লুটেপুটে নিচ্ছেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওরা তেলা মাথায় তেল দিলে তার লাভ-ক্ষতি কি? আরো জানতে চেয়েছিলাম, কোন কোন গায়ক যে ভাবে ভাড়া খাটেন সে ভাবে রাজনৈতিক নেতারাও যে ভাড়াটিয়া বক্তা হিসেবে বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তৃতা দিতে যান সে সংবাদ কি তার কাছে আছে? কিন্তু সে সুযোগ বন্ধু আমাকে দেননি। তিনি তার কথা শেষ করেই বিদায় নিয়ে চলে যান।

বন্ধুর কথার মধ্যে যুক্তি আছে। তবে তার কথায় আমাদের আলেম সমাজের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বৃটেনে গ্রীষ্মকাল আসছে আর অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ওলামায়ে কেরামও আসছেন। আলেম উলামারা আসবেন, তাদের সাহচর্য পেয়ে এবং ওয়াজ নসীহত শুনে আমরা পথের দিশা পাব - এ সবই আনন্দের কথা। তবে আলিম উলামার প্রসঙ্গ এলেই আমার বন্ধুর তৈল মর্দন ও দান-খয়রাতের কথাও এসে যায়। আমরা রাজনৈতিক নেতাদের মত আলেমদেরও তৈলমর্দন করি, দান-খয়রাত ও হাদিয়া-তোহ্ফা দিয়ে ভরে দেই। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা দরকার, আমরা যদি হাদিয়া-তোহফা দেয়া বন্ধ করে দেই তা হলে এ সকল আলেমের কতজন আমাদের

www.pathagar.com

ওয়াজ নসীহত করতে আসবেন? যারা তাদের নিয়ে চলাফেরা করেন জানিনা এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা কি রকম। আমার কাছে তাদের কারো কারো আগমনকে তীর্থের কাকের আগমনের মত মনে হয়। তাই আজ এ ব্যাপারে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। বাংলায় আমরা উপহার বলতে যা বুঝি আরবীতে এর নাম হাদিয়া। হাদীস শরীফে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা একে অন্যের মধ্যে উপহার বা হাদিয়া-তোহ্‌ফা আদান প্রদান কর তাহলে তোমাদের মধ্যে মায়া-মহব্বত বাড়বে। আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) নিজেও হাদিয়া দিয়েছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হাদিয়া দেয়া এবং নেয়া দুটোই শরিয়ত সম্মত কাজ, সওয়াবের কাজ। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, মহানবী(সঃ) শুধু হাদিয়া নেননি, দিয়েছেনও। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান'। পুরোহিতকে দান-দক্ষিণা দেয়ার প্রথা হিন্দুসমাজে রয়েছে। দক্ষিণা না পেলে ব্রাহ্মণরা যজমানদের বাড়ি থেকে বিদায় হতোনা, এ থেকেই হয়তো এ ধরণের প্রবাদ চালু হয়েছে। যজমান তাদের বলে যারা পূজা-অর্চনা করার জন্যে দান-দক্ষিণা দিয়ে কোন ব্রাহ্মণকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। ইসলাম ধর্মে ব্রাহ্মণ নেই, ব্রাহ্মণের দান-দক্ষিণাও নেই। হাদিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণা নয়। কিন্তু হাদিয়া-তোহফার নামে যা চলছে তা কি হিন্দু সমাজের দক্ষিণা থেকে কোন অংশে কম? আমাদের অবস্থা হচ্ছে এক দল জীবন ভর হাদিয়া দিয়ে যাচ্ছেন এবং ওপর দল তা গ্রহণ করে চলেছেন। এখানে আদান প্রদানের প্রচলন নেই। একই ভাবে একদল শুধু দাওয়াত খেয়ে চলেছেন এবং ওপর দল খেদমত দিয়ে যাচ্ছেন। সালামের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। হাদিয়া, দাওয়াত এবং সালাম একই রীতিতে চলছে। আলেমরা এগুলো গ্রহণ করেন এবং সাধারণ মুসলমানরা তা প্রদান করেন। এ ধরনের কাজ কতটুকু ইসলামী এর ফায়সালা আলেম সমাজই প্রদান করুন। হাদিয়া যদি সওয়াবের কাজ হয় তা হলে তা সবার জন্যেই সওয়াবের। শরিয়তে এমন কোন কাজ নেই যা সাধারণ মানুষের জন্যে সওয়াবের, কিন্তু আলেমের জন্যে সওয়াবের নয়।

মাওলানা আমিন উদদীন শায়খে কাতিয়ার একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে মনে রাখার মত। অবশ্য ঘটনাটি আমার শোনা, নিজ চক্ষে দেখা নয়। একবার এক ভদ্রলোক কাতিয়ার শায়খকে পায়ে ধরে সালাম করে। তা দেখে শায়খ সাহেবও তাকে পায়ে ধরে সালাম করে নেন। এতে লোকটি আঁতকে উঠে বলে, 'হুজুর, এ কি করলেন? আমাকে গোনাহগার বানিয়ে ফেললেন!' তার কথার জবাবে শায়খ সাহেব বললেন,' এ কেমন কথা! আপনি করলে সওয়াব হবে এবং আমি করলে গোনাহ হবে এ ধরনের কিছুতো ইসলামে নেই।'

হাদিয়া তোহফার ব্যাপারটাও ঠিক এ রকম। সাধারণ মানুষ এক তরফা ভাবে তা করে যাবে এবং উলামায়ে কেরাম কবরস্থানের মত তা শুধূ গ্রহণ করে যাবেন এ রীতি

www.pathagar.com

ইসলামী রীতি হতে পারেনা। মহানবী (সঃ) এর সুন্নাহ্ কি তা আমাদের দেখা দরকার। তাঁর কাছে হাদিয়া তোহ্ফা হিসেবে যা কিছু এসেছে এর প্রায় সবকিছুই তিনি দান করে দিয়েছেন। অনেক সময় সঞ্চিত হাদিয়া-তোহ্ফা ঘুমানোর আগে বিলি-বন্টন শেষ করে তবেই তিনি বিছানায় গিয়েছেন। আল্লাহ্র নবী(সঃ) হাদিয়া-তোহ্ফা দিয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করেননি, পাচ তলা দশ তলা দালান তৈরি করেননি। আমরা সুন্নাতের ওযাজ-নসীহত করি, কিন্তু হাদিয়া-তোহ্ফার ব্যাপারে সুন্নাতে রাসুল (সঃ) কি তা খেয়াল করিনা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে যে সকল আলেম বৃটেন আসেন হাদিয়া-তোহ্ফার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ অত্যন্ত নিম্নমানের আচরণ করেন। তাদের কাজ দেখে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। কিন্তু তারা বেলাজ বেশরমের মত তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করে যান।

এ ব্যাপারে বহু ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এখানে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি এক মসজিদের সভাপতি ও সেক্রেটারী দুজন মিলেই আমাকে বলেছেন। সুতরাং তা মিথ্যা হবার সম্ভাবনা নেই। খুব জবরদস্ত এক আলেম। নাম বললে সবাই চিনে নিবেন, তাই নাম বলছিনা। এক মসজিদে তাকে দাওয়াত করা হয়েছে। মসজিদে আর্থিক সংকট রয়েছে। মাওলানা সাহেব ওয়াজ নসীহত করে যদি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিতে পারেন তা হলে মসজিদ কমিটি তাকে ভাল অংকের সেলামী প্রদান করবে, এ শর্তে মাওলানা সাহেব সেখানে যেতে সম্মত হন। ওয়াজে প্রচুর লোক সমাগম হয় এবং মাওলানা সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় দান খয়রাতের জন্যে বক্তব্য রাখেন। ওয়াজ শেষে ভলান্টিয়ারগণ দুটো রুমাল দিয়ে শ্রোতাদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। বলা হয়, একটি রুমাল মসজিদের জন্যে এবং ওপরটি মাওলানা সাহেবের জন্যে। সংগ্রহ শেষে হিসাবের জন্যে দুটো রুমাল এক স্থানে রাখা হয়। মাওলানা সাহেব তখন তার জন্যে সংগৃহীত অর্থ কিছু না বলেই নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দেন। তারপর মসজিদের জন্যে সংগৃহীত অর্থ নিজ হাতে তুলে নিয়ে বলেন; এ সামান্য অর্থ দিয়ে আর আপনারা কি করবেন। এ বলে পাউন্ডগুলো তার এক ভক্তের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, যাও, এ দিয়ে আমার টিকেট কেটে নিয়ে এসো। ব্যাপার দেখে পাশে বসা মসজিদের সভাপতি ও সেক্রেটারী শুধু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চেয়ে রইলেন। চাঁদার ওয়াজ যারা করেন তাদের ব্যাপারে আরো অসংখ্য ঘটনা পাঠকদের হয়তো জানা আছে। তারা রীতিমত দরদস্তুর করে ওয়াজে যান এবং নিজ প্রাপ্য অর্থ আদায় করার জন্যে প্রয়োজনে দুর্ব্যবহার করতেও পিছপা হননা। ভাড়াটিয়া ওয়ায়েজ আর ভাড়াটিয়া মোনাজাতকারীদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমার জানা নেই। এর নাম ধর্মব্যবসা এবং ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করে তারা ইসলামের দুশমন।

উপমহাদেশের আলেমদের মত পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা থেকেও আলেম উলামা বিলাতে আসেন। নিউ ইয়র্ক ব্রুকলিন মসজিদের ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে এক জন। সিরাজ ওয়াহহাজ শুধু বিলাত আসেন না , দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে ওপর প্রান্ত পর্যন্ত তার যাতায়াত। কিন্তু ওয়াজ করা তার পেশা নয়। তার বক্তৃতার ক্যাসেট বিক্রির পয়সা এবং ইমাম হিসেবে মসজিদ থেকে তিনি যে বেতন পান তা দিয়েই তার জীবন চলে। ৯৩ সালে আমরা এক ইসলামী সম্মেলনে তাকে প্রধান অতিথি করে এনেছিলাম। তখন তাকে নিয়ে আমরা দুটো প্রোগ্রাম করেছি। একটি রিজেন্স পার্ক মসজিদে এবং ওপরটি ইষ্ট লন্ডনের টয়েনবি হলে। তিনি সপ্তাহ খানেক আমাদের সাথে ছিলেন। তার সাথে চলাফেরা ও উঠাবসা করে খুবই অভিভূত হয়েছি। কি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন! অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে এখানে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটি থেকে হাদিয়া-তোহ্ফার ব্যাপারে তার মনোভাব কি তা বোঝা যায়। আমাদের প্রোগ্রামে আসা উপলক্ষে হাদিয়া হিসেবে আমরা তাকে পাঁচ শ'পাউন্ড দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সবাই মিলে বহু পীড়াপীড়ি করেও পাউন্ডগুলো তার হাতে তুলে দিতে পারিনি। তার সাফ কথা, আপনারা প্লেনভাড়া দিয়েছেন, রেখেছেন, খাইয়েছেন - এসবই যথেষ্ট। এর বাইরে আমার কিছু লাগবেনা। কোন ভাবেই তাকে এ ব্যাপারে রাজি করতে না পেরে আমরা অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করি। আমরা তার বক্তৃতার সবগুলো ক্যাসেট কিনে নিই এবং তাকে একটি শোভন হ্যান্ডব্যাগ হাদিয়া হিসেবে প্রদান করি। ক্যাসেটের অর্থ তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন, কিন্ত হ্যান্ডব্যাগ নেয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি উত্তাপন করেন। অবশ্য আমাদের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত তা তিনি গ্রহণ করে নেন।

ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজকে নিয়ে যে কথা এখানে উল্লেখ করেছি এ রকম ব্যবহার আমরা উপমহাদেশের কয়জন আলেমের কাছ থেকে আশা করতে পারি? কেউ কেউ হয়তো এ রকম আছেন। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের অবস্থাই অত্যন্ত দুঃখজনক। মনে হয় অর্থের জন্যে তারা নিজেদের কুরবানী করে দিতে প্রস্তুত। অর্থ পেলে হেন কাজ নেই যা তারা করতে পারেন না। অর্থের বিনিময়ে তারা তালাক দেয়া বউ ফিরিয়ে আনতে পারেন, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী আলেমদের এ বলে নিন্দা করেছেন যে তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ্র কিতাব বিক্রি করে ফেলতো। আমাদের আলেম-উলামারা যা করছেন তা কি ইহুদীদের থেকে কিছু কম? দুনিয়াপাগল এ সকল নকল নায়েবে নবীদের থেকে মুসলমানরা যতদূরে থাকবেন ততই ইসলামের কল্যাণ হবে বলে আমি মনে করি। কারা এ দেশে অর্থের জন্যে আসেন এবং কারা ওয়াজ নসীহতের জন্যে আসেন তা বোঝার সহজ উপায় হল হাদিয়া দেয়া বন্ধ করে দেয়া। হাদিয়া না দিলেও যদি আসেন এবং ওয়াজ করেন তা হলে বুঝতে হবে তিনি অর্থের গোলাম নয়,খাটি নায়েবে নবী। কিন্তু বিলাত প্রবাসী সরলপ্রাণ মুসলমানরা কি আলেমদের এ অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার সাহস রাখেন?

লন্ডন ২০ জুন ২০০০

www.pathagar.com

টনি ব্লেয়ারের কুরআন অধ্যয়ন
এবং বাঙালীর সাঈদী প্রতিরোধ আন্দোলন

যে সময় বিলাতে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বোঝার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে সে সময় বাঙালী মুসলমানরা মাওলানা সাঈদীর কুরআনের মাহফিল বর্জনের নয়, প্রতিরোধের ডাক দিচ্ছেন। কেউ কারো সভা-সমিতি বর্জন করতে পারে, এ অধিকার সবারই আছে। কিন্তু প্রতিরোধ করা বা প্রতিরোধের ডাক দেয়া সাধারণ কাজ নয়। ইষ্ট লন্ডনে বাঙালী তরুণরা যখন পরস্পর কুড়াল লড়াই করে তখন সে কুড়াল লড়াই প্রতিরোধের ডাক আমরা শুনতে পাইনা। আমি জানিনা তখন আমাদের এ সকল স্বঘোষিত নেতা, উপনেতা ও পাতিনেতারা কোথায় থাকেন। আমাদের তরুণরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের নেতাদের মাথাব্যথা নেই। চোখ কান খোলা রেখে ইস্ট লন্ডনের রাস্তা দিয়ে হেটে গেলেই ড্রাগস ও অন্যান্য অপরাধের সাথে আমাদের তরুণরা কতটুকু জড়িয়ে আছে তা অনুমান করা যায়। জেলের খবর যাদের কাছে আছে তারা জানেন বাঙালী কয়েদীর সংখ্যা কি হারে বাড়ছে। কিন্তু এ সব আমাদের তথাকথিত নেতাদের বিচলিত করেনা। তাদের সকল মাথাব্যথা সাঈদীকে নিয়ে। আপনার যদি ভাল না লাগে আপনি কুরআনের মাহফিলে যাবেননা। সাঈদীর মাহফিলে যেতে কে আপনাকে বাধ্য করছে? অবশ্য কুরআনের মাহফিলে সকলের যাওয়ার তওফিক হয়না। আল্লাহ যাদের তওফিক দেন তারাই কুরআনের মাহফিলে যেতে পারে। কুরআনের মাহফিলে না যাওয়া এক কথা আর বাধা দেয়া ভিন্ন কথা। কুরআনের মাহফিল যে-ই করুক আপনি বাধা দিতে পারেননা। কুরআনে আল্লাহ্ একদল লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা অন্যান্যদের এ বলে আহ্বান জানায় যে তোমরা কুরআন শুনবেনা এবং কুরআনের মাহফিলে হৈ চৈ করবে। যারা কুরআনের মাহফিলে বাধা প্রদান করে তারা কোন্ পর্যায়ের মুসলমান তা এ আয়াতের আলোকে বিচার করা দরকার। কতিপয় রাজনৈতিক নেতার ধাপ্পাবাজী এবং এক দল লোকের হলুদ সাংবাদিকতার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যারা সাঈদী প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমেছেন তারা বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন। তবে জেনে রাখা ভাল, এ দেশ বাংলাদেশ নয় যে কারো সভা আপনি গায়ের জোরে ভেঙে দিবেন। শেখ হাসিনার বাংলাদেশতো আরো এগিয়ে। সেখানে মন্ত্রীরা বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুমকি দিয়ে বলেন আওয়ামী লীগ কোটি বার লাঠি মিছিল করবে। কিন্তু এ দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ নয়। এখানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলের আছে এবং তা প্রকাশে কেউ বাধা দিলে রাষ্ট্রের পক্ষথেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

আমরা বাঙালীরা কুরআন ও ইসলামকে মৌলবাদ বলে বর্জন করলে ইসলামের কিছু যায় আসেনা। বরং তা হবে আমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে দুর্ভাগ্যের কারণ। তবে এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় অমুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃটেনে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হচ্ছেন সাদা চামড়ার নারী ও পুরুষ। আমরা বাঙালী মুসলমানরা মৌলবাদী হয়ে যাব এ ভয়ে ইসলামের পক্ষে কথা বলিনা। কিন্তু এ ভয় প্রিন্স চার্লসের নেই, নেই টনি ব্লেয়ারের। গত ১০ মে ২০০০ প্রিন্স চার্লস ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ছাত্র-ছাত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন,

'You are ambassadors for a somtimes much misunderstood faith. I believe that Islam has much to teach incrasingly secular societies like ours in Britain.' প্রিন্স চার্লস এ ধরনের কথাবার্তা অতীতেও বহুবার বলেছেন। বৃটেনের

ভাবিষ্যৎ রাজার দৃষ্টিতে বৃটেনের সেকুলার সমাজের জন্যে ইসলামের নিকট থেকে শেখার বহু জিনিস রয়েছে। কিন্তু আমারা বাঙালী মুসলমানরা কি তা মানি বা বিশ্বাস করি? আমাদের কাজকর্ম ও জীবন যাপন থেকে কি মনে হয়?

গত বছর ৫ মে কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের পক্ষথেকে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সেখানে টনি ব্লেয়ার তার নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে ইসলাম সম্পর্কে বহু কথা বলেছেন। যারা সেকুলারিজম বলতে অজ্ঞান তাদের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সেদিনের বক্তৃতাটি পড়ে দেখা দরকার। তিনি সেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি তার ছেলেমেয়েকে খৃষ্টান হিসেবে গড়ে তুলছেন। তবে 'চিলড্রেন অব আব্রাহাম' হিসেবে বহুদিক দিয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে মিল রয়েছে। তিনি আরো বলেন, অনেক সময় ইসলামকে ফেনাটিকস, এক্সট্রিমিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এবং এ থ্রেট টু দা ওয়েষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'This is prejudice, pure and simple.It can only be spread by those who have never come into contact with Britain's hard working, peace loving, generous Muslim community.'

সম্প্রতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন লিডস ওয়েষ্টের এম পি এবং ফরেন অফিস মিনিস্টার জন ব্যাটল। গত ৭ মে ২০০০ লিডস সিভিক হল আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি সবাইকে ইসলাম সম্পর্কে জানার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "Follow the Prime Minister's example by reading the Quran". ফরেন অফিস মিনিস্টার জন ব্যাটল সকলকে অবহিত করে বলেন যে গত ক্রিসমাস হলিডে এর সময় অর্থাৎ রমজান মাসে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কুরআন মজিদ পড়ে

www.pathagar.com

নিয়েছেন। খবরটা একদিকে যেমন আনন্দের তেমনি আমরা কিছু সংখ্যক মুসলমানের জন্যে লজ্জাজনক। আমরা কজন বাঙালী মুসলমান বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব যে আমি গোটা কুরআন মজিদ অর্থসহ কমপক্ষে একবার অধ্যয়ন করেছি? টনি ব্লেয়ার সওয়াবের জন্যে কুরআন পড়েননি, বোঝার জন্যে পড়েছেন। কতটুকু বুঝেছেন বা বুঝেননি সে প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু আমরা মুসলমানরা কুরআন বুঝতে চাইনা। আমরা কুরআন পড়ি শুধু সওয়াবের জন্যে, মেনে চলার জন্যে নয়। মেনে চলতে হলে কুরআন বুঝতে হবে এবং বুঝতে হলে তাফসির মাহফিলে যেতে হবে। আমরা কুরআনকে ব্যবহার করি জ্বীন-ভূত বিতাড়নের কাজে, পেটব্যথা-মাথাব্যথা সারাতে এবং ব্যবসার উন্নতির জন্যে তাবিজ হিসেবে। তাই আমাদের তাফসির মাহফিলের প্রয়োজন পড়েনা। বরং আমরা দরকার হলে লন্ডন থেকে, নিউক্যাসল থেকে লিডস পর্যন্ত গিয়ে তাফসির মাহফিল ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করতে কুণ্ঠাবোধ করিনা।

শুধু টনি ব্লেয়ার নয় আরো বহু গন্যমান্য ব্যক্তি কুরআন বোঝার চেষ্টা করছেন। এ দেশে যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন তারা বুঝেশুনে ইসলাম কবুল করছেন। আমার বহু নতুন মুসলমানের সাথে আলাপ হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর যে কাজকে তারা প্রাধান্য দেন তা হল কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন। তারা মনে করেন মুসলমান হওয়ার পর আমাদের প্রথম কাজ হল কুরআনে কি আছে তা জানার চেষ্টা করা। আমরা পুরাতন মুসলমানদের অবস্থা দেখে তারা মাঝে মাঝে খুব অবাক হয়ে যান। জন্মসুত্রে ও বংশপরম্পরায় আমরা মুসলমান। কিন্তু না জানি আমরা কুরআনের ভাষা, না শুদ্ধ করে কুরআন পড়তে পারি এবং না আছে কুরআন বোঝার কোন প্রচেষ্টা। দুনিয়ার বহুকিছু আমরা শিখছি এবং জানছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম জানার ও শিখার আগ্রহ আমাদের নেই। অথচ আমরা দাবি করি আমরা কুরআনের উপর ঈমান এনেছি। হাদীস অনুযায়ী কুরআন হয় আপনার-আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে নতুবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আমাদের কাজ দ্বারা কি বোঝা যায়? কেয়ামতের দিন কুরআন কি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে?

www.pathagar.com

বিলাতে
ঈদুল আজহা

আনন্দের বিষয় যে আমরা বৃটেনের মুসলমানরা সবাই এবার এক দিনে ঈদুল আজহা উদযাপন করেছি। এ দৃষ্টান্ত আগামী দিনগুলোতে অনুসরণ করলে আমরা ওলামায়ে কেরামকে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাবো।

ঈদ মুসলমানদের উৎসব। এ উৎসব শুধু আনন্দের নয়, আবার আনন্দ বাদ দিয়েও নয়। ঈদ একটি ইবাদত এবং সামাজিক ভাবে তা আদায় করতে হয়। একা একা ঈদ উদযাপন করা যায়না, ঈদের নামাজও পড়া যায়না। ঈদুল আজহার দিনে প্রধানতঃ দুটো কাজ আমাদের করতে হয়। জামাতের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করা এবং কুরবানী দেয়া। কিন্তু আমরা দেখি আমাদের কিছু সংখ্যক তরুণ-তরুণী জাহেলী কায়দায় ঈদ উদযাপন করার চেষ্টা করেন। দামী গাড়ি ভাড়া করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফেরা করা, অযথা ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ঝামেলায় ফেলা, হৈ চৈ করে, হর্ন বাজিয়ে মানুষকে বিব্রত করা ইত্যাদি কাজের সাথে ঈদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের কাজ করে আমাদের তরুণরা বৃটেনের অমুসলিমদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা প্রদান করছে। মা-বাবা এবং অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে এখনই সচেতন না হলে আগামীতে তা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে। ইসলামের জন্যে আমরা ইতিবাচক কিছু করতে না পারলেও এমন কিছু করা কখনো উচিত নয় যা করলে অমুসলমানদের কাছে ইসলামের বদনাম হয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা এবার ঈদের সময় ইষ্ট লন্ডন এলাকায় যা করেছে এর সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক না থাকলেও বদনাম এসে ইসলামের গায়েই লেগেছে। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসবের অজুহাতেই সকল হৈ-হল্লা করা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মনে করার কারণে পুলিশ এ ব্যাপারে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

ঈদুল আজহা সম্পর্কে মহানবী (সঃ) এর বানী হচ্ছে, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিম (আঃ) এর সুন্নাত। হযরত ইবরাহিম যে ভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে নিজেকে সমর্পন করে দিয়েছিলেন সে ভাবে আমরা সবাই অবনত মস্তকে আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশকে গ্রহণ করবো। প্রয়োজন হলে আল্লাহ্‌র পথে আমরা আমাদের মূল্যবান জীবনকে পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধা করবোনা। ঈদুল আজহার এটাই শিক্ষা। এর সাথে জাহেলী কায়দায় কাপড়-চোপড় পরিধান করার এবং ক্রিসমাস ষ্টাইলে চলা ফেরার কি কোন মিল আছে? আমাদের ছেলেমেয়েকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা প্রদান এবং দোযখের আগুন থেকে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী, এ দায়িত্ব আঞ্জাম না দিয়ে বছরে বছরে হজ্ব করে বা ৩৬৫ দিন মসজিদে পড়ে থেকে আল্লাহ্‌কে খুশি করা যাবে না। আমাদের উৎসব যদি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করে তাহলে সে উৎসব কতটুকু ইসলামী তা আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার।

আজকের লেখায় ঈদুল আজহার সাথে সম্পর্কিত অন্য একটি বিষয়ের প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা উপমহাদেশের মুসলমানরা সাধারণতঃ ঈদুল আজহার সময় কুরবানীর টাকা নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেই। এর কারণ হিসেবে আমরা যে যুক্তি দেখাই তা হলো দেশের অধিকাংশ মানুষ গরীব ও অভাবগ্রস্থ। দেশে কুরবানী দিলে তারা এ থেকে উপকৃত হবে। সুন্দর যুক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ?

হাদীস অনুযায়ী ঈদুল আজহার দিনে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় কাজ হলো কুরবানী দেয়া। আমরা বাংলাদেশে কুরবানীর টাকা পাঠিয়ে দিয়ে এ পসন্দনীয় কাজ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছি। কেউ হয়তো বলবেন, দেশের বাড়িতে কুরবানী দিলে তা কি আদায় হবেনা? আদায় হবে কি হবেনা সে বিতর্কে আমি যেতে চাইনা। আমার কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে সুন্নাহ হলো নামাজের পর আমরা কুরবানী দেব এবং ঈদুল আজহার দিন এটাই প্রধান ইবাদত। কিন্তু এ ইবাদত আমরা পালন করছিনা। মহানবী(সঃ) মদীনায় থাকা অবস্থায় সব সময় মদীনায়ই কুরবানী দিয়েছেন। তাঁর কুরবানীর টাকা বা পশু মক্কায় বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেননি। সে হিসেবে আমরাও হজ্বের সময় মক্কায় কুরবানী দেব। অন্য সময় যখন যেখানে থাকবো সেখানে কুরবানী আদায় করবো। দেশে কুরবানী দিতে হলে প্রথমে ওয়াজিব কুরবানী এখানে আদায় করতে হবে। তারপর যত ইচ্ছা নফল কুরবানী দিতে চাই দিতে পারি এবং তা পৃথিবীর যে কোন দেশে পাঠাতে পারি। সবচেয়ে ভালো হয় আমরা নিজেরা যদি ছেলেমেয়ে সহ এ সময় দেশে চলে যাই। তাহলে নিজ হাতে কুরবানী দিতে পরবো এবং নিজ হাতে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গরীবদের এক বেলা মাংস খাওয়ার সুযোগ করে দেয়া কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য নয়। কুরবানীর সমুদয় মাংস যদি কাউকে না দিয়ে আপনি খেয়ে নেন তা হলেও আপনার কুরবানী আদায় হবে এবং এ জন্যে আপনার কোন গোনাহ হবেনা। আপনার যদি গরীব ও অভাবগ্রস্থের জন্যে দান করার ইচ্ছে হয় তা হলে যত ইচ্ছা দান করতে পারেন এবং এ দানের নাম হচ্ছে সাদাকাহ। কুরবানী ও সাদাকাহ এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং আমাদের তা বোঝার চেষ্টা করা দরকার। কুরবানীর মাংস সবাই খেতে পারে কিন্তু সাদাকাহ শুধুমাত্র গরীবরাই খাবে। বিত্তশালী এবং রাসুল (সঃ) এর আওলাদের জন্যে সাদাকাহ (যাকে আমরা সদকা বলে থাকি) খাওয়া নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

আরেকটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ফেতরার টাকা যখন দেশে পাঠাই তখন এর হিসাব কি ভাবে করি? আমরা সে সময় বৃটেনের বাজারদর হিসেবে ফেতরার টাকা দেশে পাঠাই। আমার মনে হয়,এবার যারা দেশে ফেতরার টাকা পাঠিয়েছেন তারা জনপ্রতি কমপক্ষে দু থেকে তিন পাউন্ড হারে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কুরবানীর সময় সে হিসাব কোথায় যায়? এ দেশে এক রসদ কুরবানী দিতে এ বছর ৬০ থেকে ৯০ পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে। যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা ভারতে কুরবানীর টাকা পাঠিয়েছেন তারা কত টাকা পাঠিয়েছেন? বাংলাদেশে ১০ হাজার টাকায় একটি গরু পাওয়া যায় এবং ১টি গরু দিয়ে ৭রসদ কুরবানী দেয়া যায়। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ১০হাজার টাকার জন্য ১৩০ পাউন্ডের প্রয়োজন। অর্থাৎ মাত্র ২০ পাউন্ড দিয়ে আমরা এক রসদ কুরবানী দিচ্ছি। এ ভাবে কুরবানী দিলে কি কুরবানী আদায় হবে? আলেমরা এ ব্যাপারে কি বলেন?

আগেই বলেছি ঈদের সামাজিক একটা দিক রয়েছে এবং একা একা তা অর্জন করা যায়না। কুরবানী কি, কেন এ রক্তপাত, এ থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি, কুরবানীর গোশ্ত কি ভাবে বন্টন করতে হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের পরিবারে এবং সমাজে আলাপ-আলোচনা হওয়া খুবই জরুরী। এর ফলে আমাদের নিজেদের জ্ঞান তরতাজা হয় এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু জানতে পারে। একদিনের বাস্তব ট্রেনিং থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা যা জানবে, আমার মনে হয় ১০টা সেমিনার করে এর অর্ধেক জ্ঞানও তাদের দেয়া যাবেনা। একটা অমুসলিম পরিবেশে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসবাস করছি। ঈদুল আজহার শিক্ষা, পটভূমি, উদযাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে তারা কি ভাবে অবহিত হবে? কেন নবী ইবরাহিম তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হলেন এবং কেন আল্লাহ্ শিশু ইসমাইলের পরিবর্তে দুম্বা এনে হাজির করলেন এ সকল কথা আপনার আমার ছেলেমেয়েরা কোথা থেকে জানবে? আমি জানিনা আমাদের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কি বলেন এবং তারা এ বিষয়ে কি চিন্তা করছেন। তারা যদি আমার সাথে একমত হন তাহলে দয়া করে কথা বলুন। যদি কেউ দ্বিমত পোষণ করেন তাহলেও তার কথা শোনা দরকার। কুরআন, হাদীস এবং রাসুলে খোদা (সঃ)এর আমল থেকে কুরবানী সম্পর্কে আমি যতটুকু বুঝেছি তা এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আমি বুঝতে গিয়ে ভুল করে থাকলে আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। কোন সহৃদয় আলেম আমার ভুল সংশোধন করে দিলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো।

www.pathagar.com

বিলাতের
ওলামায়ে কেরাম সমীপেষু -১

আলেম তাদেরই বলা হয় যারা ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন এবং হাদীসে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বহু কথা রয়েছে। আলেমের মৃত্যুকে আলম বা জগতের মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইসলামী জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে যারা পথে বের হবে আল্লাহ তাদের জন্যে বেহেশতে যাওয়ার পথ সহজ করে দিবেন বলে মহানবী (স:) ইরশাদ করেছেন। আলেমরা কুরআন-হাদীসের ভাষা জানেন, জানেন কোন্ পথ জান্নাতের দিকে গিয়েছে এবং কোন্ পথ গিয়েছে জাহান্নামের দিকে। তাঁরা নবীদের উত্তরাধিকারী। এ সকল কারণে আমরা আলেমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করি, তাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি।

ভারতীয় উপমহাদেশে আলেমদের মাওলানা বলে ডাকা হয়। আরবীতে মাওলা অর্থ মনিব, প্রভু, মালিক বা অভিভাবক। মাওলানা মানে আমাদের প্রভু বা অভিভাবক। মুনাজাতের সময় আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলি 'আনতা মাওলানা', অর্থাৎ তুমি আমাদের মনিব। দুরুদ শরীফ পড়ার সময় আমরা নবী(স:)এর উদ্দেশ্যে বলি 'মাওলানা মুহাম্মদ'। আলেমদের যখন আমরা মাওলানা বলে সম্বোধন করি তখন ভিন্ন অর্থে তা করি। এর পরিভাষিক অর্থ তখন হয় ইসলামীশাস্ত্রে পন্ডিত। যারা কুরআন এবং হাদীস জানেন, এবং ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাদেরই আমরা মাওলানা নামে অভিহিত করি।

যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন, কিন্তু তেমন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন নয় তাদের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে আরেকটি উপাধি ব্যবহৃত হয়। সে উপাধি হল মৌলবী। সাধারণ মানুষের কাছে মাওলানা এবং মৌলবী এ দু' শব্দের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। কিন্তু আলেমদের কাছে দু'টি শব্দের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ জন্যেই কোন মাওলানাকে মৌলবী বলে সম্বোধন করলে তিনি সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন।

সিলেটে এবং বৃটেনের সিলেটী জনগোষ্ঠীর কাছে আলেমদের সাধারণ উপাধি হচ্ছে 'মিয়াছাব' 'মলৈসাব' 'হুজুর' অথবা 'মলিছাব'। 'মিয়াছাব' এবং 'হুজুর' অবশ্য বাংলাদেশের সর্বত্রই ব্যবহার হতে দেখা যায়। মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, মক্তবের শিক্ষক, দাড়ি-টুপি পরিহিত যে কোন ব্যক্তি এবং যে সকল গৃহশিক্ষক বাসায় বাসায়

www.pathagar.com

গিয়ে আরবী শিক্ষা দেন তাদের সবাইকে বাংলাদেশে সাধারণ ভাবে হুজুর বা মিয়াছাব বলে ডাকা হয়। ইসলামী জ্ঞান বা কুরআন-হাদীসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। নিছক বেশভূষার কারণে আক্ষরিক অর্থে অনেক মুর্খকেও হুজুর বা মিয়াছাব বলে অভিহিত করা হয়। আমার মনে হয় 'মিয়াছাব' 'মলৈসাব' এবং 'মলিছাব' এ তিনটি শব্দ মৌলবী সাহেবেরই বিকৃত রূপ। সে হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে কোন আলেমই মাওলানা নয়। সকল আলেমই তাদের কাছে মিয়াছাব বা হুজুর।

সাধারণ মানুষ আলেমদের মিয়াছাব বলে সম্বোধন করে না বোঝার কারণে আর আমাদের আলেম সমাজ তাদের ভূমিকা দিয়ে প্রমাণ দিচ্ছেন যে তারা আসলেই নিছক মিয়াছাব বা হুজুর মাত্র, তারা মাওলানা নয়। মাওলানা শব্দের সাথে ইসলামী জ্ঞানের এবং সে অনুযায়ী কাজের সম্পর্ক। এ কথা সত্য যে কুরআন-হাদীসের ভাষা না জেনে কারো পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু এর চেয়ে বেশী সত্য হচ্ছে, কারো যদি ইসলাম সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান থাকে তা হলে তার কাজ ও কর্মতৎপরতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে এ বলে ইহুদী আলেমদের সমালোচনা করেছেন যে, যাদের কাছে খোদা প্রদত্ত কিতাব তাওরাত রয়েছে কিন্তু সে অনুযায়ী তারা তাদের জীবন পরিচালনা করেনা করেনা তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারবাহী পশু গাধার মত। গাধার পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে দিলে তা তারা বহন করে নেয়, কিন্তু বই-পুস্তক তাদের জীবনে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনা। ইহুদী আলেমদের আল্লাহ যে সব কারণে সমালোচনা করেছেন সে সব কারণ থেকে আমাদের আলেম সমাজ কতটুকু দূরে আছেন তা আপনারা আলেম সমাজই পর্যালোচনা করে দেখুন।

আলেমদের সম্মান ও মর্যাদার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলাম কি এবং ইসলামের অনুসারী মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কি তা একজন আলেমের কাছে যতটুকু পরিষ্কার অন্যদের কাছে ততটুকু নয়। নীতিগত ভাবে প্রতিটি মুসলমানই ইসলামের এক একজন প্রতিনিধি। তবে আলেম সমাজই ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখেন। আলেমরা নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার মানে হচ্ছে নবীরা যে কাজ করেছেন তারাও সে কাজকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিবেন। আমি আমার সীমিত জ্ঞান দিয়ে বুঝি যে নবীরা পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিয়েছেন এবং জাহান্নামের পথে ধাবমান মানুষকে জান্নাতের পথে ডেকেছেন। অসহায় মানুষের তারা ছিলেন সহায়, নিরাশ্রয়ের ছিলেন আশ্রয়। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র গোলাম বানানোর উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ছিল তাদের সকল প্রচেষ্টা। ঘর-সংসার তাদের ছিলো, ছেলেমেয়ে, পরিবার পরিজন নিয়ে তারা বসবাস করেছেন। কিন্তু এ সব কখনো তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি বা দাঁড়াতে পারেনি। নবীদের কাজ সম্পর্কে আমি যদি ভূল কথা বলে থাকি অথবা আমার এ বক্তব্যের সাথে কোন আলেমের দ্বিমত থাকলে ইসলামী সমাচারের মাধ্যমে জানতে দিলে আমার ভূল

www.pathagar.com

শোধরে নেব। এখন আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা দরকার আমাদের আলেম সমাজ নবীদের উত্তরাধিকারের কাজ কতটুকু সম্পন্ন করছেন। কি কাজ নিয়ে তারা ব্যস্ত আছেন এবং তাদের সে কাজ কতটুকু সুকাজ বা কুকাজ।

উল্লেখ্য যে এদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে যে সকল আলেম বের হচ্ছেন আমি তাদের এ আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। এর কারণ হচ্ছে, প্রথমত: আমার এ লেখা তারা কেউ পড়বেন বলে মনে হয়না। কেউ পড়লেও তেমন বুঝতে পারবেন না। কেননা তারা লিখিত বাংলা খুব একটা জানেন না বলেই আমি জানি। দ্বিতীয়ত: এখানে যে সব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনার প্রয়াস চালাচ্ছি এগুলোর সাথে তাদের অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট নয়। তারা এসব থেকে অনেকটা মুক্ত রয়েছেন।

আল্লাহ্‌র রহমতে বর্তমানে বৃটেনে আলেমের অভাব নেই। অসংখ্য আলেম এখানে বসবাস করছেন। তাদের সংখ্যা বছরে বছরে বাড়ছে। বিয়ে-শাদী করে এবং অন্যান্য ভাবে বহু তরুণ আলেম বৃটেনে আসছেন। অপর দিকে ভিজিটর হিসেবে যারা আসেন তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। প্রতি বছর ছোট, বড়, এবং মাঝারি সাইজের ও মাপের ওলামায়ে কেরাম আমাদের দেখতে আসেন। তাদের পেয়ে আমরা ধন্য হই। তারাও যে ধন্য হন তা বোঝা যায় বছরে বছরে তাদের আগমন থেকে।

প্রথমে দেখা যাক যারা এদেশে বসবাস করেন তাদের জীবন কি ভাবে, কোন ধান্ধায় কাটছে। সাধারণত: এ দেশের আলেমরা পেশায় মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষক। কেউ কেউ ঘরে ঘরে গিয়ে বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পেশা হিসেবে এ সকল কাজ অত্যন্ত সম্মানের এবং দ্বীনি দিক থেকে এর মাধ্যমে তারা খুব প্রয়োজনীয় একটি দায়িত্ব পালন করছেন । কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের এ খেদমত থেকে আমরা কি অর্জন করছি? মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ও এগুলোর খেদমত করা সওয়াবের কাজ, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমাদের সে দিকটাও দেখা দরকার যে মসজিদ-মাদ্রাসার উদ্দেশ্য কি? মসজিদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদার স্থান এবং সাথে সাথে তা হেদায়াত পাওয়ার কেন্দ্র। বৃটেনে যে সকল মসজিদ আছে এর কয়টি থেকে হেদায়াতের বানী প্রচারিত হয়? এ সকল মসজিদের কয়টি মুসলিম উম্মাহ্‌র এবং কয়টি দল বা ফেরকার?

সত্য কথা হচ্ছে আমাদের মসজিদের অভাব নেই, কিন্তু ইসলাম বা মুসলিম উম্মাহ্‌র খেদমতে নিয়োজিত মসজিদ এখানে খোজে পাওয়া কঠিন। কোথাও হচ্ছে নিজের খেদমত এবং কোথাও দল, গোষ্ঠী বা ফেরকার খেদমত। এ কারণেই যখন চেচনিয়ায় মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় তখন না মসজিদের মিম্বর থেকে কোন কথা বলা হয়, না মুসল্লিরা এ ব্যাপারে কোন আওয়াজ তুলেন। ধন্য আলেম সমাজ এবং ধন্য আপনাদের গোলামী।

www.pathagar.com

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর এবং আল্লাহ্‌র সকল বান্দাদের জন্যে তা খোলা থাকবে। আমরা বৃটেনে কি দেখতে পাই? আমরা এখানে দেখি বাঙালি মসজিদ, গোজরাটি মসজিদ, পাকিস্থানি মসজিদ, তবলিগী মসজিদ, জামাতী মসজিদ, জমিয়তী মসজিদ, সুন্নী মসজিদ ইত্যাদি নামে মসজিদগুলো চিহ্নিত। এ থেকে কি এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায়না যে আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলাম বা গোটা মুসলিম জাতির খেদমতের লক্ষ্যে এ সকল মসজিদ কাজ করছেনা।

এখানে আরেকটি মজার জিনিস লক্ষ্য করার মত। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যে সকল আলেম-উলামা বৃটেনে ওয়াজ নসীহত করতে আসেন তারা সবাই কিন্তু সকল মসজিদে যান না অথবা তাদের যেতে দেয়া হয়না। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ফেরকা বা দলের মসজিদে যান এবং দলীয় ব্যক্তি হিসেবেই ওয়াজ নসীহত করেন। এভাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে চলমান দলাদলি ও ফেরকাবাজি বৃটেনে আমদানী ও লালিত হচ্ছে।

আলেমরা হয়তো বলবেন, 'আমরা ওখানে চাকরি করি, মসজিদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মসজিদ কমিটির হাতে। আমরা কিছু বললে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।' এ ব্যাপারে আমার কথা হল, এ ধরনের গোলামী কোন নায়েবে নবীর জন্যে শোভা পায়না। যে মসজিদ কমিটি কুরআন-হাদীসের আলোকে মসজিদকে হেদায়াতের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে বাধা দেয় সে কমিটির অধীনে চাকরি করা একজন নায়েবে নবীর জন্যে উচিত নয়। তা ছাড়া ইমাম মানে নেতা, চাকর নয়। মসজিদ চলবে ইমামের নেতৃত্বে। ইমাম যদি সেখানে চাকর হয়ে যান তা হলে সে ইমামের ইমামতি করার বৈধতা আর থাকেনা।

এর পরও প্রশ্ন রয়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসার খেদমতের বাইরে যে সময় থাকে সে সময়টা তারা কি ভাবে অতিবাহিত করেন অথবা যারা মসজিদ মাদ্রাসার সাথে জড়িত নয় তাদের সময় কোন ধান্ধায় কাটে? আমার জানা মতে বৃটেনে তাবিজ ব্যবসা খুবই জমজমাট। যাদু-টোনা ও জ্বীন-ভূতের আছর নিয়ে মুসলমানরা খুব উদ্বিগ্ন। এ সব কাজে নগদপ্রাপ্তির পরিমানও খুব বেশি। আমাদের আলেমরা যদি পয়সার ধান্ধায় শুধু কল্পিত জীন-ভূত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তা হলে মানুষ শয়তান এবং জ্বীন শয়তান বিতাড়নের কাজ কে করবে?

www.pathagar.com

বিলাতের
ওলামায়ে কেরাম সমীপেষু -২

গত সংখ্যার লেখা পড়ে কিছু সংখ্যক সম্মানিত আলেম বেশ নাখোশ হয়েছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আলেমদের বিরুদ্ধে বলার লোকের অভাব নেই। লেখার জিনিষের কি এতো অভাব দেখা দিয়েছে যে শেষ পর্যন্ত নায়েবে নবীদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হবে? না, লেখার বিষয় নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে সময়ের। তবে আলেমদের সম্পর্কে লেখা জরুরী মনে করেছি বলেই আমি এ ব্যাপারে কলম ধরেছি। ভুল বা অন্যায় কিছু লিখে থাকলে অগ্রিম মাফ চেয়ে নিচ্ছি, ভুল ধরিয়ে দিলে অবার মাফ চাইবো।

যাক সে সব কথা। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কি কাজে বৃটেনের নায়েবে নবীদের সময় কাটে এবং তারা যে সকল কারণে বিশেষ সম্মানের অধিকারী তাদের ব্যস্ততার সাথে এর কতটুকু মিল রয়েছে? যারা আলেম নয় এ দেশে তাদের সময় কাটে পয়সার ধান্দায়। আলেমরাও যদি শুধু এ ধান্দায় থাকেন তা হলে তারা ইলমের হক কি ভাবে আদায় করবেন? কেউ হয়তো বলবেন তাদের কি পেট-পিঠ নেই? পেট-পিঠ অবশ্যই আছে, হালাল রুজীর চেষ্টা করাও ফরজ কাজ। কিন্তু সম্পদের পাহাড় গড়া অবশ্যই ফরজ নয়, বরং এর নাম অর্থলিপ্সা এবং তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র সবচেয়ে বড় সমস্যা কি, সাধারণ মুসলমানদের যদি এ প্রশ্ন করা হয়, তাহলে দশজনের মধ্যে নয়জনই বলবেন, আলেমদের মধ্যে অনৈক্যই মুসলিম উম্মাহ্‌র সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু আলেমরা এ কথা মানতে রাজি নয়। তাদের মতে আলেমদের অনৈক্য আল্লাহর এক রহমত। আলেমদের অনৈক্য আল্লাহর রহমত তখন হয় যখন তারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে একাডেমিক আলোচনা করেন। কিন্তু একাডেমিক আলোচনাকে যখন তারা পাবলিকের সামনে নিয়ে আসেন তখন তা গজবে পরিণত হয়। মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানেনা বলেই আলেমদের কাছে আসে। কিন্তু কাছে এসে তারা দেখে শুধূ ফেরকাবাজী। পরিণতিতে তারা ইসলামের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বহু আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। ঘটনাটি বাংলাদেশের। এক সিরাতুন্নবী জলসায় আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে। মহানবী (সঃ)এর জীবন আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। তাই আনন্দের সাথে দাওয়াতটি গ্রহণ করে নিলাম। কিন্তু মাহফিলে যাওয়ার পর পড়লাম এক মহা ফাসাদে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে দু'চার জন এসে বললেন, দুটো বিষয়ে অবশ্যই আমাকে কথা বলতে হবে। প্রথমতঃ মহানবী(সঃ) মাটির তৈরি, না নূরের তৈরি এবং দ্বিতীয়তঃ তাবলিগী জামাতের কাজ।

www.pathagar.com

দুটো বিষয় নিয়েই এলাকায় ঝগড়া-ফাসাদ চলছে। সুতরাং আমার নিকট থেকে খাটি কথাটা পাবলিককে জানান দেয়া দরকার। খাটি কথা কোন্‌টি সে ব্যাপারেও উদ্যোক্তাদের মতামত আছে এবং আমাকে তারা সে মতটি মেনে নেয়ার জন্যে চাপ দিলো। আমি তাদের সাফ জানিয়ে দিলাম, আমি ফরমায়েসী ওয়াজ করতে পারবোনা। আমাকে কাবু করতে না পেরে তারা অন্য এক ফন্দী আঁটলো। ওয়াজের শেষে শ্রোতাদের পক্ষথেকে আমাকে উক্ত দু' বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন করা হলো। তখন আমি জবাব দিতে বাধ্য হলাম। যারা ফাসাদ খুজে বেড়ায় তারা এ ভাবেই কাজ করে।

অবশ্য প্রশ্নগুলোর জবাব আমি আমার মত করে দিয়েছি। প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি, আপনি বা আমি কবরে গেলে অথবা কিয়ামতের দিন এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবেনা। সুতরাং এর জবাব না জানলেও কিছু যায় আসেনা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ছিলো, একটা দল যদি মুসলমানদের নামাজ-কালেমা শিক্ষা দেয় তাহলে যারা নামাজ-কালেমা পসন্দ করে তারা সে দলকে ভালো বলবে,না খারাপ বলবে তা আপনারাই ঠিক করে নিন।

বলছিলাম উলামাদের অনৈক্যের কথা। আসলে পাবলিকের মধ্যে কোন অনৈক্য নেই। অনৈক্যের বীজ আলেমদের মধ্যেই এবং তারাই একে লালন পালন করে বাচিয়ে রাখেন। পাবলিকের ভূমিকা এখানে খুবই গৌন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ অনৈক্যের কারণ কি? এর মধ্যে কি ইসলামী কোন কারণ রয়েছে?

ইসলামী কারণ থাকলেও তা কিছুতেই মুসলিম ঐক্যের চেয়ে বড় নয়। আসল কারণ হচ্ছে, অর্থ ও নেতৃত্বের লোভ। এ দুটো লোভ থেকে আলেম সমাজ মুক্ত হলে ঐক্যের পথে আর কোন বাঁধা থাকবেনা।

গত বছর মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এসেছিলেন। সেখানে কথা প্রসঙ্গে ঈদের দিনকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণার দাবি এসেছিলো। তখন টনি ব্লেয়ারের পক্ষথেকে তার সঙ্গীদের একজন বলেন, 'আপনারা আগে এ ব্যাপারে ঐকমত্যে আসুন যে কোন্‌ দিন আপনাদের ঈদ। তখন আমরা দেখবো কি করা যায়।' শুধু ঈদ নয়, সব ব্যাপারেই আমরা আমাদের অনৈক্যের প্রমাণ দিচ্ছি। ইস্ট লন্ডনের এক এলাকায় মুসলিম কমিউনিটিকে কিছু জমি দেয়ার প্রস্তাব কাউন্সিলের পক্ষথেকে বিবেচনাধীন ছিলো। দুটো গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় বলে আমার কাছে খবর এসেছে।

আসলে আমরা তিন ইটের মসজিদ এবং দশজন ছাত্র নিয়ে মাদ্রাসা করতে আগ্রহী। বড় কিছু, বৃহৎ কিছু করতে হলে ঐক্যের দরকার পড়ে, মতামতের ও নেতৃত্বের কুরবানী করতে হয়। এ কুরবানীর মানসিকতা নেই বলেই আমরা বৃহৎ কিছু করতে চাইনা। দেওবন্দ-সাহারান পুরের কথা আমরা বলি শুধু মুখে, চাঁদা আদায়ের স্বার্থে। বাস্তবে আমরা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মক্তব প্রতিষ্ঠা করছি মাত্র। অবশ্য সে সাধ বা সাধ্য কোনটাই আমাদের নেই। কুয়োর ব্যাঙের মত কুয়োটাই

www.pathagar.com

আমাদের কাছে সমগ্র পৃথিবী। অতীত নিয়ে আমরা গর্ব করি, মুসলমানদের অতীত অবশ্যই গর্ব করার মত। কিন্তু অতীত ধুইয়ে পানি খেলে কি আমাদের বর্তমান উজ্জল হয়ে যাবে?

আপনারা নায়েবে রসুল, আপনারা রসুল (সঃ)এর প্রতিনিধি। অর্থবিত্ত এবং পার্থিব সম্পদ ও সম্মানের গোলামী আপনাদের জন্যে শোভা পায়না। সভা-সমিতিতে শুধু কেরাত পড়া ও সবশেষে দোয়া করা আপনাদের কাজ হলে চলবেনা। পেছনে বসে জিন্দাবাদ দেয়া নায়েবে রসুলদের কাজ হতে পারেনা। আপনারা সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করবেন এবং এ কাজে আপনারা নেতৃত্ব দিবেন। আপনারা দুনিয়ার সকল মানুষকে, টনি ব্লেয়ার থেকে বিল ক্লিন্টনসহ সবাইকে মানুষের গোলামী পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র গোলামীর পথে আহ্‌বান জানাবেন। এটা আপনাদের আসল কাজ। এ কাজ না করলে আপনারা কিসের নায়েবে রসুল?

আমরা বৃটেনে বাস করছি, জগন্নাথপুর, বিশ্বনাথ বা বিয়ানীবাজারে নয়। মসজিদে বা ঘরে গিয়ে আপনারা যে সকল ছেলেমেয়েকে কুরআন শিক্ষা দেন তাদের অনেকে স্কুল-কলেজে বৃটিশের সাথে প্রতিযোগিতা করছে এবং তাদের মনের এ আকাঙ্খা রয়েছে যে প্রতিযোগিতা যতই অসম হোক না কেন বিজয় তাদের ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন ছেলেমেয়েদের পেয়েও তাদের না আপনারা কুরআন শেখাতে পারছেন, না শেখাতে পারছেন ইসলাম। স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা তাদের যা শেখাতে চায় তা-ই শেখাতে পারে। কিন্তু আপনারা কিছুই শেখাতে পারেন না । এ দেশের ছেলেমেয়েদের উপযোগী এবং তাদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি আমরা করতে পেরেছি? আপনারা কি শিক্ষা দেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেন? এ ব্যর্থতা কি ছেলেমেয়েদের না আপনাদের? এরা যদি হারিয়ে যায় তা হলে এ জন্যে কি অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মা-বাবারা দায়ী হবেন, না কি আল্লাহ্ আপনাদেরও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন?

আসলে বৃটেনের মুসলমানদের অনেক কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। আমরা যে সব কারণে তা পারছিনা এর প্রধান কারণ আলেমদের অনৈক্য। মতবিরোধ আমাদের সলফে সালেহীনের মধ্যেও ছিলো। চার মাজহাবের ইমামদের মধ্যে ফরজ-ওয়াজিব নিয়ে পর্যন্ত মতভেদ আছে। কিন্তু এ মতভেদকে তারা ওয়াজ মাহফিলে নিয়ে আসেননি। কারণ অর্থ উপার্জন তাদের উদ্দেশ্য ছিলোনা। মতভেদকে ব্যবহার করে তারা পকেট ভারি করেননি। হাদিয়া-তোহ্‌ফার প্রতি তাদের লোভ ছিলোনা, না ছিলো তা তাদের উপার্জনের প্রধান মাধ্যম। আপনারা হাদিয়া না পেলে, কেউ কেউ বড় হাতে না পেলে নাখোশ হয়ে যান। এমন নাদান লোকও আপনাদের মধ্যে আছে যারা ওয়াজে যাওয়ার আগে দর-দাম করে ঠিক করে দেয় কত হাদিয়া দিতে হবে। এ নিয়ে কোন কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হতেও শোনা যায়।

মতভেদ সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখিত একটি ঘটনা এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নবী মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে গেছেন তাওরাত আনতে। এ সুযোগে সামেরীর

www.pathagar.com

প্ররোচনায় বনী ইসরাইলের লোকেরা মুর্তিপুজা শুরু করে দেয়। মুসা (আঃ) ফিরে এসে তার ভাই নবী হারুন (আঃ)এর প্রতি খুব রাগ করলে এর জবাবে হারুন (আঃ) বলেন, 'হে আমার মায়ের পেটের ভাই, তুমি আমার দাড়ি ও চুল ধরে টান দিওনা। আমার ভয় ছিলো যে তুমি বলবে আমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে ফেলেছি।' (২০:৯৪) এখানে আমরা দেখি আল্লাহর একজন নবী উম্মাতের মধ্যে বিভেদের আশংকার কারণে মুর্তিপুজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে ওপর নবীর জন্যে অপেক্ষা করেছেন। উম্মাতের ঐক্য এমনি গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই তা আশাকরি ওলামায়ে কেরামকে বুঝিয়ে বলতে হবেনা।

মহান অল্লাহ্ কুরআনে ইহুদী আলেমদের এ বলে সমালোচনা করেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে (হে নবী) আপনার কোন সম্পর্ক নেই।'. (৬:১৫৯) এ আয়াতের আলোকে আপনারা নায়েবে নবীর দায়িত্ব কতটুকু পালন করছেন তা নিজেরাই বিচার করে দেখুন।

লন্ডন, ৪মার্চ ২০০০

www.pathagar.com

বৃটেনে বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট কার স্বার্থে?

বৃটেনের একটি ইউনিভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে, এ খবর বাংলাদেশে খুব ফলাও করে প্রচার হয়েছে। বলাবাহুল্য আওয়ামী ঘরানার পত্রপত্রিকাই এ ব্যাপারে বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেছে। তাদের মতে, বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট গোটা বাংলাদেশের জন্যে গর্বের বিষয়, এটা বিশ্বরাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী অবদানের স্বীকৃতি। । কিন্তু আসলেই কি তাই? হাল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ' এর নেপথ্য কাহিনী কি? বিশ্বরাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ হাল ইউনিভার্সিটি এ চেয়ার প্রতিষ্ঠা করেছে না কি শেখ হাসিনা তার পিতার ভাবমুর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে এ চেয়ার ক্রয় করেছেন? এর পেছনে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হলে এর পরিমান কত তা কি আমরা জানি? দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা কেউ তা জানিনা এবং রাজনীতিবিদদের কেউ এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করছেন না।

জানা গেছে, ৯৭ থেকে আলোচ্য 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ' প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং দু হাজার সালের ২৯ মার্চ তা বাস্তবায়িত হয়েছে। ৯৮ সালে সর্বপ্রথম বৃটেনের একজন কলামিষ্ট পত্রিকার পাতায় এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেন। কিন্তু আমাদের দেশের বা এ দেশের কোন রাজনীতিবিদ এ বিষয়ে কোন কথা বলেননি। বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার খবর বের হবার পরও কেউ এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। এবারও শুধু দুজন কলামিষ্ট এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। আমি জানিনা, আমাদের বড় বড় রাজনীতিবিদরা কেন বিষয়টাকে এত ছোট করে দেখছেন?

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, বাংলাদেশের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? জনাব সিরাজুর রহমান সাপ্তাহিক সুরমায় প্রকাশিত লেখায় হাল ইউনিভার্সিটির সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান টেরি ম্যাকনিলের একটি কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে টেরি ম্যাকনিল বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের ঔদার্যের ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। তারা হাল ইউনিভার্সিটিকে উৎসাহদানের জন্যে বড় অংকের মঞ্জুরী দিয়েছেন।' সে বড় অংকটা কত তা টেরি ম্যাকলিন বলেননি, জনাব সিরাজুর রহমানও সেদিকে জাননি। তবে ওয়াকিবহাল সুত্র মতে, হাল ইউনিভার্সিটিকে বাংলাদেশ সরকার কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে ১০ মিলিয়ন কেন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কি এ খাতে এক মিলিয়ন ব্যয় করার মত সঙ্গতি আছে? হাল ইউনিভার্সিটিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাপা করা কাগজের নোট দেয়া হয়নি, দেয়া হয়েছে পাউন্ড। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার উৎস কি তা আমাদের সকলের জানা আছে। টেন্ডারবাজী বা টাউটবাটপাড়ি করে তা অর্জন করা যায়না। হয় তা ভিক্ষার পয়সা, নতুবা বিদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। এ অর্থ কি এ ভাবে অবহেলায় অপচয় করা যায়? বাংলাদেশ কি কারো বাপের নামের চ্যারিটি বা দাতব্যপ্রতিষ্ঠান? ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানি নেই, হাজার হাজার মানুষ সেখানে খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান - মানুষের এ সকল কোন মৌলিক প্রয়োজনেরই নিশ্চয়তা সেখানে নেই। সে দেশের সরকারের জন্যে মোটা অর্থের বিনিময়ে, হোক তা ১০ মিলিয়ন থেকে অনেক কম, বৃটেনের মত একটি ব্যয়বহুল দেশে কারো নামে চেয়ার প্রতিষ্ঠা করার মত বিলাসিতা কি শোভা পায়? বাংলাদেশের বিচারপতি রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে কি রায় দেন? জনপ্রতিনিধিরা কি বলেন? বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য কি? না কি তারা সবাই তৈল মর্দন করে আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত? বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে কোন বক্তব্য বা লেখা আমার নজরে পড়েনি। শেখ হাসিনা তার পিতার ভাবমুর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে হাল ইউনিভার্সিটিতে যে অর্থ ব্যয় করলেন তা কি কোন ফোরামে আলোচিত হয়েছে ? এ জন্যে তিনি কার কাছ থেকে অনুমোদন নিয়েছেন? এ অর্থ ৩২ নম্বর ধানমন্ডি থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণস্তুপ থেকে প্রদান করা না হলে এ ব্যাপারে জানার অধিকার দেশবাসীর রয়েছে।

হাল ইউনিভার্সিটির সাথে বাংলাদেশ সরকার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে এ খবর বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশী জনগণ কতটুকু জানেন? এ দেশের কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত বাংলাদেশীদের সাথে কি এ ব্যাপারে কোন মতবিনিময় করা হয়েছে? যতদূর জানা গেছে, এ ব্যাপারে বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা বা মতবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনি। একজন ভারতীয় ব্যক্তি এ প্রজেক্টের নেপথ্যে রয়েছেন এবং তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আশির দশকে বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশী জনগণের বিরুদ্ধে বৃটিশ টিভি ও রেডিওতে মন্তব্য করে নিন্দিত হয়েছেন। তিনি যে সর্বতোভাবে বাংলাদেশীদের ঘৃণা করেন সে কথা তিনি সে সময় ঢেকে রাখেননি। তার সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশী মানুষের ইকুয়াল অপরচুনিটি ভোগ করার যোগ্যতা নেই। বৃটেন প্রবাসী বাংলাদেশী জনগণের কথাটা মনে আছে কি না জানিনা। আমাদের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল, তাই হয়তো আমরা অনেকে ওই ভারতীয় ব্যক্তির মন্তব্য ভুলে গেছি। এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে যে, যে লোক বাঙালী দেখতে পারেনা সে লোক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কি ভাবে প্রীতিভাজন হতে পারে! তা ছাড়া বাংলাদেশী শিক্ষাবিদদের অন্ধকারে রেখে একজন ভারতীয় লোকের পেছনে সরকার কেন তৈল মর্দন করছে তা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। এটা

www.pathagar.com

কি এ জন্যে যে শেখ হাসিনার পরিবারের কাছে বাংলাদেশীদের চেয়ে ভারতীয়রা অধিক বিশ্বস্ত?

যুক্তির খাতিরে মেনে নিলাম, বাংলাদেশের জন্যে এ রকম একটা প্রজেক্টের পেছনে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন ছিল? তা হলে এ জন্যে কি আর কোন ইউনিভার্সিটি ছিলনা? এ জন্যে হাল ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার প্রয়োজন হল কেন? পৃথিবীর কোন্ দেশ সে ইউনিভার্সিটিকে চেনে এবং কারা এ চেয়ার থেকে ফায়দা লাভ করবে? যে সকল এলাকায় বাংলাদেশী বা এশিয়ান মানুষ বেশী সে সব এলাকার কোন ইউনিভার্সিটিতে এ প্রজেক্ট চালু করলে এশিয়ান বা বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী এ থেকে লাভবান হবার সুযোগ পেতো। শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য হয়তো ভিন্ন, তাই তিনি হাল ইউনিভার্সিটি বাছাই করে নিয়েছেন। হয়তো তিনি এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি শিকার করতে চেয়েছেন। সময় এলেই তা ভালোকরে বোঝা যাবে।

ভিক্ষাকরে সংগ্রহ করা জনগণের অর্থ শেখ হাসিনা যে ভাবে নিজের ডিগ্রি এবং পিতার নাম প্রতিষ্ঠার জন্যে খরচ করছেন তা দেখে বহু পুরাতন একটা চুটকি মনে পড়ে গেল। চুটকিটি সিলেটের বিশিষ্ট কলামিস্ট বন্ধুবর আব্দুল হামিদ মানিকের নিকট থেকে শোনা।

ঘটনাটি আব্দুল হামিদ মানিকের গ্রামের। গ্রামে হাট বসে সপ্তাহে দু'দিন। হাটবারকে সিলেট অঞ্চলে বাজারবার বলা হয়। তাদের গ্রামের একটি লোক প্রতিটি হাটবারে সকাল থেকে ভিক্ষা করা শুরু করে। তারপর সন্ধ্যা হলে ভিক্ষা থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ডাল-চাল না কিনে লোকটি একটি বড় মাছ খরিদ করে বাড়ির পথে রওয়ানা দেয়। এক দিন এক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, মানুষ ভিক্ষা করে চাল-ডালের জন্যে। তোমার কি আক্কেল বুঝিনা, তুমি সারাদিনে যা পেলে তা দিয়ে মাছ কিনে নাও। তোমার ছেলেমেয়ের কি শুধু মাছ খেয়ে পেট ভরবে? জবাবে লোকটি বলে, কি করবো হুজুর, ছেলেমেয়ের পেটের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের জিহ্বার চিন্তাই আমাকে পাগল বানিয়ে রাখে। একবার খেয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। এখন বড় মাছ না হলে আর খেতে পারিনা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়তো একই সমস্যায় পড়েছেন। জনগণের পয়সা খরচ করে সস্তা সম্মান আর ডিগ্রি অর্জনের মোহ তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার আশেপাশে যে সকল চাটুকার আর তোষামোদকারী ভিড় করে আছেন তারাও অনেকটা সে রকম। তাই সত্যকথাটা তাকে কেউ বলে দিচ্ছেনা। অর্থ ও ক্ষমতার মোহ মানুষকে এ ভাবেই অন্ধ বানিয়ে ফেলে। মানুষ তখন ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার ভুলে যায়। অথচ আর কেউ না বুঝলেও তার অন্ততঃ বোঝা উচিত,ক্ষমতা কোনদিন চিরস্থায়ী হয়না। কথায় বলে, কোথায় আয়ূব খান আর কোথায় সিঙ্গল পান!

লন্ডন, ১৬ এপ্রিল ২০০০

www.pathagar.com

মদ ছাড়া কি ইসলাম অচল হয়ে পড়বে?

বিশেষ এক কাজে নর্থ ইংল্যান্ডের একটি শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার এক ঘনিষ্ট আত্মীয় বাস করেন। তার কাছ থেকে একটি ঘটনা শুনলাম। ঘটনাটি ইসলামিক সমাচারের পাঠকদের খেদমতে পেশ করার লোভ সামলাতে পারছিনা।

এক ভদ্রলোক মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আত্মীয় স্বজন এবং ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসে তার বাড়িতে ভিড় করেছেন। তিনি এক রেস্টুরেন্টের মালিক এবং সেখানে মদ বিক্রয় হয়। রেষ্টুরেন্ট ব্যবসার কল্যাণে তিনি দেশে-বিদেশে প্রভূত অর্থ-বিত্তের অধিকারী। সবাই মিলে তার কাছে একটি অনুরোধ রাখলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে এমন একটা কাজ করে যান যাতে করে আপনি কবরে বসে এর সওয়াব পেতে পারেন। সকলের কথায় ভদ্রলোক তা করতে সম্মতি জানিয়ে বললেন, আপনারাই বলুন সে কাজটি কি হতে পারে? তখন সবাই ভেবে চিন্তে বললেন, আপনি আপনার গ্রামের মাদ্রাসায় আপনার সম্পত্তির একটা অংশ দান করে যান। তখন মৃত্যুপথ যাত্রী ভদ্রলোক সকলের কথায় তার রেস্টুরেন্টের চার ভাগের এক ভাগ নিজের গ্রামের মাদ্রাসায় দান করার ঘোষণা প্রদান করেন। তারপর তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা রেস্টুরেন্টটি বিক্রি করে এর চার ভাগের এক ভাগ আলোচ্য মাদ্রসায় পাঠিয়ে দিলেন।

আমি জানিনা, ঘটনাটি শুনে পাঠকরা কি ভাবছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় কাজটা খুব ভাল হয়েছে। মৃত্যুপথের পথিক এমন একটা কাজ করেছেন যাকে আমরা সদকায়ে জারিয়া বলতে পারি। এ কথা সকলের জানা যে তিনটি কাজ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) খুব উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সৎকাজ করার সকল ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। তবে তিনটি কাজ যদি কেউ করে তা হলে মৃত্যুর পরও এর সওয়াব পাওয়া যাবে। সে যদি এমন দান-খয়রাত করে যায় যার ফলাফল অব্যাহত ভাবে চালু থাকে, অথবা এমন ইলম রেখে যায় যা থেকে মানুষ ফায়দা পেতে থাকে, কিংবা এমন সন্তান রেখে যায় যে তার জন্যে দোয়া করে। সে হিসেবে মনে হয় আলোচ্য ভদ্রলোক তার ব্যবসার এক চতুর্থাংশ মাদ্রাসায় দান করে একটি মহান কাজ করেছেন। প্রতি বছর মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য আলেম তৈরি হবে এবং সে সকল আলেমদের সাহচর্যে এসে আরো অসংখ্য মানুষ হেদায়াতের আলো লাভে ধন্য হবে। এ সকল কথা শুনতে খুব ভাল লাগে এবং এ আশা সামনে রেখেই উক্ত ভদ্রলোক মৃত্যুর পূর্বে এ বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে কোন প্রকার দানই কি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য

www.pathagar.com

হয়? না কি এর জন্যে কোন প্রকার শর্ত রয়েছে?

এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভের জন্যে আসুন প্রথমে আমরা মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেই। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুলে করীম (সঃ) বলেন, "আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তিনি পাক-পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ রাসূলদের যা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুমিনদেরও তাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, 'হে রাসুলগণ! পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক কাজ কর।' (কুরআনঃসুরা ২৩ ,আয়াত ৫১) এবং আল্লাহ্ বলেছেন, ' হে ঈমানদারগণ! তোমাদের যে সকল পবিত্র জিনিস দান করা হয়েছে তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর।' (কুরআনঃ সুরা২,আয়াত ১৭২) তারপর মহানবী (সঃ) একজন লোকের কথা উল্লেখ করেন যে দীর্ঘ পথ সফর করে ক্লান্ত, অপরিচ্ছন্ন ও ধূলিমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে ডাকে, হে রব ... হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খেয়ে সে প্রতিপালিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার দোয়া কি ভাবে কবুল হবে!"

আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ্ অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না। হারাম অর্থ দিয়ে যত ভাল কাজই করা হোক না কেন আল্লাহ তা কবুল করবেন না। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবিও তাই। আল্লাহ্ যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন আপনি সে কাজ করলেন এবং এ ভাবে অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে বহু সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলেন। তার পর সে হারাম মাল থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করা আল্লাহ্র বিধানকে বিদ্রূপ করার নামান্তর। আল্লাহ্ আপনার আমার ধন-সম্পদের কাঙাল নয় যে অবৈধ ভাবে উপার্জিত সম্পদ দান করে তাকে খুশি করে নিবেন। দান-খয়রাত করলে অল্লাহ খুশি হন ঠিকই, তবে সে দান-খয়রাত হালাল উপার্জন থেকে করতে হবে। কেউ যদি জেনে শুনে হারাম মাল থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করেন তা হলে এতে কোন সওয়াবতো হবেই না, বরং এ জন্যে তিনি গোনাহগার হবেন। তবে কারো কাছে যদি কোন উপায়ে হারাম মাল এসে যায় তা হলে তার কর্তব্য হলো এ মাল তিনি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীব ও অনাথদের মধ্যে বিতরণ করে দিবেন। মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করলে বলে দিতে হবে যে এ মাল হারাম মাল। মসজিদ-মাদ্রাসার যারা খাদেম বা ব্যবস্থাপক তাদের হাতে কখনো হারাম মাল এসে পড়লে তা টয়লেট তৈরি বা এতিম ছাত্রদের খাতে ব্যয় করবেন। হারাম মালের কারণে কারো হজ্ব ফরজ হয়না, জাকাত ফরজ হয়না। হারাম মাল দিয়ে হজ্ব করলে বা জাকাত আদায় করলে হজ্ব-জাকাত আদায় হবেনা, বরং এ জন্যে গোনাহ্গার হতে হবে।

কোন্ মাল হারাম আর কোন্ মাল পবিত্র তা মোটামুটি ভাবে সকলেরই জানা আছে। আল্লাহ্ যে সকল উপার্জন হারাম ঘোষণা করেছেন সে সকল পথে অর্জিত সকল সম্পদই অবৈধ ও হারাম। যারা রেষ্টুরেন্টে মদ বিক্রি করেন তারা অনেক সময় কোন কোন আলেমের বরাত দিয়ে বলেন যে মদ খাওয়া হারাম, কিন্তু বিক্রয় করা হারাম নয়।

www.pathagar.com

তাদের অবগতির জন্যে আমি এখানে বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করছি। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসুল(সঃ)কে বলতে শুনেছি যে তিনি বলছেন, 'আল্লাহ্ এবং তার রাসুল মৃত জানোয়ার, মদ এবং শুকর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।'

মনে রাখা দরকার, যে সকল কাজ করা হারাম তা থেকে যে আয় হবে তাও হারাম। যে সকল জিনিস খাওয়া হারাম সে সকল জিনিসের ব্যবসাও হারাম। মদ খাওয়া শুকর খাওয়া হারাম, মদ ও শুকরের ব্যবসাও হারাম। জিনা হারাম, জিনার ব্যবসাও হারাম। ধোকা দেয়া হারাম, ধোকাবাজী করে ব্যবসাও হারাম। মিথ্যা বলা হারাম, মিথ্যা কথা বলে ব্যবসা করাও হারাম। এ ভাবে অসংখ্য দৃষ্টান্ত এবং কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আপাততঃ তা করা থেকে বিরত থাকছি। এখন পাঠকরাই বিচার করে বলুন, মৃত্যুপথ যাত্রী ওই ভদ্রলোকের দান-খয়রাত কতটুকু সাদাকায়ে জারিয়াহ? কবরে থেকে তিনি এ থেকে কি পরিমান সওয়াবের আশা করতে পারেন?

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। এ দেশে আমরা যারা মসজিদ-মাদ্রাসা কায়েম করছি তারা হালাল হারামের এ সব দিক সম্পর্কে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করছি? আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন মদের ব্যবসায়ীদের সাহায্য ছাড়া ইসলাম অচল হয়ে পড়বে। যারা হারাম ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের সাহায্য ছাড়া কি মসজিদ-মাদ্রাসা কায়েম করা যায়না? যদি না-ই করা যায় তা হলে আল্লাহ্ এবং রাসুলের কাছে এ ধরণের মসজিদ-মাদ্রসার প্রয়োজন কতটুকু? যে জিনিস আল্লাহ্ এবং তার রাসুল (সঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তা করার মধ্যে কি কোন সওয়াব বা কল্যাণ আছে? শুধু এ দেশে নয়, বাংলাদেশ থেকেও আলেমগণ মসজিদ-মাদ্রসার জন্যে চাঁদা সংগ্রহে আসেন। আমরা দেখেছি তারা এসে বেছে বেছে সে সকল ব্যবসায়ীদের কাছে যান যারা মদের ব্যবসা করেন। হালাল পন্থায় ব্যবসায়ীদের দশ পাউন্ড বিশ পাউন্ড চাঁদার জন্যে তারা লালায়িত নয়। মদের ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনে হাজার পাউন্ড চাঁদা দিতে পারেন। তাই তারা এ দেশে তাদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেন এবং তারা দেশে গেলে তাদের জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন। আলেমরা যদি হারাম ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা দেন তা হলে সাধারণ মানুষ ফেতনায় পড়ে যায়। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, মদের ব্যবসা হারাম হলে অমুক আলেম তমুক আলেম ওখানে কেমন করে যান? আসলে এ দেশে মদের ব্যবসা এ সকল দুনিয়া পুজারী আলেমদের কারণেই চলছে। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুব সীমিত। তারা আলেমদের আচরণ দেখেই ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করে। আলেমদের কাজ দেখে মানুষ যদি বিভ্রান্ত হয় তা হলে কি কেয়ামতের দিন আলেমরা আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে পারবেন?

লন্ডন ১৫ জুলাই ২০০০

www.pathagar.com

কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং আমাদের বুদ্ধিজীবি মহল

বাংলাদেশের জন্য এখন কোন খবরই খবর নয় । খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস এবং বোমাবাজী সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমরা যারা বিদেশে বাসকরি তারা কমপক্ষে সপ্তাহে একবার বাংলা পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের খবরাখবর জানার চেষ্টা করি। পত্রিকাগুলো যেসব খবর ছাপে তা পাঠ করে আমাদের গা শিউরে ওঠে। একটার পর একটা লোমহর্ষক ঘটনা সেখানে ঘটেই চলেছে। এর শেষ কোথায় কেউ বলতে পারেনা। বাংলাদেশের বিভিন্ন কলামিষ্টদের লেখা পড়ে আরো অবাক হতে হয়। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে তাদের তেমন কোন কথা থাকেনা। অধিকাংশ কলামিষ্টই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। চলমান রাজনীতি, বিরোধী দলের বক্তব্য, সরকারী দলের সাফাই ইত্যাদি নিয়েই তারা বেশী আলোচনা করেন। এর মানে কি এই যে তারা বোমাবাজীর শিকার হচ্ছেন না ? না কি এর পেছনে ভয় বা অন্য কোন অকথিত কারণ রয়েছে ? তাহলে কি আমাদের ভাবতে হবে যে এরশাদ শিকদার সাংবাদিকদের ব্যাপারে যে কথা বলেছে এর পেছনে কিছুটা হলেও সত্যতা রয়েছে? কারণ যা-ই হোক সন্ত্রাসের ব্যাপারে সাংবাদিকদের নিরবতা মেনে নেয়া যায়না। এ কারণে যদি কেউ বলে নিরব থেকে সাংবাদিকগণ সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাহলে কি তাকে দোষ দেয়া যাবে?

বোমাবাজী বা সন্ত্রাস সম্পর্কে কলামিষ্টরা নিরব থাকলেও সম্প্রতি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে বোমা বিস্ফোরনের ঘটনায় কোন কোন কলামিষ্ট বেশ সরব হয়ে ওঠেছেন । কেউ কেউ এ জন্যে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সংগঠনকে দায়ী করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রয়াস পাচ্ছেন । কোন কোন কলামিষ্ট ধান ভানতে শিবের গীতও কীর্তন করছেন।

বাংলাদেশের যেকোন ঘটনা স্বাভাবিক কারণেই বৃটেনের বাংলাদেশী জনগণকে প্রভাবিত করে। কাদিয়ানীদের উপাসনালয়ে বোমা হামলার কারণে উক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কেও অনেকের মনে ঔৎসক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ইসলামী সমাচারের পাঠকদের খেদমতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাই।

তবে শুরুতেই একটা কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া প্রয়োজন। নীতিগত ভাবে ইসলাম সন্ত্রাস বা গুপ্ত হামলাকে সমর্থন করেনা। যুদ্ধরত নয় এমন কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ওপর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অজুহাতে হামলা চালানো ইসলামী নীতির পরিপন্থী

www.pathagar.com

বলে আমরা মনে করি। সুতরাং যে বা যারা কাদিয়ানীদের উপাসনালয়ে হামলা চালিয়েছে আমরা তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি।

সকলের জানা থাকা প্রয়োজন যে কাদিয়ানীরা মুসলমানদের কোন ফেরকা বা উপদল নয়, বরং তারা স্বতন্ত্র একটি ধর্মীয় গোষ্টী। কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। নামাজ, রোজা, মসজিদ, আজান ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে ব্যবহার করা হয়। মুসলমান ছাড়া অন্যরা সাধারণতঃ এ সকল পরিভাষা ব্যবহার করেনা। কেউ করলে বুঝতে হবে কোন বদ মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তা করছে। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্যে কাদিয়ানীরা শুরু থেকেই এ সকল পরিভাষা ব্যবহার করছে। সারা দুনিয়ার সকল মত ও পথের মুসলমানদের প্রবল আপত্তি স্বত্তেও তারা এমনটি করে আসছে। মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

কাদিয়ানীরা মুসলমান নয় এ ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেন। এর কারণ কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, মহানবী(সঃ) সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। মহানবী(সঃ) এর উপর ঈমান আনার আবিশ্যিক শর্ত হচ্ছে তাঁকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নেয়া। কেউ যদি তাঁকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে তা হলে বুঝতে হবে সে নবুয়তে মুহাম্মদীর উপর ঈমান আনেনি। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সামান্যতম মতপার্থক্য নেই। সকল যুগের সকল মুসলমান এ ব্যাপারে এক ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীদের দাবি হচ্ছে, মহানবী(সঃ) শেষ নবী নয়। আরো নবী আসবেন এবং পাঞ্জাবের মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একজন নবী। তাকে যারা নবী বলে মানবেনা তারা মুসলমান নয়। নাউজুবিল্লাহ। কাদিয়ানীদের এ দাবি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত, অসংখ্য হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা এবং ইজমায়ে উম্মাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অসংখ্য বিরোধ থাকলেও কাদিয়ানীরা যে অমুসলমান এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

বৃটিশ-ভারতে ইংরেজদের আশীর্বাদ নিয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। গোলাম আহমদের পিতা গোলাম মর্তুজা ১৭৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ৫০ জন সৈন্য এবং ৫০টি ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করে ইংরেজদের কৃপা অর্জন করে। তার সন্তান আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের মৌল বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করতে এগিয়ে আসে। সে ১৯০১সালে নবুয়তের দাবি করে ঘোষণা দেয়, "বৃটিশ সরকারের আইন অমান্য করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের আইন অমান্য করা, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করা।" চাটুকারিতার এখানেই শেষ নয়। সে এ দাবিও করে যে তার কাছে ইংরেজী ভাষায় ওহি নাজিল হয়েছে। বর্তমানেও সারা দুনিয়ার কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

হেডকোয়ার্টার হচ্ছে লন্ডন শহর। এখান থেকেই তারা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর ১৩৭টি দেশে তাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফির বললে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটি মহলের গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা এ বলে ফতোয়া দিতে শুরু করেন যে, কোন মুসলমানকে যে কাফির বলে সে নিজেই তখন কাফির হয়ে যায়। তাদের অবগতির জন্যে বলছি,এ ফতোয়া কাদিয়ানীদের মত সর্বসম্মত ভাবে যারা কাফির তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। তা'ছাড়া আপনারা তাদের কাফির বলে বিরাগভাজন না করতে চাইলেও তারা আপনাদের মুসলমান বলে স্বীকার করেনা। কাদিয়ানীদের মতে যারা গোলাম আহমদকে নবী মানেনা তারা সবাই কাফির, তাদের সাথে বিয়ে-শাদী জায়েজ নয় এবং মারা গেলে জানাজা পড়া যাবেনা।

সবশেষে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত, দুটো হাদীস এবং ইমাম আবু হানিফার রায় উল্লেখ করে এ আলোচনার সমাপ্তি টানছি। কুরআনের সুরা আহজাবের ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী।"

আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল ফিতান অধ্যায়ে উল্লেখিত একটি হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন,"আমার উম্মাতের মধ্যে তিরিশ জন বড় বড় মিথ্যাবাদী জন্ম নেবে। তারা প্রত্যেকে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী আসবেন না।"

বুখারী শরীফের কিতাবুল মানাকিব অধ্যায়ে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী(সঃ) বলেন,"বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন নবিগণ। এক নবীর ইন্তেকাল হলে তাঁর স্থলে ওপর নবী আসতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী আসবেন না, হবেন খলিফা।"

ইমাম আবু হানিফার সময় এক ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করে বলেছিল,"আমাকে নবুয়তের প্রমাণ পেশ করার সুযোগ দাও।"এ কথা শুনে ইমাম আবু হানিফা বলেন, "যে ব্যক্তি এ লোকের নিকট থেকে নবুয়তের প্রমাণ দেখতে চাইবে সেও কাফির হয়ে যাবে। কেননা নবী করীম(সঃ) বলেছেন, আমার পরে কোন নবী নেই।"

লন্ডন, ১৯ নবেম্বর, ৯৯

www.pathagar.com

দলাদলি ও বাঙালী

গত সংখ্যা নতুন দিনে প্রকাশিত একটি খবর আশাকরি সবার চোখে পড়েছে। সুরমাও খবরটি ছেপেছে। নতুন দিন 'সিলেটে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ওআইসিতে সর্বনাশ' শিরোনামে যে কথা বলেছে এর সারমর্ম হল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্পিকারের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব থাকায় ওআইসি-এর মহাসচিবের পদটি বাংলাদেশ হারাতে বসেছে। আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের কারণে সমগ্র জাতি কি পরিমান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এর একটি বড় প্রমাণ নতুন দিন সবার চোখের সামনে তুলে ধরেছে। স্পিকার-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধ নিয়ে আরো বহু কথা লেখা যায়। তবে আজকে আমি সেদিকে যাচ্ছিনে। আজ দলাদলি ও কোন্দল সম্পর্কে অনেক দিন আগের তৈরি একটি লেখা পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। নিন্দাবাদ এবং প্রশংসা দুটোই সেখানে আছে। অবাঙালীদের যারা বাঙালী চরিত্র অংকন করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম কাতারে রয়েছেন বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে কর্মরত বৃটিশ সিভিল সার্ভেন্টগণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বাঙালী চরিত্রে দোষের দিকটি বড় করে দেখেছেন। বছর দশেক আগে পশ্চিমবঙ্গের একটি সাময়িকীতে জনৈক ইংরেজ ডিপুটি কালেক্টরের রোজনামচা বের হয়েছিল। এ ডিপুটি কালেক্টর উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলা শহরে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন। তিনি তার রোজনামচায় বাঙালী চরিত্রকে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তা পড়ে তখন অত্যন্ত মর্মপীড়া অনুভব করেছি। অনেক দিন আগের পড়া হলেও তার কিছু বক্তব্য এখনো মনে আছে। তিনি লিখেছেন, বাঙালী চোর, অসৎ এবং তোষামোদে। সুযোগ পেলে নিতান্ত সামান্য অর্থের লোভও তারা সংবরণ করতে পারেনা। সততা-অসততার প্রশ্ন তাদের কাছে গৌন। নিজের সুবিধা এবং স্বার্থকে তারা বড় করে দেখে। বড় কর্তা, উর্ধতন কর্মচারী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সাথে তোষামোদে তারা পারঙ্গম। অধঃস্তন বা দুর্বলের প্রতি তারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর। নিজের উন্নতি বা স্বার্থ হাসিলের জন্যে তারা দুর্বল বা অধীনস্ত লোকদের নানা ভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে ওস্তাদ। ডিপুটি কালেক্টর মহোদয় এ ধরনের আরো বহু খারাপ অভিধায় বাঙালীদের অভিহিত করেছেন।

এ সকল বিবরণ পড়ে তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছিলাম। আজ এতদিন পর সে ক্ষুব্ধতা ও মর্মবেদনা না থাকলেও এর রেশ আছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। ইংরেজ ডিপুটি কালেক্টরের বক্তব্যে বিদ্বেষ ও অতিরঞ্জন আছে। তার বর্ণিত সবগুলো দোষ বাঙালীদের মধ্যে পাওয়া গেলেও এর বিপরীত চরিত্রের অসংখ্য লোক বাঙালী সমাজে বিদ্যমান। একজন দু'জন কুলাঙ্গারের উপস্থিতি সকল সমাজেই পাওয়া যায়। কথায় বলে মক্কায়ও গাধা আছে। তাই ঢালাও ভাবে বাঙালীদের সম্পর্কে মন্তব্য করার

www.pathagar.com

উপায় নেই। কেউ যদি করে তা হলে বুঝতে হবে হয়ত সে বিদ্বেষে অন্ধ অথবা তার মস্তিস্কবিকৃতি ঘটেছে।

ইংরেজ ডিপুটি কালেক্টরকে আমরা যত খুশী চাই নিন্দাবাদ জানাতে পারি। প্রয়োজনে তার কুশপুত্তলিকা বানিয়ে দাহ করতে পারি। কিন্তু বাঙালী যাযাবরকে আমরা কি বলব? যাযাবর তার দৃষ্টিপাতে বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা হুবহু মনে না থাকলেও এর সারকথা হচ্ছে– 'দু'ফরাসী মিলে করে ক্লাব, দু'ইংরেজ মিলে করে ব্যবসা, কিন্তু দু'বাঙালী একত্রিত হলে করে কালীবাড়ি না হয় দলাদলি'। বলাবাহুল্য যাযাবর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী সমাজকে সামনে রেখে এ কথা বলেছেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশের বাঙালী সমাজ বিদেশে কি ভাবে দিনযাপন করে তা হয়ত তিনি দেখেননি অথবা এ ব্যাপারে তার মাথাব্যথা ছিলনা। বাংলাদেশের বাঙালী সমাজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি ভাবে জীবন যাপন করে সে আলোচনায় আমি যাচ্ছি না। বৃটেনে তারা অবশ্যই কালীবাড়ি নিয়ে ব্যস্ত নয়। ধর্মের দিক দিয়ে তারা অধিকাংশ মুসলমান, তাই তারা কায়েম করে মসজিদ। ব্যবসা-বানিজ্যেও বাঙালীরা পিছিয়ে নেই। রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায় বাংলাদেশী বাঙালী সমাজ সাফল্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের অবসর সময় অতিবাহিত হয় যাযাবরের কথামত দলাদলি করেই। অবসর সময়ের দাবি হচ্ছে চিত্তবিনোদন ও আনন্দ। শরীরের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সারাদিন যারা দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে অতিবাহিত করেন তারা যদি কিছুটা সময় চিত্তবিনোদন না করেন তাহলে অচিরেই তাদের কর্মক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা বৃটেনের বাঙালী সমাজ আমাদের অবসর সময় যদি চিত্তবিনোদনের নামে দলাদলি করে কাটাই তাহলে এ কথা মানতে হবে যে আমাদের অস্থি-মজ্জায় দলাদলি মিশে আছে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে দল গঠন করা, সভা-সমিতি করা, সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্যোগ-আয়োজনে অংশ নেয়ার নাম দলাদলি নয়। দলের মধ্যে থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে ল্যাং মারা, সমিতি-সংস্থা নিয়ে পারস্পরিক কোন্দল করা, ব্যক্তিগত পসন্দ-অপসন্দের কারণে একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি বা দল পাকানোকে বলা হয় দলাদলি। বৃটেনের ব্যবসা বা সভা-সমিতিতে শুধু বাঙালীরা জড়িত নয়। সকল দেশের লোকদের মধ্যেই ব্যবসা-বানিজ্য, সভা-সমিতি, সেবা-সংস্থা আছে। স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি সকল এথনিক গ্রুপই কায়েম করার চেষ্টা করে। কেন জানিনা কোন্দল ও দলাদলিতে মনে হয় বাঙালীরা শীর্ষে অবস্থান করছেন। মতবিরোধ, মতপার্থক্য প্রত্যেক কমিউনিটির মধ্যে আছে, মানুষ হিসেবে তা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মতপার্থক্য মতভেদকে দলাদলি ও কোন্দল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাঙালী সমাজের জন্যে একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনো এ মতপার্থক্য মারা-মারি এবং খুনোখুনির পর্যায়ে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

এ দেশে যারা বৃহদায়তনে ব্যবসা করে তাঁরা কেউই একাকী ব্যবসা করেনা। এ জন্যে তারা লিমিটেড কোম্পানী গঠন করে। তাদের ব্যবসা বছরে মিলিয়ন-বিলিয়ন পাউন্ড ছাড়িয়ে যায়। তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে আইনগত ভাবে এর নিস্পত্তি হয়। এ নিয়ে তারা মাথা ফাটাফাটি করেনা।

www.pathagar.com

আমাদের মসজিদগুলোর মত এদেশের অসংখ্য চার্চ, সিনাগগ ছড়িয়ে আছে। এ সকল চার্চ এবং সিনাগগের অধীনে অসংখ্য বাড়ি, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও স্কুল রয়েছে। তাদের কোন কোনটার বার্ষিক বাজেট মিলিয়ন-বিলিয়ন পাউন্ডের। হাজার হাজার কর্মচারী এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কিন্তু এ সকল চার্চ বা সিনাগগের বোর্ড অব ট্রাষ্টি বা ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরোধ নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা থানা-পুলিশের খবর শোনা যায়না। বিরোধ এবং মতানৈক্য সেখানেও আছে। তা দূর করার একটা সিষ্টেমও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। নিজেদের তৈরী সিষ্টেম মেনে চলার ব্যাপারে তারা সবাই ওয়াদাবদ্ধ এবং বিশ্বস্ততার সাথে তারা তা মেনে চলে।

রাজনীতি, রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাজনৈতিক মত পোষণ বাঙালীর এক চেটিয়া সম্পত্তি নয়। বৃটেনে অবস্থানরত সকল এথনিক গ্রুপের মধ্যেই কমবেশী রাজনীতি সচেতনতা আছে। কিন্তু এদেশে রাজনীতি এবং অন্যান্যদের রাজনীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

কিন্তু কেন, কেন আমাদের মধ্যে এত দলাদলি ও কোন্দল? আজ তিন বাঙালী মিলে একটি ব্যবসা শুরু করলে এক মাসের ভেতর শুরু হবে তাদের মধ্যে মন কষাকষি এবং এক বছরের মাথায় গিয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে। দশ বাঙালী মিলে হয়ত একটি মসজিদ বা কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করেন ও আরো দশজন একত্রিত হয়ে হয়ত প্রতিষ্ঠা করেন কোন সমিতি বা সাহায্য-সংস্থা। এ সকল মসজিদ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক সীমাহীন পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কিছুদিন অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। তারপর দেখা যায় তাদের মধ্যে কাজ বাদ দিয়ে অকাজ-কুকাজ শুরু হয়ে গেছে। তা শুরু হয় সামান্য মতান্তর থেকে এবং শেষ পর্যন্ত তা কোন্দল, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং কোর্ট-কাচারী পর্যন্ত গড়ায়। বাঙালী সমাজে আলেম উলামা, নেতা-উপনেতার অভাব নেই। কিন্তু সমাজের দলাদলি ও বিরোধ নিস্পত্তির জন্যে কাউকে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়না। বরং কোন কোন সময় মনে হয় এ সকল আলেম-উলামা এবং নেতা-উপনেতারা কোন্দল ও বিরোধ নিস্পত্তির চেয়ে তাতে ইন্দন যোগাতেই বেশী তৎপর।

আমাদের ভেবে দেখা দরকার দলাদলি ও কোন্দল করে আমাদের নেট লাভ কি হচ্ছে! আমাদের শক্তি-সামর্থ, অর্থ, সময় ব্যয় করে লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগ যদি বেশী হয় তাহলে এর পেছনে আমরা কেন লেগে থাকব? আমরা কি লাভ-ক্ষতির সহজ এ হিসেবটা করতে পারিনা? আমাদের কি এ যোগ্যতাটাও নেই? আমরা কি এতই অথর্ব?
বৃটেনের বাঙালী সমাজে, দলাদলি ও কোন্দলের জন্যে আমরা কাকে দায়ী করব? আমরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হই তাহলে প্রথমেই দায়ী করতে হবে আমাদের মানসিকতাকে। একে অপরকে ল্যাং মেরে বড় হওয়ার মানসিকতা পরিত্যাগ না করতে পারলে দলাদলি ও কোন্দল দূর হবার কোন পথ নেই। আমার মতে বাইরের দুটো কারণও বাঙালী সমাজে বিদ্যমান দলাদলি ও কোন্দল জিইয়ে রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বাইরের দুটো

www.pathagar.com

করণের একটি হচ্ছে, নিয়মনীতি পালন না করা এবং নিজেদের তৈরী নিয়মের ব্যাপারে নিজেরা বিশ্বস্ত না থাকা। ব্যবসা হোক, সংগঠন-সমিতি হোক, সব কিছুর জন্যে নিয়মনীতি আছে। এসকল নিয়মনীতি লিপিবদ্ধ করা, জানা বা মেনে চলা কোন কিছুর বালাই আমাদের মধ্যে নেই। দু'জন মিলে তিন পয়সার ব্যবসা করলেও এ জন্যে লিখিত ডকুমেন্ট তৈরী করতে হয়। চারজন মিলে একটা সংগঠন গড়ে তুললে এ জন্যে গঠণতন্ত্র বা আর্টিকল অব এসোসিয়েশন থাকা দরকার। না আমরা এ গুলো জানি, না এসবের প্রতি কোন আগ্রহ আছে। হিসাবপত্রের ব্যাপারেও আমরা খুবই কাঁচা এবং কোথাও অতিচালাক। কথায় বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি। ওপরকে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেরাই শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাই। কোন্দল ও ঝগড়া করে নিজেদের তৈরী ব্যবসা বা মসজিদকে ধ্বংস করে দেই। বাঙালী সমাজে বিদ্যমান দলাদলি ও কোন্দলের পেছনে দ্বিতীয়তঃ দায়ী আমাদের দেশীয় কানেকশন। আমরা যারা এদেশে আছি তাদের প্রায় সবাই বাংলাদেশের কোননা কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গ্রুপের সাথে সম্পর্ক রাখি। অনেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোন দলের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা অর্থসংগ্রহের কাজে প্রবল উৎসাহে নিয়োজিত আছি। এ সকল দলের নেতা-উপনেতারা সুযোগ পেলেই এ দেশে আসেন, বড় বড় সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-বিবৃতি দেন। এর ফলে বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল প্রকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক বিরোধ এবং ধর্মীয় ফেরকাবাজী এ দেশে প্রসারিত হয়। নিজ নিজ দল ও গ্রুপের ব্যানার বা পতাকা হাতে নিয়ে আমরা কখনো একাকী কখনো বাংলাদেশ থেকে আগত মহান অতিথিদের নিয়ে সারা গ্রেটবৃটেন ঘুরে বেড়াই। এ ঘুরে বেড়াতে গিয়ে আমরা সকল কষ্ট ও ত্যাগ হাসিমুখে বরণ করে নেই, তৃপ্তি ও আত্মসুখের ঢেকুর তুলি। সামগ্রিক বিবেচনায় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ কাজ কতটুকু সঠিক ও কল্যাণকর তা বিচার-বিশ্লেষণ করার মত মনমানসিকতাই আমাদের নেই। দেশপ্রেম ও ধর্মপ্রেমের দোহাই দিয়ে এ সকল প্রশ্ন আমরা উড়িয়ে দিতে চাই। বিদেশের বাঙালী সমাজ দেশীয় কানেকশনে কি করবে, কতটুকু করবে, কে কোন দলের সাথে সম্পর্ক রাখবে সে বিশ্লেশনে আমি যাচ্ছিনা। আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, এ ধরণের দেশীয় কানেকশন বাঙালী সমাজে দলাদলি ও কোন্দল বজায় রাখতে এবং উস্কিয়ে দিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বিষয়টি নিয়ে বৃটেনের বাঙালী সমাজের সচেতন মহলের চিন্তা করা দরকার। দলাদলি ও কোন্দল চালিয়ে যাওয়ার জন্যে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই তা ফলে ফুলে প্রসারিত হবে। যদি দলাদলি ও কোন্দলকে সমাজের জন্যে ক্ষতিকর বলে আপনারা বিবেচনা করেন তাহলে তা দূর করার জন্যে পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসুন। নিজের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ না রেখে একটু প্রসারিত করুন। তিন ইটের মসজিদ কায়েমের চেষ্টা না করে সত্যিকার মহৎ ও কল্যাণকর কিছু করতে এগিয়ে আসুন। ব্যবসা হোক, সভা-সংগঠন হোক, ধর্মীয় কাজ হোক সব কিছু সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবে করার চেষ্টা করুন।

লন্ডন ৮মে ২০০০

www.pathagar.com

ডান বাম এক আওয়াজ
ঠেকাও মৌলবাদ

ফান্ডামেন্টলিজম বা মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা বর্তমান যুগে এক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এক সময় তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবিরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদের বিরুদ্ধে এমনি ভাবে কথা বলতেন। কিন্তু এখন 'সে যুগ হয়েছে বাসি'। বর্তমানে কেউ পুজিবাদকে মানবতার দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেননা, অথবা চিহ্নিত করার সাহস রাখেননা। এর কারণ কি? পুজিবাদ কি বর্তমানে মানবতার আর্শীবাদে পণিত হয়েছে? পুজির শোষণ কি বন্ধ হয়ে গেছে? না কি কুমিরের সাথে বিবাদ করে জলে বাস করা সম্ভব নয়, এ উপলব্ধি থেকে পুজিবাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেন না? এ কথা ঠিক যে সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সাহায্য-সহযোগিতা এখন পুজিবাদের মোড়লদের নেতৃত্বে চলছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক নেতৃত্ব যাদের হাতে তাদের সাথে বিরোধ করে পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে টিকে থাকা কঠিন, এ সরল কথাটা তৃতীয় বিশ্বের বাম চিন্তা ধারার নেতৃবৃন্দ হঠাৎ করে যেনো বুঝে নিয়েছেন। তাই এতদিন যে বন্দুক পুজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাক করা ছিলো তা এখন অন্যদিকে ঘুরে গেছে। ওপর দিকে এতদিন পুজিবাদের বন্দুক ছিলো সমাজতন্ত্রের দিকে তাক করা। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর তাদের দৃষ্টি এখন ইসলাম বা মুসলিম বিশ্বের দিকে একক ভাবে নিবদ্ধ। বর্তমান অবস্থা এমন যে ডান-বাম নির্বিশেষে সকল মহলের কাছে মৌলবাদ বা ইসলাম হচ্ছে প্রধান দুশমন। যুক্তি বিজ্ঞানের ফর্মূলা অনুযায়ী দুশমনের দুশমন বন্ধু হওয়ার কথা। কিন্তু মৌলবাদের ক্ষেত্রে সে ফর্মূলা কাজে লাগেনি। এর অর্থ কি এই যে পুজিবাদী শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মানবতা এখন মুক্ত? নাকি পুজিবাদের পক্ষপুটে সমাজতন্ত্র সুখের নীড় বেঁধেছে?

সেই যাই হোক। বর্তমানে পন্ডিত এবং মুর্খ সকলের মুখে এক কথা, ঠেকাও মৌলবাদ। ডান-বাম নির্বিশেষ সবাই এক কথার সাথে একমত যে মৌলবাদ আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার জন্যে এক মারাত্মক হুমকি। যে করেই হোক একে প্রতিহত করতে হবে। আটলান্টিকের ওপার থেকে এর ডাক এসেছে এবং এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা তথা গোটা পৃথিবী যেনো সে ডাকে সাড়া দিয়ে জেগে ওঠেছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় সংস্থা, আশিয়ান সংস্থা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ আইন প্রনয়ন করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তা জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে। কিছুদিন

www.pathagar.com

আগে একজন স্বনামধন্য বাঙালী কলামিষ্ট বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদির জন্যে মৌলবাদকে দায়ী করে সিরিজ নিবন্ধ লিখেছেন। তার মতে এ সকল দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার প্রধান কারণ হচ্ছে মৌলবাদ। মৌলবাদকে উৎখাত করতে না পারলে ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশলতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে নারী নির্যাতন, মাদকদ্রব্যের প্রসার এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশ উদ্বিগ্ন নয়? ইউরোপ এবং আমেরিকা কি এর বাইরে? বৃটেনে এবং আমেরিকায় কি আমাদের নারী সমাজ নিরাপদ? ড্রাগস প্রতিরোধ করতে বৃটেন প্রতিবছর কি পরিমাণ শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে এর হিসাব কি তার কাছে নেই? এখানেও কি একই কারণে এগুলোর প্রসার হচ্ছে? ইউরোপ এবং আমেরিকায় মৌলবাদ কি এতই শক্তিশালী?

মৌলবাদ যদি এতো মারাত্মক ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে। যারা মাঠে-ময়দানে মৌলবাদের বিরুদ্ধে খৈ ফোটান তারা বিষয়টা কতটুকু বুঝেন আমার জানা নেই।

বাংলা মৌলবাদ শব্দটি এসেছে ইংরেজী Fundamentalism শব্দ থেকে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত Adbanced Dictonary of Current English Fr oPf Fr Igt yPò, "Maintenance of the traditional beliefs of the Christian Religion (Such as th accuracy of everything in th Bible)". অর্থাৎ ফান্ডামেন্টালিজমের অর্থ খৃষ্টধর্মের প্রচারিত বিশ্বাস সমূহের প্রতি আস্থাশীল থাকা। (যেমন বাইবেলে যে সকল কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে সঠিক মনে করা)। ওপর দিকে "Encyclopaedia of Religion" গ্রন্থের দৃষ্টিতে, "Fundamentalism is a sub-species of evangelicalism. The term originated in America in 1920 and refers to evangelicals who consider it a chief christian duty to combat uncompromisingly modernist theology and certain Secularizing cultural trends". অর্থাৎ মৌলবাদ হচ্ছে এভেঞ্জেলিক (সুসমাচার) আন্দোলনের একটি উপদল। ১৯২০ সালে আমেরিকায় শব্দটির উদ্ভব হয়। এ দ্বারা সে সকল এভেঞ্জেলিক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা মনে করেন, আধুনিক ধর্মতত্ত্ব ও সেকুলার সাংস্কৃতিক ধারাকে আপোসহীন ভাবে প্রতিরোধ করা খৃষ্টানদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মৌলবাদ শব্দটির উৎপত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। খৃষ্টানদের একটি উপদলকে উদ্দেশ্য করে সর্বপ্রথম তা ব্যবহৃত হয়। আসল কথা হচ্ছে ১৯১০ সালে নয়েগ্রায় এক বাইবেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে খৃষ্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ বিশ্বাসগুলোকে সংরক্ষণ ও প্রচারের

www.pathagar.com

জন্যে গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম হচ্ছে ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ও বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তনে মৌলবাদের সংজ্ঞা বদলে গেছে। 'মৌলবাদকে রুখতে হবে' বা 'ঠেকাও মৌলবাদ' বললে এখন আর কারো মনে খৃষ্টধর্মের কথা জাগেনা। বর্তমানে মৌলবাদ ইসলামের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। মার্কিন প্রোটেষ্টানদের কাছে ফান্ডামেন্টালিষ্ট শব্দটি ছিলো অহংকারের বিষয়। তারা এক সময় নিজেদের মৌলবাদী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। ১৯১৯ সালে তারা World Christian Fundamentalist Association প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীব্যাপী তাদের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। কখন কি ভাবে মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটি ইসলামের উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু হয়, এ ব্যাপারে The Runnymede Trust কর্তৃক প্রকাশিত Islamophobia: A challenge for us all নামক রিপোর্টে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মতে ১৯৫৭ সালে ধঢঢফণ ঋর্ট্র ামলরভটফ ইসলামের জন্যে শব্দটি ব্যবহার করে। ১৯৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইর্ভদমভহ ঈলরথ্র লন্ডনের অবজারভার পত্রিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত এক নিবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে বা বলতে মৌলবাদ শব্দটির পাইকারী ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এর দ্বারা ইসলামকে বুঝিয়ে থাকেন। বিস্ময়ের বিষয় যে বহু মুসলমানও বুঝে না বুঝে শব্দটি ব্যবহার করেন। কোন কোন পন্ডিত অবশ্য এ কথা বলতে চেষ্টা করেন যে মৌলবাদ মানে ইসলাম নয়, বরং ধর্মান্ধতা। কখনো তারা 'রাজনৈতিক ইসলাম' এবং 'ধর্মীয় ইসলাম' এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বলেন যে তারা ধর্মীয় ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু আপনি এবং আমি শব্দটিকে কি ভাবে ব্যবহার করছি তা নিতান্তই গৌন বিষয়। গোটা দুনিয়া ব্যাপী এ শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয় সেটাই বড় কথা। ইউরোপ এবং আমেরিকার পত্র-পত্রিকা ফান্ডামেন্টালিজম বলতে কি বোঝায় তা আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। ধর্মান্ধতা ইসলামে নেই। মুসলমান যদি ফেনাটিক হয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সে ইসলাম মেনে চলছেনা। তাকে বোঝানো এবং প্রয়োজনে প্রতিহত করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। ধার্মিকতা ও ধর্মান্ধতা যে এক জিনিস নয় তা যে কোন বোকা বা মুর্খও বুঝে।

যারা ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ বলতে ধর্মান্ধতাকে মিন করে সাফাই দেন তাদের ১ মার্চ '৯৭ তারিখে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত "I Believe in Islamophobia" নিবন্ধটি পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। সেখানে Peregrine Worsthorne সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে গোটা দুনিয়ার সকল মুসলমানকেই তারা নির্যাতন ও সন্ত্রাসের পক্ষের লোক বলে মনে করেন।

Samuel Huntington Fr ßuUJ "The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order" একটি বহুল আলোচিত বই। হার্ভাড ইউনিভার্সিটিতে পেশকৃত আলোচনার উপর ভিত্তি করে তিনি বইটি লিখেছেন। এ বইয়ে

www.pathagar.com

তিনি সত্য কথাটা খোলামেলা ভাবে বলে দিয়েছেন। বইটির ২১৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, The Underlying problem for is Islam, a different Civilisation whose people are convinced of the superiority of their culture and are obsessed with the inferiority of their power. অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আসল সমস্যা ইসলামীক ফান্ডামেন্টালিজম নয়। বরং সমস্যা হচ্ছে ইসলাম এক স্বতন্ত্র সভ্যতা। ইসলামের অনুসারী মুসলমানরা তাদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে যে তারা নিম্নপর্যায়ে অবস্থান করছে, এ কথাটা তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

স্যামুয়েল হান্টিংটন এর এ বক্তব্যের পর এ কথা বলার আর অবকাশ নেই যে মৌলবাদ বলতে ইসলাম নয়, বরং ইসলামের নামে ধর্মান্ধতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকার কাছে মৌলবাদ মানে ইসলাম, পূর্ণইসলাম। মৌলবাদী মানে সকল মুসলমান। ইসলামী ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি সবকিছুই তাদের লক্ষ্যবস্তু। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানে পুজিবাদী সভ্যতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানে বস্তুবাদী সভ্যতা। এ সভ্যতার জন্যে বর্তমানে ইসলামই একমাত্র সম্ভাবনাময় হুমকি। নিউ ওয়ার্লড অর্ডারের নেতা তাই গোটা দুনিয়ার সকল মানুষকে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ প্রয়াস যে কিছুটা সফল হচ্ছে এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ডান-বাম, মুসলিম-অমুসলিম সবার কণ্ঠে তাই শোনা যাচ্ছে 'ঠেকাও মৌলবাদ'।

যারা মুসলমান তাদের গভীরভাবে বিষয়টা বিবেচনা করা দরকার। যারা শোষণ ও নির্যাতন মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন তাদেরও এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

www.pathagar.com

ছাত্ররাজনীতি ও আমাদের দায়

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ একটা কথা বহুবার বলছেন। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করছেনা। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সংসদীয় সরকারে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের সম্মান আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তা জানেন। ফিতা কাটা এবং পুস্পস্তবক অর্পণ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে কোন কাজ করতে নেই, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

তাঁর ক্ষমতা না থাকলেও তাঁর ভার আছে। জানা গেছে তিনি কোথাও গেলে সরকারী আমলা ও ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা ভয়ে তটস্থ থাকেন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ অহংকার করে বলে বেড়ায়, এটা তাদের একটা সার্থকতা যে তারা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মতো একজন শ্রদ্ধেয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করতে সক্ষম হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ধার ও ভার সম্পর্কে সচেতন আছেন। তাই নিছক পুস্পস্তবক অর্পণ ও ফিতা কেটে দিন কাটাতে রাজি নয়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে সাহসিকতার সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি যেহেতু সরকার প্রধান নয় সেহেতু এ ব্যাপারে তিনি কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেননা। কিন্তু জাতিকে তার মতামত খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দিতে তিনি কখনো কার্পন্য করেননি।

বাংলাদেশে চলমান ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে বর্তমানে যে ধারায় ছাত্র রাজনীতি চলছে তা বন্ধের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁর এ বক্তব্য বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। যারা প্রশংসা করেছেন তারা বুদ্দিজীবী, শিক্ষাবিদ এবং দেশের সাধারণ মানুষ। এ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছাত্র, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী রয়েছেন, রয়েছেন কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ। কিন্তু রাজনীতিবিদগণ তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেননি। যে সকল ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত তারাও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে।

আয়ূব আমলে আমাদের দেশে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। তখনকার প্রেক্ষাপট ছিলো ভিন্ন। আয়ূব খান বহু আমলা, বুদ্দিজীবী ও

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ খরিদ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ছিলো তার জন্যে নিষিদ্ধ ভূবন। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের মাধ্যমে সে নিষিদ্ধ ভূবনে তিনি প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সাম্প্রতিক ব্যক্তব্যের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়ূব মোনায়েম যুগের সাথে এর তুলনা চলেনা।
ছাত্র রাজনীতির পক্ষে যারা কথা বলেন তাদের যুক্তি হচ্ছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ রাজনীতি সচেতন নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত ও দরিদ্র। ছাত্ররা যদি রাজনীতি থেকে সরে দাড়ায় তাহলে দেশে রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হবে। এবং স্বৈরাচার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবে। এ প্রসঙ্গে তারা ভাষা আন্দোলন, আয়ূব বিরোধী আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

এ সকল আন্দোলনে ছাত্রদের অবদান কেউ অস্বীকার করছেনা। বর্তমানে আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক এবং দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের যোগ্যতার বিকাশ সাধনে সহায়তা প্রদান করা। শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকা। আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর যাদের কাছে আছে তারা জানেন সেগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ কতটুকু বিরাজ করছে। কোন কোন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। গোলা বারুদের শব্দ ও অস্ত্রের মহড়া দেখে কখনো মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক একটি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে। কেউ স্বীকার করুন আথবা নাই করুন, দেশবাসী জানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অস্ত্রের মহড়া দেখায় তারা রাজনৈতিক দলগুলোর আশীর্বাদপুষ্ট। এ আশীর্বাদ না থাকলে আমাদের পুলিশ বাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্ত্রমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্ররাজনীতি পসন্দ করেনা। কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর তাদের বাধ্য হয়ে কোন না কোন রাজনৈতিক সংগঠনের অঙ্গদলের সাথে জড়িত থাকতে হয়। জান-মাল এবং সিটের নিরাপত্তার খাতিরে তারা ছাত্র সংগঠনের আশ্রয় গ্রহণ করে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ছাত্র মিছিল-মিটিং পরিত্যাগ করে নিজেদের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশের যারা সাধারণ মানুষ, যাদের ভোটে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার নাগাল পান তারাও ছাত্ররাজনীতি পসন্দ করেনা। তারা চায় ছাত্ররা লেখাপড়া করে নিজেদের যোগ্যতাবৃদ্ধি করবে এবং দেশের আদর্শ নাগরিক ও যোগ্য পরিচালক হিসেবে নিজেদের তৈরী করবে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি নিরপেক্ষ ভাবে এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

কোন জরিপ পরিচালনা করলে দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করবে। ছাত্ররাজনীতি জাতিকে কি দিচ্ছে? শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশনজট, খুন, ধর্মঘট ইত্যাদি ছাত্ররাজনীতির ফল। ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, রেষারেষি ও মারামারি বহুলাংশে হ্রাস পাবে যদি শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করা যায়। ছাত্ররাজনীতির অভিশাপে কতো মেধাবী ছাত্রের জীবন ধ্বংস হয়েছে, কতো সোনার ছেলে অকালে ঝরে গেছে এবং হাজার হাজার নয়, লক্ষ-লক্ষ ছাত্রের জীবন থেকে কতো বছর অযথা নষ্ট হয়েছে তা হিসেব করে দেখা দরকার।

রাষ্ট্রপতি থেকে দেশবাসী, কেউ ছাত্ররাজনীতির পক্ষে নয়। তবু ছাত্ররাজনীতি আছে। কেনো আছে? আছে এ জন্যে যে ছাত্ররা ক্ষমতা দখলের সিড়ি। এ সিড়ি না থাকলে রাজনীতিবিদগণ চোখে সর্ষেফুল দেখেন। ছাত্রফন্ট না থাকলে সভামঞ্চ নিস্প্রভ হয়ে পড়ে, নির্বাচনী প্রচারণা জমেনা, মিছিল-মিটিং-ধর্মঘট নিস্প্রাণ হয়ে যায়। অর্থাৎ ছাত্ররা হচ্ছে বলির পাঠা। ক্ষমতার বেদীমূলে তাদের কুরবানী দিয়ে রাজনীতিবিদগণ ক্ষমতার নাগাল পান। তাই ছাত্ররাজনীতি দরকার। এতে দেশবাসীর কি উপকার? না, দেশবাসীর কোন উপকার এতে নেই। ছাত্ররাজনীতি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ছেলেমেয়ের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। তাদের পড়াশোনা নষ্ট হওয়ার বা জীবননাশের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ আমাদের বহু নেতানেত্রীর ছেলেমেয়ে বিদেশে থেকে লেখাপড়া করে। বাংলাদেশের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় না থাকলে বা লেখাপড়া বিঘ্নিত হলে নেতাদের লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন দেখা দেয়না। এ জন্যেই হয়তো রাষ্ট্রপতির বারবার আহবান সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজী নয়।

রাজনীতিবিদরা দেশকে, দেশের ভবিষ্যত ছাত্রসমাজকে নিয়ে চিন্তা না করলেও দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে অন্যদের নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। অস্ত্রমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন যদি কারো কাম্য হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে এখনই সোচ্চার হওয়া দরকার।

www.pathagar.com

টাওয়ার হ্যামলেটসঃ
বাঙালী কাউন্সিলারগণ কি করেন?

টাওয়ার হ্যামলেটস বরা বৃটেনের বাঙালী সমাজের কেন্দ্রস্থল। বাঙালী টাওয়ার হ্যামলেটস ছাড়তে চায়না। অন্যান্য এলাকা থেকে তারা এখানে আসতে আগ্রহী। অবাঙালীরা সুযোগ পেলেই টাওয়ার হ্যামলেটস ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। টাওয়ার হ্যামলেটসে বাস করতে হলে ইংরাজী জানার দরকার পড়েনা। বিশেষ করে ব্রিকলেন, ক্যানন স্ট্রীট, শেডওয়েল, হোয়াইট চ্যাপেল প্রভৃতি এলাকায় চলাফেরা করলে মনে হয় বাংলাদেশেই আমরা আছি। বাংলা টাউন, শাহ জালাল এষ্টেট, ওসমানী স্কুল, বঙ্গবন্ধু স্কুল, কবি নজরুল সেন্টার, প্রভৃতি টাওয়ার হ্যামেলটস বরায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সর্বমোট ৫০ জন কাউন্সিলারের মধ্যে বাঙালী কাউন্সিলারের সংখ্যা ১৪ জন। আসন্ন নির্বাচনে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় বাঙালীর সংখ্যা কতো তা কেউ জানেনা। কেউ বলেন পঞ্চাশ হাজার, কেউ বলেন এক লাখ। '৯১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় বাঙালীর সংখ্যা প্রতি তিনজনে এক জন। গত ছ'বছরে আরো বহু বাঙালী পরিবার বাংলাদেশ থেকে এবং বৃটেনের অন্যান্য স্থান থেকে এ বরায় এসেছেন। ওপর দিকে তুলনামূলক ভাবে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে জন্মহারের পরিমান অনেক বেশী। সুতরাং এ হিসেবে বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় বাঙালীর সংখ্যা '৯১ সাল থেকে অনেক বেড়েছে। শিক্ষা বিভাগের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন স্কুলে শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর মাতুভাষা ইংরেজী নয়। এ ৬০ ভাগের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ ভাগের মাতৃভাষা যে বাংলা তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় বাঙালীদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। একটি মাত্র বরায় ১৪ জন বাঙালী কাউন্সিলার নির্বাচিত হওয়া কোন ছেলেখেলা নয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার না থাকলে কোন বাঙালীর পক্ষে কাউন্সিলার পদে মনোনয়ন লাভই সম্ভব নয়। এখানে তারা শুধু মনোনয়ন পাননি, অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। অবশ্য ইতোপূর্বে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল লিবারেল দলের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তখনো কিছু সংখ্যক বাঙালী কাউন্সিলার ছিলেন। '৯৩ সালে কুদ্দুস আলীর উপর হামলা এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের একজন প্রার্থী কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ব লন্ডনের বাঙালী কম্যুনিটির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বলতে গেলে এর ফলস্বরূপ '৯৪ সালের নির্বাচনে অধিকাংশ বাঙালী লেবার

www.pathagar.com

পার্টির পক্ষে ভোট প্রদান করে এবং টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় লেবার পার্টির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঙালী টাওয়ার হ্যমালেটস বরা ছাড়তে চায়না, এর কারণ কি? এখানে কি অন্যান্য বরা থেকে সুযোগ-সুবিধা বেশী? এ বরার জীবনযাত্রার মান কি উন্নত? কি এর কারণ?
এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে ইউরোপীয় মানবিচারে টাওয়ার হ্যামলেটস বরার মানুষ অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের সুযোগ সুবিধা লাভ করছে। এ কথা অনুধাবনের জন্যে কোন গবেষণা বা অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়েনা। টাওয়ার হ্যামলেস এলাকায় অবস্থিত কাউন্সিলের কয়েকটি ফ্লাটে এবং ব্রিকলেন, ক্যাননষ্ট্রীট, হোয়াইট চ্যাপেল প্রভৃতি রাস্তা দিয়ে বার দু'য়েক চলাফেরা করলেই তা যে কেউ বুঝে নিতে পারে। কোন এলাকার জীবনযাত্রার মান ও সুযোগ-সুবিধার সীমানা বুঝতে হলে সে এলাকার হাউজিং, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল যারা পরিচালনা করেন তাদের নিকট থেকে এ সকল ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্যে যেতে হবে তাদের কাছে যারা এলাকার বাসিন্দা। দেখতে হবে তারা কোন পরিবেশে বসবাস করছেন, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা তারা কতটুকু লাভ করছেন। টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের মনে হাউজিং এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে অসংখ্য ক্ষোভ রয়েছে। যারা অন্যান্য এলাকা থেকে এখানে বেড়াতে বা বসবাস করতে আসেন তারা প্রথমেই এ দুটো বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকা সুযোগ-সুবিধা বা জীবনযাত্রার মানের দিক দিয়ে উন্নত কোন এলাকা নয়। তবু বাঙালী এখানে আসে এবং এখানে বসবাস করতে চায়। কারণ একটি এবং তা হচ্ছে এটা বাঙালী পাড়া। কষ্ট হলেও বাঙালী বাঙালী পাড়ায় থাকতে চায়। কথায় বলে দুধ ভাত ছেড়ে দিও, কিন্তু সঙ্গী ত্যাগ করোনা। রাস্তায় বাংলা সাইনবোর্ড, কাউন্সিলে বাঙালী কাউন্সিলার, সার্জারীতে বাঙালী ডাক্তার, দোকানে বাঙালী সেল্‌সম্যান, স্কুলে বাঙালী শিক্ষক, হাসপাতালে বাঙালী সাহায্যকারী, দোকানে বাংলাদেশী খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটসে বাঙালীর আকর্ষণ। হোক সুযোগ-সুবিধা সীমিত, হোক সেবার মান নিম্ন মানের। তবু বাঙালী এখানে থাকবে। ঘর থেকে বের হুলে নাকে রুমাল দিতে হয়, হাসপাতালে এপয়েন্টমেন্ট পেতে হলে এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। দু'বেডরুমের ঘরে দশজনের পরিবার নিয়ে বাস করতে হয়, এর কোনটাই বাঙালীর জন্যে অসহনীয় নয়। বাঙালী পাড়ায় বসবাস করে বাঙালী কম্যুনিটি বিদেশে বাস করেও বাংলাদেশের আমেজ অনুভব করে, এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা।

সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় বাঙালী হলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। দুঃখের বিষয় যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সে প্রত্যাশা পূরণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এ জন্যে

www.pathagar.com

অনেকে খেদ করে বলেন, আমরা ঢাকায় অথবা সিলেটে আছি। ঢাকার সিটি করপোরেশন বা সিলেট পৌরসভার কর্মকর্তারা নির্বাচনের সময় এলে পাবলিকের দ্বারে দ্বারে এসে ধর্ণা দেন। কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার পর তারা লাপাত্তা হয়ে যান। তখন বহু সাধ্য সাধনা করেও তাদের নাগাল পাওয়া যায়না। ঢাকা শহর এবং সিলেট শহরের সাধারণ মানুষ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। নির্বাচনের সময় এলে সকল প্রার্থীই এ সকল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে গালভরা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনে মনে হয় তারা নির্বাচিত হলে শহরে দুধের নহর বইয়ে দিবেন। নির্বাচনের পর মুখের কথা বাতাসে ভেসে যায়। বিরাজমান সমস্যা দিনে দিনে আরো জটিল আকার ধারণ করে। এ সকল দিক দিয়ে ঢাকা ও সিলেটের সাথে টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার এক আশ্চর্য ধরণের মিল লক্ষ্য করা যায়।

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে, ১৪ জন বাঙালী কাউন্সিলার কি কাজ করেন? কে কি কাজ করেন, কি ভাবে করেন তা সবারই জানা। বাঙালী একে ওপরের হাড়ির খবর জানে। কার কতটুকু ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে সে ধারণাও সাধারণ মানুষের রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আমাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে বাঙালী কম্যুনিটির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবহার করছি, না সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করছি?

বাংলা পত্রিকার পাতায় আমরা আমাদের কাউন্সিলারদের প্রায়ই দেখতে পাই। পত্রিকা পড়ে মনে হয় তারা বাঙালী কম্যুনিটির উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পত্রিকার খবরের সাথে বাস্তবাতার মিল কতটুকু? বাংলা পত্রিকার সাংবাদিকরা ভেতরের খবর ভালোই জানেন। তারা ভদ্রতা, সৌজন্য, আত্মীয়তা, কম্যুনিটিপ্রীতি ইত্যাদির কারণে অনেক সময় সত্য কথা সাহসের সাথে উচ্চারণ করেন না। টাওয়ার হ্যামলেটস বরায় যারা বসবাস করেন তাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা, ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাদের উদ্বেগ, স্কুল গুলোর পরিবেশ ও শিক্ষার মান দেখে এ কথা কোনক্রমেই বলা চলেনা যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বাঙালী কাউন্সিলারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করছেন। কাউন্সিলারগণ হয়তো বলবেন, ৫০ জনের মধ্যে আমরা ১৪ জন মাত্র। এ সংখ্যা নিয়ে আমরা যা করছি এর চেয়ে বেশী করা সম্ভব নয়। কাউন্সিলের বহুমুখী কাজের মধ্যে হাউজিং, এডুকেশন, সোশ্যাল সার্ভিস, প্ল্যানিং প্রভৃতি বিভাগ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার কমিটির মাধ্যমে কাউন্সিল তার বিভিন্ন বিভাগের কাজ সম্পাদন করে থাকে। আমাদের জানামতে ১৪ জন বাঙালী কাউন্সিলারের সবাই কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাদের অমতে বা অগোচরে মৌলিক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় তারা যদি বলেন, সেবা, সার্ভিস ডেলিভারী, সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙালী কম্যুনিটির জন্যে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয় তাহলে তা টাওয়ার হ্যামলেটস বরার বাসিন্দাদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে তা পাঠকই বিচেনা করুন।

www.pathagar.com

কমিউনিজমের পতন এবং আমেরিকার উদ্বাহু নৃত্য

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। প্রকাশের সুযোগের অভাবে তা অবদমিত ও অবরুদ্ধ থাকে মাত্র। রুশবিপ্লব সে ক্ষোভকে ভাষা দেয়। দেয় আশা। এর পূর্বে সমাজতন্ত্র ছিল নিছক এক তত্ত্বকথা। মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম, দ্বান্দ্বিক মতবাদ বা মূল্যের উদ্বৃত্ত তত্ত্ব নিয়ে তখন শুধু পন্ডিতেরাই মাথা ঘামাতেন। লেনিন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গোটা পৃথিবীকে অবাক করে দেন। এর প্রভাবে দেশে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। শোষিত ও বঞ্চিত জনতা সুকান্তের ভাষায় চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে– 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন'।

সমাজতন্ত্র মানুষকে কি দিয়েছে এবং মানুষের কি হরণ করেছে সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর নেতা সোভিয়েত রাশিয়ার বৃহৎশক্তি হিসেবে আবির্ভাব পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে ছিলো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হম্বি-তম্বি ও চোখ রাঙানির মোকাবেলায় রাশিয়ার অবস্থান বিশ্বরাজনীতিতে সব সময় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে এসেছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ওপর বৃহৎশক্তিও এক সময় একই ভূমিকা পালন করেছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাক-চীন মিত্রতাকে কাজে লাগিয়ে চীনকে বশীভূত করার পূর্ব পর্যন্ত গণচীনও ছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক বিরাট মাথাব্যথার কারণ। ১৯৯১ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং এর জের হিসেবে তা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এবং চলমান আন্দোলনে একের পর এক ধ্বস নামতে থাকে। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা ধনবাদী সমাজে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার এবং এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন একমাত্র শক্তি ছিলো সোভিয়েত রাশিয়া। তাই রাশিয়ার পতনে সবচেয়ে আনন্দিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আনন্দ অন্যদের মধ্যেও ছিলো। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিউ ওয়ার্ল্ড ওর্ডার জারী করে দুনিয়াকে একথা জানিয়ে দেন যে গোটা পৃথিবীকে এখন মার্কিন সরকারের কথায় উঠতে হবে এবং বসতে হবে। এর বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলে দাড়াবার চেষ্টা করলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর পৃথিবীতে কি এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব আছে যে শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে? এর সরল জবাব হচ্ছে খোলা চোখে দেখা যায় এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীতে নেই। এরকম কোন শক্তির কি সম্ভাবনা নেই? আমাদের দৃষ্টিতে সম্ভাবনাময় কোন বিশ্বশক্তি না থাকতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ধনিক-বনিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে একটা সম্ভাবনাময় শক্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সে শক্তি কি কোন দেশ? না, কোন দেশ নয়। সেটা কি, আসুন তা ধনবাদী সভ্যতার যারা ধারক ও বাহক তাদের ভাষায়ই জানার চেষ্টা করি। ১৯৯১ সালে রাশিয়ার পতন ঘটে এবং ১৯৯২ সালের ১২ জানুয়ারী সানডে টাইমস পত্রিকায় ঘণ ধথভমরণ বটরডদ মত ভ্রফটব শীর্ষক একটি নিবন্ধে বলা হয়ঃ "For 100 years the west failed to understand communism. In the end it did not matter, there was nothing worth understanding. For more than 1000 years the west has failed to understand Islam. This time it matters: a system driven by God will always be more subtle, durable and rational than one driven solely by economics..... In the calculations and fears of many, Islam is now on the verge of replacing Communism in the front line of Global opposition to western liberal democracy. The Iranian revolution has proved more persistent and successful than anybody expected. The Algerians vote in large numbers for the Islamic Salvation Front and new Islamic states with nuclear weapons on their soil are rising from the ashes of Soviet Union.

The confusion and incomprehension such ideas produce in the west are significant. On the other hand a certain type of depravity does seem to be infecting our societies: underclass's are expanding. Crime is increasing. Strategically, the implications are obvious. Islamic states run along the southern shore of the Mediterranean. They still control the world's key oil supplies, surround Israel, and soon will probably have the right weaponry as opposed to the out-dated tank battalions of Saddam Hussain. With the break up of the Soviet Union they also now run along the southern edge of Asia. If the present incompetent ruling classes are replaced by the people inspired by the new Islamic thinkers, then this region will soon make a mockery of our derisive ignorance of Islam..... The Liberal west is constructed on spiritual vacuum and this may will turn

www.pathagar.com

out to be a real political failing......"
(Bryan Appleyard: Sunday Times, 12 January'92)

অর্থাৎ 'গত একশ' বছর পশ্চিমা জগত কমিউনিজমকে বুঝতে পারেনি। শেষ বিচারে দেখা যায় এ জন্যে কিছু যায় আসেনি। কেননা এতে বোঝার মতো কিছু ছিলো না। এক হাজার বছর থেকে অধিক সময় যাবত পাশ্চাত্য সমাজ ইসলামকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে তা গুরুতর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর দেয়া এ ব্যবস্থা নিছক অর্থনীতির উপর পরিচালিত ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী, টেকসই এবং যুক্তিনির্ভর।

অনেকের ধারণা ও ভীতি যে পশ্চিমা উদারনীতিকে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে বর্তমানে ইসলাম কমিউনিজমের স্থান দখল করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। ইরান বিপ্লবের স্থায়ীত্ব ও সাফল্য সকলের ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। আলজেরিয়ার জনতা ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্টকে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসাবশেষ থেকে পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থান ঘটছে। এ সকল ধারণা পাশ্চাত্য সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং তারা বিষয়টা বুঝতে পারছেনা। ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে আমাদের সমাজে নীতিহীনতা ছড়িয়ে পড়ছে। বিত্তহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধ বড়ছে।

কৌশলগত দিক বিচারে এর পরিনতি সুস্পষ্ট। ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ভুমধ্যসাগরের দক্ষিণতীর ঘেষে বিস্তৃত। তারা এখনো বিশ্বের প্রধান তেল সরবরাহকারী। তারা ইসরাইলকে ঘিরে রয়েছে। তারা হয়তো শীঘ্রই সাদ্দাম হোসেনের সেকেলে ট্যাংক ব্যাটেলিয়ানের পরিবর্তে উপযোগী অস্ত্রসস্ত্রের অধিকারী হয়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর এখন এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রনে। বর্তমান অযোগ্য শাসকদের অপসারণ করে নতুন ইসলামী চিন্তাবিদদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ যদি ক্ষমতা দখল করে নেয় তাহলে এই অঞ্চল শীঘ্রই ইসলাম সম্পর্কে আমাদের হাস্যকর অজ্ঞতাকে নিয়ে উপহাস করবে।

উদার নৈতিক পশ্চিমা জগত আধ্যাত্মিক শূণ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রকৃত ভাবে রাজনৈতিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঠিক পরপর তদানীন্তন ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান সংবাদপত্রে এক সাক্ষাতকার প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক নিউজ ম্যাগাজিন নিউজ উইকের জুলাই সংখ্যা তা প্রকাশ করে। সেখানে KfKj mPuj∏
'It would be a mistake to dissolve this asset (NATO), to waste the cohesion

www.pathagar.com

that has been built within this security organisation..... and you can Imagine that the confrontation between Communism and the market economics could be replaced by a confrontation between the western and Islamic world.

(News Week: Gianni De Mechels: July 1990)

অর্থাৎ 'এ শক্তিকে (অর্থাৎ ন্যাটো) ভেঙে দেয়া এই নিরাপত্তা সংস্থায় গড়ে ওঠা সংহতিকে বিনষ্ট করা ভুল হবে। এবং আপনারা অনুমান করে দেখবেন কমিউনিজম ও বাজার অর্থনীতির সংঘাত পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিমা জগত ও ইসলামী বিশ্বের সংঘাতে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'।

ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকা থেকে এ ধরণের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেয়া যাবে। অনুসন্ধানী পাঠকরা তাতে আনন্দ পেলেও সাধারণ পাঠকদের বিরক্তির ভয়ে তা থেকে বিরত থাকাই ভাল। এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, ধনবাদী সভ্যতা তার শোষণ ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার পথে হুমকি স্বরূপ যে শক্তিকে বিবেচনা করছে সে শক্তি হচ্ছে ইসলামী শক্তি। বাজার অর্থনীতি ও সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে গোটা দুনিয়া ব্যাপী চলছে নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষনের একচেটিয়া রাজত্ব। মানবতা ও উন্নয়নের মোড়কে এ গুলো সরবরাহ করা হচ্ছে এবং পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর মাথামোটা সরকার গুলো তা গোগ্রাসে গিলছে। পৃথিবীতে এবং দুনিয়ার কোন দেশে সম্পদের অভাব নেই। কিছু সংখ্যক মানুষের শঠতা, প্রতারণা, লোভ ও ভোগলিপ্সার কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে। কমিউনিজমের পতনের পর একমাত্র ইসলামী শক্তিই ভোগলিপ্সু মানুষের কবল থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে পারে। কথাটা মুসলিম বিশ্বের জানাজানি হবার পূর্বেই পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক বাহকদের মাথায় এসে গেছে। তাই তারা ইসলমকে 'টেরোরিজম' 'ফান্ডামেন্টলিজম'-এর চাদর পরিয়ে দেশে দেশে ধোলাই দিয়ে চলেছে।

যারা মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন এবং যারা মুসলিম হিসেবে অহংকার পোষন করেন তাদের বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা বিবেচনা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ

ভাষা মানুষের তৈরী নয়, আল্লাহর দান। ভাষা সিদ্ধান্ত নিয়ে বা আইন করে সৃষ্টি করা যায় না। নিজেকে প্রকাশ করার আকুতি মানুষের জন্মগত, সহজাত। সহজাত এ আকাঙ্খা থেকেই ভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষার সুতিকাগার মানুষের মুখ। মানুষের ব্যবহার অনুসরণ করেই ব্যাকরণের নিয়ম তৈরী হয়। কোন শব্দ বা বাক্য ব্যবহারের যে নিয়ম মানুষের মুখে চালু আছে সে নিয়ম লংঘনের ক্ষমতা ব্যাকরণের নেই।

ভাষা বহতা নদীর মতো। প্রতিদিন প্রতিমহূর্তে তা এগিয়ে যাচ্ছে। জীবন্ত ভাষাকে জীবন্ত মানুষের সাথেও তুলনা করা যায়। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের বয়স বাড়ছে এবং শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে তার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। ভাষার মধ্যে তেমনি বিবর্তন ঘটছে। মানুষের মুখ, মানুষের ব্যবহারই এ বিবর্তনের, পরিবর্তনের বাহন। মানুষ আল্লাহর তৈরী। দাঁত, জিহবা, তালু, গলা ও মাড়ি ব্যবহার করে মানুষ কথা বলে। মানুষের কান এবং মানুষের বুদ্ধি মানুষের কথাকে বিন্যস্ত করে। এর কোনটাই মানুষের তৈরী নয়। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য রকম উন্নতির এই যুগেও কোন মৌলিক পদার্থ মানুষ তৈরী করতে পারেনি। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের ক্ষমতা মানুষের নেই। আল্লাহ মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে রং এবং ভাষার পার্থক্য আল্লাহর এক নিদর্শন। সে হিসেবে কোন ভাষাকে আমরা অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে পারি না। ইংরেজী, বাংলা, আরবী এমনকি বাংলাদেশের চাকমা, গারো, প্রভৃতি উপজাতীদের ভাষার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। ভাষার জন্যে, বর্ণের জন্যে মানুষে মানুষে পার্থক্য যারা করে তারা আল্লাহর বিধান অনুধাবন করতে পারেনি।

প্রত্যেক মানুষের একটি মাতৃভাষা আছে। জন্মের পর মায়ের নিকট থেকে মানুষ সে ভাষা শেখে। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের আকর্ষন সহজাত। এতে কোন দোষ নেই। তেষ্টা পেলে মানুষ পানি খায়। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের আকর্ষন ঠিক তেমনি। কেউ যদি তেষ্টা পেলে মদ খেতে চায়, চা খেতে চায় তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যাতিক্রম। একই ভাবে মাতৃভাষার প্রতি কেউ আকর্ষন অনুভব না করলে তাকেও ব্যাতিক্রম বলে ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষায় কথা বলে আমরা স্বাচ্ছন্দ অনুভব করি। এ ভাষায় আমরা স্বপ্ন দেখি, গান করি। কেউ বাংলা ভাষার নিন্দা করলে আমরা আহত হই। পৃথিবীর সকল দেশে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশ বাংলাদেশে এখনো উচ্চশিক্ষা নিতে হয় বিদেশী ভাষায়। দু'শ বছর ইংরেজ আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো। গোলামীর চিহ্ন ইংরেজী ভাষাকে আমরা এখনো কণ্ঠে ধারণ করে আছি।

চারশ' কোটি মানুষের পৃথিবীতে প্রায় বিশ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বার কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের যার ভাষা বাংলা। জন সংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা। কিন্তু পৃথিবীতে বাংলাই একমাত্র ভাষা যে ভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষ জীবন দিয়েছে। এ জীবন দানের ঘটনা ঘটে ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের একুশ তারিখ। বাংলাদেশে এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত। তমদ্দুন মজলিস নামক একটি সংগঠন সর্ব প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। পরে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এ আন্দোলনে শরিক হয়। আন্দোলনের মুখে তৎকালীন পাকিস্থান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

অনেকে মনে করেন নবীদের ভাষা ছিল আরবী। কথাটা ঠিক নয়। আল্লাহর সকল জাতির মধ্যে নবী পাঠিয়েছেন। আরব অঞ্চলে যে সকল নবী এসেছেন তাদের ভাষা ছিলো আরবী। কিন্তু অন্যান্য এলাকায় যখন নবী এসেছেন তখন সে এলাকার মানুষের ভাষায় তিনি কথা বলেছেন। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ যখনই কোন জনগোষ্ঠির কাছে নবী পাঠিয়েছেন তখন তাকে সে এলাকার মানুষের ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নবীদের জন্ম সেই জনগোষ্ঠির মধ্যে যাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই হিসেবে মহানবী (সঃ) আরব দেশে জন্মেছেন এবং তার দাওয়াতের প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিলো আরবী ভাষা ভাষী মানুষ। তাই তাঁর ভাষা এবং কুরআনের ভাষা হয়েছে আরবী। এটাই স্বাভাবিক।

এ স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী যারা যে দেশে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করবেন তাদের সে দেশের ভাষা জানতে হবে। সে দেশের রাজনীতি সমাজনীতিতে সংস্কার সাধন করতে হলে দেশের মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে, বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং বাংলাদেশের মাটিতে কোন মহত্তর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আকাঙ্খা পোষন করে বাংলাকে অবহেলা করা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। সে দেশের নাম বাংলাদেশ। জনবসতির দিক থেকে সে দেশ হাজার হাজার বছরের পুরনো।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আদি অধিবাসীদের দ্রাবিড় নামে চিহ্নিত করা হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষনে দেখা যায় দ্রাবিড়রা একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতি ছিলো। ধর্মের দিক দিয়ে তারা ছিলো একেশ্বরবাদী। মধ্য এশিয়ার কোন এক স্থান থেকে তারা ভারতবর্ষে আসে। বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ঘটে। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গৌতম বুদ্ধও মূলতঃ একেশ্বরবাদী ছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে পৌত্তলিকতাবাদী আর্যরা প্রথমে ইরানে এবং পরে সেখান থেকে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষে আসে। তারা পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে আর্যরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের কোন কোন ঐতিহাসিক আর্যদের সাথে বাঙালীর সংগ্রামকে বাঙালীর প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। মুসলিম শাসনামলে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের বর্তমান অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্যের ধারণা বাস্তিবায়িত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে এর জনক বলা যায়। এরপর অনেক ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। আর্যদের আক্রমনের ভয়ে চর্যাপদের লোকগণ হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে নেপাল থেকে বাংলাভাষার এ সকল আদি নিদর্শনগুলো উদ্ধার করা হয়।

সুলতানি আমলে বাংলাভাষার চর্চাও প্রসার বৃদ্ধি পায়। বাংলার সুলতান হোসেইন শাহ, নসরত শাহ প্রমুখের পৃষ্টপোষকতায় বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। মধ্যযুগের গণমানুষের মুখের ভাষাই ছিলো বইয়ের ভাষা। ইংরেজ এসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলা ভাষাকে তখন গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের হাতে পড়ে বাংলা ভাষা আবার গতিশীল হয়ে ওঠে।

হাজার বছরের পথ পরিক্রমার পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। সে দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, অধিকাংশ মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী। বৃটেনে বসে আমরা যারা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি, শোষনহীন সমাজ গড়ার জন্য লড়াই করি তাদের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা কম নয়। আমরা বাংলা দেশের উন্নতিতে উল্লাসিত হই এবং দূর্গতিতে ব্যথা পাই। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি। বৃটিশ আমাদের দেশে ইংরেজী নিয়ে গিয়েছিলো, আমরা এ দেশে বাংলা ভাষা নিয়ে এসেছি। স্কুল-কলেজে বাংলা ভাষা এবং বাংলা মাধ্যম চালুর জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে।

ভাষা দিবস বা একুশে ফ্রেব্রুয়ারী বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার দিন। ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব গলাবাজী করে হয়না, এ জন্য প্রয়োজন বলিষ্ট কলমের। শক্তিশালী কলম সৃষ্টির প্রত্যয়ে দৃপ্তও বলিষ্ঠ হোক এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী।

www.pathagar.com

হাইলাটঃ বাংলাদেশের আদি অধিবাসীদের দ্রাবিড় নামে চিহ্নিত করা হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষনে দেখা যায় দ্যাবিড়রা একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতি ছিলো। ধর্মের দিক দিয়ে তারা ছিলো একেশ্বরবাদী। মধ্য এশিয়ার কোন এক স্থান থেকে তারা ভারতবর্ষে আসে। বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ঘটে। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গৌতম বুদ্ধও মূলতঃ একেশ্বরবাদী ছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে পৌত্তলিকতাবাদী আর্যরা প্রথমে ইরানে এবং পরে সেখান থেতে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষে আসে। তারা পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে আর্যরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের কোন কোন ঐতিহাসিক আর্যদের সাথে বাঙালীর সংগ্রামকে বাঙালীর প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

www.pathagar.com

বর্ণবাদ ও একজন তাহির হোসেন

ব্রাডফোর্ডের তাহির হোসেন চমৎকার একটা কাজ করেছেন। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাপ্তাহিক ইষ্ট পত্রিকা তার সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ জন্যে তাদেরও ধন্যবাদ।

মাঠে-ময়দানে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে এবং অফিসিয়েল কাগজ-পত্রে এ দেশে বর্ণবাদের কোন স্থান আছে বলে প্রমাণ করা খুবই কঠিন। সকল সরকারী এবং বেসরকারী অফিস ও সংস্থায় ইকুয়াল অপরচুনিটি পলিসি সংক্রান্ত একটি বিবৃতি তৈরী আছে। এতে গতবাধা কিছু কথা লেখা আছে। সেখানে বলা আছে, ধর্ম, বর্ণ, এথনিক অরিজিন, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন প্রভৃতির কারণে কারো প্রতি কোন বৈষম্য করা হবে না। সুযোগ ও সুবিধা সকলের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। এমনকি যারা দৈহিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী বা ডিসেবল তারাও সমান ধরণের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এটা অফিসিয়েল ভাষা, আইনের কথা। কিন্তু এ আইন কতটুকু মেনে চলা হয়? এথনিক মাইনোরিটি সম্প্রদায় কি চাকরী, লেখাপড়া বা ব্যবসা-বানিজ্যে সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে? আইনের ভাষায় যা বলা হয়েছে, আইন যারা প্রয়োগ করেন তারা কি তা মেনে চলেন?

নির্বাহী কর্মকর্তারা এক বাক্যে বলেন, এ দেশে কেউ বর্ণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে না। কোথাও বর্ণ বৈষম্য হয়ে থাকলে তা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম বা এক্সিডেন্ট। কিন্তু ভুক্ত ভোগিরা জানে এ সকল কথা কতটুকু ঠিক। রাস্তা-ঘাটে এশিয়ানরা যে হারে ও যে মাপে বর্ণবাদের শিকার হন তা অফিস-আদালতে পরিচালিত বর্ণবাদের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও নগন্য। অফিস-আদালতে বিদ্যমান বর্ণবাদ অত্যন্ত চতুর ও চৌকস। একে চিহ্নিত করা এবং প্রচলিত আইনের আওতায় এনে পরাভূত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ব্রাডফোর্ডের এশিয়ান যুবক তাহির হোসেন ব্যাপারটা মর্মে মর্মে অনুধাবন করে একটা অভিনব পন্থা অবলম্বন করে বর্ণবাদের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছেন। তার উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সত্যি প্রশংসা করতে হয়।

তাহির হোসেনের বয়স তিরিশ। গত চার বছর যাবত তিনি বেকার। গত চার বছরে তিনি চাকুরীর খোঁজে ক্রয়ডন থেকে নিউক্যাসল পর্যন্ত হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। প্রায় ১৫শ' পাউন্ড খরচ করেছেন যাতায়াত বাবদ। দেড় হাজার থেকে বেশী চাকুরীর দরখাস্ত প্রেরণ করেছেন। কিন্তু কোথাও সফল হননি। বিভিন্ন স্থানে তিনি বর্ণ বৈষম্যের শিকার

www.pathagar.com

হয়েছেন। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে অভিযোগ করতে পারেননি। কাজের অন্বেষণে ব্যস্ততার কারণে তার পারিবারিক জীবনেও নেমে আসে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

বর্ণবৈষম্যের কারণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে অবশেষে তাহির হোসেন একই সাথে দুটো দরখাস্ত পাঠানো শুরু করেন। একটি নিজের নামে এবং ওপরটি এক কাল্পনিক সাদা মেয়ের নামে। তারপর দেখা গেলো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কাল্পনিক সাদা মেয়েকে ইন্টারভিউর জন্যে ডাকা হচ্ছে, কিন্তু তাকে শর্টলিষ্টেড করা হচ্ছে না। এর ভিত্তিতে কতিপয় সংস্থার বিরুদ্ধে বর্ণ বৈষম্যের অভিযোগ এনে তিনি আদালতের শরনাপন্ন হন। তিনি সর্বমোট ১২টি মামলা এ বলে দায়ের করেন যে এ সকল সংস্থা স্বীকৃত ও ঘোষিত ইকুয়াল অপরচুনিটি পলিসি মেনে চলছেনা। তাদের কাছে চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়ে সফল হতে হলে সাদা চামড়ার অধিকারী হতে হবে। দায়েরকৃত ১২টি মামলার হধ্যে এ পর্যন্ত ৪টি মামলা আদালতের বাইরে আপোসে শেষ হয়েছে এবং পাঁচটিতে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। লিড্স ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইবুনালে পরিচালিত সর্বশেষ দুটো মামলায় বিজয়ী হবার পর তিনি এ যাবত ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট ২৪ হাজার ২শ' ৫০ পাউন্ড লাভ করেছেন।

বর্ণবৈষম্য এ দেশে আছে এবং প্রবল ভাবেই আছে। তাহির হোসেনের সার্থকতা এখানে যে তিনি তা প্রমাণ করতে সফল হয়েছেন। প্রচ্ছন্ন বর্ণবৈষম্য সর্বত্র বিরাজ করছে। কোথাও প্রমাণের অভাবে এবং কোথাও সাহসের অভাবে এর মোকাবেলা করা যায়না। তাহির হোসেনের সাহস আছে এবং তার বুদ্ধিরও প্রশংসা করতে হয়। এ ধরণের সাহাসও বুদ্ধি কয়জন চাকুরী সন্ধানী এশিয়ান যুবকের আছে? অবশ্য এশিয়ান ছেলেদের সাহসের পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। রাস্তা-ঘাটে বর্ণবাদী হামলার শিকার হলে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বলিষ্ঠভাবে এর মোকাবেলা করে। সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে রুখতে হবে, এ নীতিতে যারা বিশ্বাসী তারা এশিয়ান যুবকদের দলবদ্ধ ভাবে মোকাবেলাকে উৎসাহের দৃষ্টিতে দেখেন। তারা এর স্বপক্ষে বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, প্রতিপক্ষ যেখানে এশিয়ানদের দূর্বল মনে করে সেখানে বর্ণবাদী হামলা বৃদ্ধিপায়। তাদের কথায় যুক্তি আছে। তবে আমার মতে বর্ণবাদের মোকাবেলায় এ নীতি স্থায়ী কোন সমাধান নয়। এর ফলে সাময়িক ভাবে বর্ণবাদী হামলা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু এ পথে বর্ণবাদ দূর হবেনা বা নির্মূল হবেনা। তা ছাড়া রাস্তা-ঘাটে আমরা বর্ণবাদের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি তা তেমন ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী নয়। টিটকারী দেয়া, স্কার্ফ খুলে নেয়া, টুপি তুলে নেয়া, দাড়িতে ধরে নাড়া দেয়া, বোতল নিক্ষেপ, দলবদ্ধভাবে তাড়া করা ইত্যাদি নিতান্ত মামুলী ব্যাপার। যখন বর্ণ হামলা রক্তপাত ও হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার দৃষ্টিতে উল্লেখিত সকল কিছুই মোটামাপের বর্ণবাদ এবং তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এর চেয়ে বড় বর্ণবাদ অফিস-আদালত, শিক্ষাদীক্ষা এবং চাকুরী ক্ষেত্রে চলছে। সেগুলো অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও সুক্ষ্ম। রাস্তার বর্ণবাদ আমরা চোখে দেখি, তাই

www.pathagar.com

চিৎকার করে এর প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু স্কুল কলেজে এবং কর্মক্ষেত্রে চলমান বর্ণবাদ সতত ক্রিয়াশীল এবং তা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। আমরা যখন বর্ণবাদী হামলার বিরুদ্ধে রাস্তায় মিছিল করি তখন অফিস-আদালতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বর্ণবাদী দৈত্যরা আরো নিষ্ঠুর এবং আরো চতুর হওয়ার ফন্দি তালাশ করে।

প্রচ্ছন্ন ও সুক্ষ্ম বর্ণবাদের মোকাবেলা করতে না পারলে এশিয়ান কমিউনিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। রাস্তায় রাস্তায় ফাইট দিয়ে তা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাহির হোসেন যা করেছেন সকল ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়, তা করা সর্বত্র সম্ভবও নয়। এ জন্যে নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। সাহসের প্রয়োজন এখানেও আছে, কিন্তু সাহস প্রধান নয়, সবকিছুও নয়। যোগ্যতা একটা বড় হাতিয়ার। অথচ এ হাতিয়ারের প্রতি আমাদের, এশিয়ানদের দৃষ্টি নেই বললেই চলে। আবার এশিয়ানদের মধ্যে বাংলাদেশী কম্যুনিটির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এদেশ বিশ্বনাথ বা জগন্নাথপুরের কোন গ্রাম নয় যে ব্রীকলেন অথবা ক্যানন স্ট্রীটের রাস্তা দিয়ে অফিস-আদালত বা স্কুল-কলেজের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া যাবে। কমপক্ষে গত দু'শতক যারা যোগ্যতা ও মেধায় বিশ্বরাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের দেশ হচ্ছে এদেশে। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের অসংখ্য মেধাও নানাবিধ কারণে এদেশে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সমাজে বাঙালী বা এশিয়ানরা নিজেদের জন্যে সম্মানজনক আসন নিশ্চিত করতে হলে লেখাপড়া ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে প্রচ্ছন্ন ও সুক্ষ্ম বর্ণবাদকে মোকাবেলার অবস্থানে পৌঁছতে হবে। আফ্রোক্যারিবিয়ান কমিউনিটি বর্ণের দিক দিয়ে সাদা নয়, বরং এশিয়ানদের চেয়ে আরো কালো। কিন্তু এদেশের অফিস আদালতে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকা কারো অগোচরে নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্থান এবং ভারত থেকে আগত জনগোষ্ঠী সংখ্যার দিক দিয়ে আফ্রো-ক্যারিবিয়ানদের চেয়ে কম নয়। বর্তমান যুগ সংখ্যার যুগ নয়, মেধা ও যোগ্যতার যুগ। এর উজ্জল প্রমাণ হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় বাঙালী কম্যুনিটির অবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। এ বরায় বাঙালী কম্যুনিটি সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু পার্লামেন্টে এবং অফিস আদালতের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বাঙালীর অবস্থান জিরো পর্যায়ে। এর কারণ বর্ণবাদ নয়, হলেও প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যে মেধা ও যোগ্যতার অভাব।

অবশ্য বর্ণবাদ নির্মূল করতে হলে শুধু মেধাও যোগ্যতা দিয়ে তা করা যাবেনা। এ জন্যে প্রয়োজন গোটা জনশক্তিকে মানবতাবোধে উজ্জীবিত করা। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে তৈরী, সুতরাং সকল মানুষ ভাই ভাই। বিশ্বজনীন এ বাণীর প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই কেবলমাত্র বর্ণবাদকে নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু মানবতার এ মহান বাণী প্রচারের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে?

www.pathagar.com

হরতাল কতটুকু গণতান্ত্রিক বা ইসলাম সম্মত?

এক.

বৃটেনের বাঙালী পাঠক সমাজ বাংলা পত্রিকা পড়েন বাংলাদেশের খবর জানতে। অন্ততঃ এটাই তাদের প্রধান আকর্ষণ। বাংলা পত্রিকার সাংবাদিকরা তা ভালো করেই জানেন। এ জন্যেই তারা বাংলাদেশের সংবাদকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু বাংলা দেশের সংবাদ আমাদের কতটুকু আনন্দ দিতে পারছে? সত্যি কথা বলতে কি বাংলাদেশ থেকে আমরা সুখবর খুব একটা পাইনা। অধিকাংশ বাংলাদেশী খবরই থাকে দুঃখ ও বেদনার। মাঝে মধ্যে অবশ্য সুখবর আসে। তবে এর পরিমাণ এতো কম যে তা আর মনেই থাকেনা।

দু'সপ্তাহ আগের লন্ডন থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ বাংলা পত্রিকা আমার টেবিলের উপর এখনও আছে। এ গুলো আমি তন্ন তন্ন করে খোঁজেও কোন আনন্দ সংবাদ পাইনি। তিনটি সুখবর অবশ্য আমার নজরে পড়েছে। কিন্তু এর কোনটিই বাংলাদেশ থেকে আসেনি। বৃটেনে বসবাসরত লায়ন হার্ট জ্যাকো আলী কিকবক্সিং-এ পুণরায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছেন। হংকং-এ অনুষ্ঠিত এশীয় যুবকাপ ফাইনালে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল বিজয়ী হয়েছে। বাঙালী স্কুল ছাত্রী জেসিকা হক চৌধুরী স্বরচিত ইংরেজী কবিতা প্রতিযোগিতায় কেনসিংটন ও চেলসি বরায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ সকল সংবাদ অবশ্যই আনন্দের। আমার কাছে আরো বেশী আনন্দের এ জন্যে যে আমরা বড়রা যেখানে একে ওপরের লেজধরে টানাটানি নিয়ে ব্যস্ত সেখানে আমাদের তরুণরা এগিয়ে যাচ্ছে। তরুণদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করছিনা, এ অভিযোগ উত্থাপন করে তারা বসে থাকেনি। ছিটেফোটা হলেও মাঝে মাঝে এ রকম কিছু সুখবর শুনিয়ে তারা আমাদের পুলকিত করতে চেষ্টা করছে। জ্যাকো আলী, জেসিকা হক চৌধুরী এবং বাংলাদেশ যুবক্রিকেট দলকে এ জন্যে অভিনন্দন।

দুই.

গত দু'সপ্তাহ আগের সবচে' বড় খবর হচ্ছে বাংলাদেশে পুনরায় হরতালের রাজনীতি শুরু হয়েছে। বিরোধীদলের ডাকে ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়েছে। হরতালের ফলে সারাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজী হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ভাঙচুর ও আহত হবার খবর এসেছে।

www.pathagar.com

সিলেটের সরকারী দল ও বিরোধীদল অবশ্য সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করায় সেখানে কোন প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। তাদের এ মহৎ দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে অন্যান্য এলাকার নেতৃবৃন্দ অনুসরণ করলে বহু ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে। শেখ হাসিনা এবং বেগম জিয়া যা করতে পারেননি, তাদের কর্মীরা তা করতে সক্ষম হয়েছে। জানিনা শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এতে খুশি হয়েছেন না রাগ করেছেন। তারা যদি জনগণের কল্যাণাকাঙ্খী হন তাহলে এ সংবাদে তারা আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় তারা হয়তো গোস্‌সা করবেন। কারণ আপোস বা সমঝোতা তারা খুব কমই বোঝেন। তাও যদি তাদের দু'জনের মধ্যকার ব্যাপারে হয় তাহলে তো কোন কথা নেই। একজন উত্তরে গেলে আরেকজন যাবেন দক্ষিণে। সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দল একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। গণতন্ত্র যেখানে আছে, সেখানে বিরোধীদলও আছে। কিন্তু খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন শেখ হাসিনা এবং এখন খালেদা জিয়া বিরোধীদলীয় রাজনীতির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এর সাথে দু'সতীনের ঘরের সাদৃশ্য বেশী বলে দুর্মুখেরা মন্তব্য করেন। এমনি অবস্থায় সিলেটবাসী আপোষের যে নজির স্থাপন করেছেন তা কারো চোখে ভালো লাগবে বলে মনে হয়না। উল্টো সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতি শোকজ নোটিশ জারী হওয়া বিচিত্র নয়। সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের কর্মীরা বলতে গেলে আপোষে গিয়ে দলীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্র বলতে পারে, বিএনপিকে হরতালের পক্ষে সভা-সমাবেশ করতে দেয়া ঠিক হয়নি। ওপরদিকে বিএনপির কেন্দ্র বলবে, সরকারী দলকে হরতালের বিপক্ষে মিছিলের সুযোগ দিয়ে দেশব্যাপী পরিচালিত আন্দোলনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ যা-ই বলুননা কেনো, সাধারণ মানুষ সিলেটের নেতৃবৃন্দকে বাহবা দিচ্ছে। তাদের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কারণে সিলেটবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। হরতালের পক্ষে-বিপক্ষে গরম গরম কথা শুনে মানুষ আতংকের মধ্যে ছিলো। সংঘর্ষ ও রক্তপাতের আশংকায় সাধারণ মানুষ ছিলো ভীত ও সন্ত্রস্থ। সিলেটের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যা করেছেন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিচারে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বিচক্ষণতা ও সহনশীলতার এ দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দেখা যায়না। আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে পরমত সহিষ্ণুতা নেই বলেই সেখানে এতো সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ। কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রীরা সিলেটের দৃষ্টান্ত অনুসরণের একটু চেষ্টা করলে জাতি জানমালের অহেতুক ক্ষয় ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

তিন.

হরতাল বাংলাদেশী রাজনীতির অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হলেও ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর সাথে গণতন্ত্রের কোন মিল দেখতে পাইনা। বলা হয় হরতাল করা গণতান্ত্রিক অধিকার। কথাটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন শেখ হাসিনা জামাতকে সাথে নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে হরতাল করেছেন। শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতায়। এখন খালেদা জিয়া জামাতকে সাথে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল করছেন। কোন হরতালকেই আমি গণতান্ত্রিক বা ইসলামী বলে মনে করিনা। দেশ যদি পরাধীন হয়,

www.pathagar.com

দেশে যদি পার্লামেন্ট বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু না থাকে তাহলে হরতালের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। পূর্বে না হলেও অন্ততঃ '৯১-এর পর থেকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়েছে। পার্লামেন্টে সব কথা বলা না গেলে এ জন্যে সভা-সমাবেশ করা যায়। কিন্তু হরতাল কেনো? হরতালের ফলে কি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি ক্ষতিগ্রস্থ হয়? এক একদিনের হরতালে কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি কোন দলের নয়, বরং গোটা জাতির। সবচেয়ে বড় কথা হরতালের ফলে জনজীবনে নেমে আসে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ও ভোগান্তির সীমা থাকেনা। দিনমজুর, রিক্সাচালক, সাধারণ ব্যবসায়ী, ফুপাতের দোকানদার প্রভৃতি শ্রেণীর জীবনে হরতাল একটি অভিশাপ। কোন বিবেকবান মানুষ তাদের দুর্গতি চোখে দেখে স্থির থাকতে পারেনা। রাজনীতির উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ সাধন। কিন্তু যে রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে তা সমর্থন যোগ্য নয়। যারা জনগণের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ চায় তারা তা সমর্থন করতে পারেনা।

শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগিরা হরতাল করেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে। খালেদা জিয়া ও তার সহযোগিরা হরতাল করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে, না শান্তি চুক্তির বিপক্ষে সে প্রশ্ন এখানে গৌন। আমার বক্তব্য হচ্ছে হরতাল সম্পর্কে। শান্তি চুক্তি সংবিধান বিরোধী হলে হাইকোর্টে মামলার পথ খোলা আছে। সংসদে এ ব্যাপারে কথা বলুন, সাংবাদিক সম্মেলন করুন, প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখুন। জাতিকে অবহিত করলে জাতি এ ব্যাপারে সোচ্চার হবে। মানুষ এমনিতেই হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। হরতালের ডাক দিয়ে গরীব দুঃখী মানুষকে আর কষ্ট দিবেন না।

যে রাজনৈতিক কর্মসূচী মানুষকে কষ্টে ফেলে দেয় তা যেমন জনকল্যাণমূলক নয়, তেমনি তা ইসলাম সম্মতও নয়। হরতালের ডাক দিলে সাধারণ মানুষকে পেটে পাথর বেধে দিন কাটাতে হয়। নতুবা তারা চুরি করে ডাকাতি করে ছেলেমেয়ের মুখে ভাত তুলে দেয়। সাধারণ ব্যবসায়ীরা দোকানপাট খুলেনা, রিক্সা, টেম্পো ইত্যাদি রাস্তায় বের হয়না এ জন্যে নয় যে তারা হরতালের পক্ষে। বরং মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা তা করে। এটা পরিষ্কার জুলুম ও অন্যায়। ইসলাম সম্পর্কে যাদের সাধারণ ধারণা আছে তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে এ ধরণের জুলুম ও অন্যায়কে ইসলাম সমর্থন করতে পারেনা। দুঃখের বিষয় যে বহু ইসলামী দল অতীতে যেমন হরতালের পক্ষে জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছে, বর্তমানেও অনেকে হরতালকে সমর্থন করছে। প্রতিবাদের জন্যে, মতামত প্রকাশের জন্যে আরো বহু পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। জনমত গঠনের জন্যেও রয়েছে বিভিন্ন কায়দা ও নিয়ম। হরতাল, সংঘর্ষ ও বোমাবাজী ছাড়াও তা সম্ভব। তাই ইসলামপন্থী দলগুলো সহ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন, দয়া করে হরতালের মতো জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মসূচী সম্পূর্ণ পরিহার করে পাবলিকের প্রতি একটু করুণা করুন।

www.pathagar.com

লন্ডনে বাঙালী ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?

বৃটেনের বাঙালী ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তারা কি সুখে আছে, না কষ্টের মধ্যে আছে? তাদের সুখ-দুঃখের খবর কি আমাদের কাছে আছে?

বাঙালী বলতে আমি এখানে বৃটিশ-বাঙালী বোঝাতে চাচ্ছি। যাদের জন্ম বৃটেনে অথবা যারা ছোটবেলা এদেশে এসেছে এবং এখানে লেখাপড়া করছে। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে যাদের পরিচয় খুবই ক্ষীণ। বাংলাদেশের নাম তারা জানে এবং তারা এ কথও জানে যে তাদের এথনিক পরিচয় বাঙালী বা বাংলাদেশী। কেউ হয়তো দুয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছে, কেউ একবারও যায়নি। যারা গিয়েছে তাদের অধিকাংশের কাছে বাংলাদেশের স্মৃতি খুব সুখকর নয়। অনেকের কাছে তা তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরপুর এক দুঃস্বপ্নের মতো। আরেকবার তাদের বাংলাদেশে নিতে হলে হাতি দিয়ে টেনে নিতে হবে। এ ব্যাপরে তাদের জিজ্ঞেস করলে অরাইট, বাট, ডিপেন্ডস ইত্যাদি বলে তারা এড়িয়ে যেতে চায়।

এ রকম বৃটিশ বাঙালীর সংখ্যা বৃটেনে কতো তা কি কারো জানা আছে? আসলে কারো জানা নেই। বাঙালী কমিউনিটির এদের নিয়ে কোন মাথাব্যথা থাকলে কমপক্ষে তাদের সংখ্যাটা আমাদের জানা থাকতো। বাঙালী কমিউনিটিতে এতো নেতা আছেন, আছে জনবল ও ধনবলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দূতাবাস। কিন্তু আমাদের সম্ভাবনাময় এ তরুণদের ব্যাপারে কারো কোন দায়-দয়িত্ব আছে বলে মনে হয়না। তাদের নিয়ে কোন গবেষণা বা রিসার্চ করার প্রয়োজন পড়েনি, পড়লে বৃটিশ সরকারের নিকট থেকেই সঠিক সংখ্যা জানা যেতো।

আমার অনুমান, এ দেশে বাঙালীর সংখ্যা তিনলাখ হলে বৃটিশ বাঙালীর সংখ্যা কমপক্ষে দেড়লাখ হবে। এ একলাখ পঞ্চাশ হাজার বাঙালী তরুণের সাথে আমাদের কতটুকু যোগাযোগ আছে? আমরা তাদের খোঁজ-খবর কতটুকু রাখি? যোগাযোগ বলতে আমি এখানে ভাবের আদান প্রদান বোঝাতে চাচ্ছি। তাদের সাথে আমাদের সাধারণ যোগাযোগ অবশ্যই অছে। বাঙালী পরিবারে তাদের জন্ম হয়েছে, তারা বাঙালী পরিবারে লালিত পালিত হচ্ছে। মা-বাবা, নানা-নানী, চাচা-চাচীর সাথে থেকে তারা বড় হচ্ছে। তাদের কেন্দ্র করে অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনদের কতো আশা কতো আকাঙ্খা আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের মনের জগতের সাথে আমাদের কতটুকু সংযোগ আছে?

www.pathagar.com

আপনি স্বীকার করুন অথবা না-ই করুন তাদের এবং আমাদের মাঝে একটি অদৃশ্য দেয়াল আছে এবং দিনে দিনে এ দেয়াল দৃঢ় ও উঁচু হচ্ছে। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে বড় হয়ে এসেছি তাদের অনেকে এ দেয়ালের খবরই রাখিনা। যারা রাখি তারা তাদের বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেয়ালটি অতিক্রম করার চেষ্টা করি। কোন কোন সময় প্রবল আক্রোশে লাথি মেরে এ দেয়াল ভেঙে ফেলার নিস্ফল প্রচেষ্টা চালাই। অদৃশ্য দেয়াল লাথি মেরে ভাঙা যায়না এ সহজ কথাটা আমরা বুঝতে পারিনা।

আমার কেন জানি মনে হয়, আমরা মা-বাবাদের কাছে বৃটিশ-বাঙালী ছেলেমেয়ের মনের জগত স্পষ্ট নয়। আমার অনুমান ভুল হলে তা হতো আমার জন্যে খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু তা হবার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। তাদের বাইরের আচার-আচরণ দেখে আমরা কখনো ক্ষিপ্ত হই বা ক্ষোভ প্রকাশ করি। আক্ষেপ করে মাথা চাপড়িয়ে বলি, কি হলো আমার সোনার টুকরো ছেলে বা মেয়ের! কিন্তু তাদের আমরা বুঝিনা,বুঝতে পারিনা। তারা বাংলা পড়তে চায়না, ভাত খেতে চায়না। ভাত খেলেও মাছে তাদের অরুচি। আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলতে আগ্রহী নয়। মসজিদে যেতে বা আরবী পড়তে চায়না। নিজেদের মধ্যে সবসময় ইংরেজীতে কথা বলে। মোটামুটি এ গুলো হচ্ছে তাদের সাধারণ বাহ্যিক আচরণ। ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রার তারতম্য হতে পারে। তবে এ দেশে বেড়েওঠা ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাধরণতঃ এ সকল আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

কোন সম্মানিত পাঠক হয়তো এ লেখা পড়ে বলতে পারেন, তার ছেলেমেয়েরা এ রকম নয়। হতে পারে কোন কোন ছেলেমেয়ে ব্যতিক্রম, হতে পারে কেউ কেউ মহাভাগ্যবান। তারা বিশেষ এবং আমি এখানে বিশেষদের কথা বলছিনা। আমার এ বক্তব্য সাধারণ ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে। আমাদের শতকরা ৯৫ জন ছেলেমেয়ের বাহ্যিক আচরণ মোটামুটি এ রকম।

তাদের আচরণের আরেকটি দিক হচ্ছে, অন্য কোন ভাইবোন না থাকলে ঘরে তারা সাধারণতঃ চুপচাপ সময় কাটায়। বই পড়ে, টিভির সামনে বসে থাকে অথবা কম্পিউটার নিয়ে আপন মনে খেলা করে। মা-বাবার সাথে তাদের কথাবার্তা খুব কমই হয়। কিন্ত বাইরে, স্কুল-কলেজে অথবা বন্ধুদের সাথে তারা উচ্ছল, সতেজ ও প্রাণবন্ত। তাদের এ উচ্ছাস ও সতেজতা ঘরে এলে কেন জানি চুপসে যায়। এর কারণ কি হতে পারে? এ নিয়ে কি আমরা কখনো চিন্তা করেছি? কেন তারা মা-বাবার সাথে খোলামেলা নয়? এটা কি তাদের জন্যে বা আমাদের জন্য ভালো বা কল্যাণকর? আসল কথা হচ্ছে এ সকল দিক নিয়ে আমরা মোটেই চিন্তা করিনা। আমরা সবসময় নিজেদের মতো চিন্তা করি এবং নিজেদের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এ কারণে আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে আমাদের দূরত্ব দিনে দিনে বাড়ছে।

www.pathagar.com

অথচ এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র আবকাশ নেই যে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েকে প্রাণদিয়ে ভালোবাসি। তাদের সামান্য অসুখ-বিসুখে আমাদের উদ্বেগের সীমা থাকেনা। তারা শুধু ভালোবাসার ধন নয়, তারা আমাদের মহামূল্যবান সম্পদও বটে। তাদের শারীরিক সুবিধা-অসুবিধা এবং বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারে আমাদের দুশ্চিন্তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাদের মনোজগত বা মানসিক উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা অত্যন্ত পীড়া দায়ক। কোন কোন সময় তা তাদের জন্যে খুবই অশান্তি ও সীমাহীন ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে রয়েছে। তাদের কষ্টের প্রধান দায় আমরা মা-বাবাদের উপরই বর্তায়। তারা কান্নাকাটি করে নিজেদেরউদ্যোগে বিলাত আসেনি, আমরাই তাদের এ দেশে নিয়ে এসেছি। এখানে এসে তারা এদেশের স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, তার পর একটা সময়ে এসে নিজেদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত তাদের মনকে প্রভাবিত করছে। তাদের এখন গঠনের সময়। তাদের মন এখন জানা ও বোঝার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার আগ্রহ শিশু ও তরুণদের অত্যন্ত বেশী থাকে। এ আগ্রহ ও চেতনা এত প্রবল যে এর সাথে শুধু পিপাসার্থ চাতকের তুলনা হতে পারে। সমাজ ও পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা তারা পাচ্ছে তাই তারা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করছে। এ দেশে তাদের পরিস্থিতি এমন যে এ ব্যাপারে যাচাই বাছাই করার সুযোগ-সুবিধা তারা পায়না। সমাজ ও পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই তাদের কাছে সঠিক ও শেষ কথা বলে বিবেচিত হয়। তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা জন্মগত ভাবে বাঙালী হলেও মানসিক দিক দিয়ে এ দেশের সন্তান হিসেবে গড়ে ওঠছে। কিন্তু তারা যখন মা-বাপের সাথে বসে তখন এক বিপরীত পরিবেশের মুখোমুখি হয়। এ সমাজের অসংখ্য বৈধ ও স্বাভাবিক জিনিস আমরা মা-বাবাদের কাছে অবৈধ ও অস্বাভাবিক। যে কাজ করলে এ সমাজে বাহবা পাওয়া যায় সে কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-বাবার কাছে অসহনীয় ও নিন্দনীয়। শুধু তাই নয়, কেন তা অসহনীয় ও নিন্দনীয় সে কথা যুক্তিসহকারে ও খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে আমরা রাজি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সে যোগ্যতাও রাখিনা।

ছেলেমেয়ের কোন কথা বা কাজ অপসন্দনীয় হলে আমরা কি করি? আমরা সাধারণতঃ ধমক দিয়ে বা মেজাজ দেখিয়ে তাদের সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চাই। অথচ স্কুলের কোন শিক্ষক বা টিউটর তাদের ধমক দেয়না। সেখানে কোন প্রশ্ন করলে তারা সুন্দরভাবে জবাব পায়। শিক্ষকের সাথে কোন বিষয়ে দ্বিমত করলে শিক্ষক এ জন্যে মেজাজ দেখান না। ঘরের এবং স্কুলের এ দু' বিপরীতধর্মী পরিবেশের মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। এ জন্যে তাদের মনের মধ্যে চলছে প্রবল এক যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব। এ যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব কখনো ক্ষোভ ও বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। এ দেশে নিয়ে এসে আমরা মা-বাবারা তাদের দু বিপরীতধর্মী পরিবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি বলেই

www.pathagar.com

তারা এ যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছে। এ জন্যে তারা মোটেই দায়ী নয়।

ছেলেমেয়েদের মানস গঠনে সমাজ ও পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দেশের সমাজ ও শিক্ষা তাদের এক ধরণের মানসিকতা সম্পন্ন করে গঠন করছে। এ মানসিকতার স্বরুপ কি এবং আমাদের লালিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের সাথে এর সংঘাত কোথায় সে খবর আমাদের জানা নেই অথবা তা তলিয়ে দেখার সময় আমাদের নেই। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে, ভালো রেজাল্ট করছে, ভালো বেতনে চাকরি করছে ইত্যাদি অবশ্যই সুখবর এবং আমরা এগুলো নিয়ে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট। কেউ কেউ মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বা শাসিয়ে নিজ কর্তব্য শেষ করে দিয়েছেন বলে মনে করেন। বিষয়টা ধমক বা শাসনের নয়, অনুধাবনের। জ্ঞান, যুক্তি, তথ্য এবং তত্ত্বের মাধ্যমে তাদের মনোজগত তৈরি হচ্ছে । ধমক, শাসন, এমনকি পিটুনি বা ঘর থেকে বের করে দিয়েও এ মানসিকতা পরিবর্তন করা যাবেনা। জ্ঞান, যুক্তি, তথ্য এবং তত্ত্বসমৃদ্ধ আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ভাব প্রকাশের বাহন যেহেতু ইংরেজী সেহেতু এ সকল আলোচনা অবশ্যই ইংরেজীতে করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে ক'জন বাঙালী মা-বাবা এ গুলো বোঝার ক্ষমতা রাখেন এবং যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে এ সমাজের মোকাবেলায় নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম? এমতাবস্থায় মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের মুক্তির উপায় কি?

আমার মতে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে মুক্তির দুটোমাত্র পথ রয়েছে। একটা পথ আফ্রো-ক্যারিবিয়ান এবং এ জাতীয় কিছু ইমিগ্র্যান্টরা গ্রহণ করেছে। তারা এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পূর্ণ মিশে যাচ্ছে। মনে-প্রাণে ও আচার-আচরণে তারা পুরোপুরি বৃটিশ হবার চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলেমেয়েকে এ পথে ছেড়ে দিলে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকবেনা। এ দেশের স্কুল-কলেজ, সমাজ, টিভি এবং অন্যান্য নিউজ-মিডিয়া তাদের গঠন করবে। বাঙালী, মুসলমান বা এশিয়ান হিসেবে তারা নিজেদের চিন্তা করবেনা। বৃটেনই হবে তাদের স্বদেশ এবং তারা এ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সুখ-শান্তির সাথে নিজেদের সম্পূর্ণ একাত্ম করে দিবে।

আসলে আমরা পসন্দ করি বা না-ই করি আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ ভাবেই গঠিত হচ্ছে। তারা তাদের মনের ভাব আমাদের সামনে প্রকাশ করেনা বলেই আমরা বুঝতে পারিনা। বৃটিশ বা পাশ্চাত্য সমাজে যা নিন্দনীয় তারা তা পসন্দ করেনা এবং যা ভালো তা তাদের দৃষ্টিতেও ভালো অথবা কমপক্ষে 'ইটস্ ও কে'। তাদের হাতে যখন সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আসবে তখন তাদের আসল চেহারা আমরা দেখতে পাবো। বৃটেনের বাঙালী মুসলমানদের সমাজের অনেক ঘটনাবলী আমরা ঢেকে

www.pathagar.com

রাখলেও তা কারো অজনা নয়। এ সব বিশ্লেষণ করলে এ সত্য আমাদের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংসপ্রায় অবস্থার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের অবহিত করা এবং এর বিকল্প হিসেবে একটি সমাজ ও সভ্যতার পথ প্রদর্শন করা। এ বিকল্প পথকে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যেমন বলিষ্ঠভাবে পেশ করতে হবে তেমনি তা যে আধুনিক সমাজ ও পরিবেশে যে কার্যকর ও উপযোগী এর বাস্তব প্রমাণও উপস্থাপন করতে হবে। কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় অথবা সভা-সমাবেশে গেলো গেলো বলে চিৎকার করা কোন কাজ নয়, বরং তা আমার মতে আমাদের আরো বহু অকাজের মতো আরেকটা অকাজ মাত্র।

এ দেশে বাঙালী কমিউনিটির ভবিষ্যত সম্পর্কে যারা চিন্তা করেন, যাদের মনে দায়িত্ববোধ রয়েছে তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন এবং বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করছি।

লন্ডন, ১৪ মার্চ ২০০০

www.pathagar.com

যারা সুরত মিয়ার মত লাশ হতে চান না তারা কথা বলুন

ঢাকায় প্রবাসীদের হয়রানির খবর আসছে, লাশ হওয়ার খবর আসছে। কিন্তু চারদিকে সুনসান নিরবতা বিরাজ করছে। ভাবটা যেন কিছুই হয়নি। অথবা কিছু হলেও তা নিতান্তই সামান্য জিনিস। মনে হচ্ছে আমরা সবাই সুরত মিয়ার মত লাশ হয়ে আছি, অথবা লাশ হওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছি।

সুরত মিয়া নিহত হয়েছেন ৯৬ সালের ৯ মে। ঢাকা বিমান বন্দরে প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে হত্যা করা হয়। ৯৬ থেকে দু'হাজার সাল, দীর্ঘ চার বছর চলে গেছে। এ সময়ের মধ্যে আইনানুগ পন্থায় এর বিচার চাওয়ার সম্ভাব্য সকল কিছু করা হয়েছে। প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ, ডেলিগেশন - কি না হয়েছে? 'সাপোর্ট কমিটি টু সিকিউর জাষ্টিস' গঠিত হয়েছে। সুরত মিয়া হত্যার বিচার ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বহু গন্যমান্য লোক নিয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল ঢাকায় গিয়ে এ নিয়ে সরকারের সাথে দেন-দরবার করে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্পীকার, সরকারী দল ও বিরোধীদলের অন্যান্য নেতানেত্রী সবাই এ ব্যাপারে জোর গলায় আশ্বাস দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন, 'আব্দুস সামাদ আজাদ বেঁচে থাকলে সুরত মিয়া হত্যার বিচার হবে।' কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে সুরত মিয়া হত্যার বিচার হয়নি, হওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছেনা। সুরত মিয়ার বিধবা স্ত্রী এবং পিতৃহারা সন্তানদের কাছে আমারা কি জবাব দেব? আমাদের কি কোন জবাব আছে? আমরা হয়তো সৈয়দা শমছি ও তার ছেলেমেয়েকে বলতে পারি, তোমরা আমাদের ব্যর্থতাকে ক্ষমা করো। আমরা হয়তো বলতে পারি, আমাদের জন্যে যা করা সম্ভব ছিলো সবই আমরা করেছি। আমরা তো লন্ডন থেকে গিয়ে হত্যাকারীকে ধরে আনতে পারব না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী একবার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমরা মাফিয়া চক্রের হাতে জিম্মি। তার কথাটা হয়তো কথার কথা নয়। আসলেই হয়তো বাংলাদেশ সরকার মাফিয়া চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে আছেন। নতুবা সুরত মিয়া হত্যার বিচার ধামাচাপা পড়ার কথা নয়। এত চাপ, এত দাবি এবং এত আশ্বাসের পর এ কথা ভাবা যায়না যে এর বিচার হবেনা।

সুরত মিয়া হত্যার বিচার যদি হতো তা হলে এই একটি বিচারই ঢাকায়

www.pathagar.com

প্রবাসীদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারতো। এ বিচার হয়নি বলেই ঢাকা বিমান বন্দরে প্রত্যহ প্রবাসীরা নাজেহাল হচ্ছেন, একের পর এক খুন ও নির্যাতনের খবর আসছে। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি একজন মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করে।' একই ভাবে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, একটি খুনের বিচার না হলে আরো অসংখ্য খুনের জন্ম দেয়। সুরত মিয়া হত্যার বিচার হয়নি, সুতরাং এর জের ধরে আরো অনেক প্রাণের ক্ষয় হবে। হত্যাকারীরা জানে, তাদের একটি চুলও কেউ ছিড়তে পারবেনা। এ জন্যেই খোন্দকার ফরিদ উদ্দিনকে তারা বলতে পেরেছে, 'রাগ করবেন না, পয়সা দেন নতুবা সুরত মিয়ার অবস্থা হয়ে যাবে।' জনাব খোন্দকার ফরিদ উদ্দিন কোন সাধারণ মানুষ নয়, বৃটেনের একজন গন্যমান্য ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশ সেন্টার এবং বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সহ বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। কমিউনিটির যারা নেতা তাদের যদি এ ভাবে নাজেহাল হতে হয় তা হলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কোন পর্যায়ে পৌছেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রবাসীদের ভোগান্তির সকল খবর পত্রিকায় আসেনা। যদি আসতো তা হলে প্রবাসীরা দেশে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে দিতেন। আমরা যারা দেশে যাই তারা আসলে প্রাণ হাতে নিয়ে দেশে যাই। না গিয়ে উপায় নেই এ জন্যে যাই। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে এর সাথে একমাত্র মগের মুল্লুকের তুলনা হতে পারে। পঞ্চভূতে মিলে দেশটাকে লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে। এখন তাদের কথা হল, উল্টে পাল্টে দে মা চেটেপুটে খাই।

এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিনীত ভাবে একটি কথা বলতে চাই। সধারণতঃ আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং হোমরা-চোমরা ব্যক্তিবর্গ যখন দেশে যান তখন দেশে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়না। তাদের নেয়ার জন্যে বিমান বন্দরে গাড়ির বহর আসে। কাষ্টম বা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে কেউ তাদের সাথে ঝামেলা করার সাহস পায়না। ঘটনাক্রমে কোন ঝামেলায় পড়ে গেলে তক্ষুনি বড় কোন অফিসার এসে তাদের এ বলে উদ্ধার করে নিয়ে যান, 'সর্বনাশ ! উনি লন্ডনের খুব বড় এক নেতা। তার ব্যাগেজ খুললে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।' অসুবিধায় পড়তে হয় শুধু আমাদের মত সাধারণ মানুষের যাদের গলায় নেতৃত্বের তকমা নেই, কপালে নেই রাজটীকা। নিদেনপক্ষে যারা পালাক্রমে দেশ শাসন করেন তাদের সাথে দহরম মহরম থাকলেও বেশ সুবিধা পাওয়া যায়। হতে পারে বাংলাদেশ থেকে নেতা-নেত্রী এলে আমরা যে তাদের পেছনে লাইন দেই এর পেছনে হয়তো এ উদ্দেশ্যও থাকে যে আমরা যখন দেশে যাব তখন তারা এর বিনিময়ে কমপক্ষে এয়ারপোর্টের শকুনদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে নেবেন। স্বীকার করি ইচ্ছাটা সাধু, সুতরাং নেতা-নেত্রী এলে যত পারেন তেল দেন আমাদের কোন আপত্তি নেই।

এ কথা মনে করার কেন কারণ নেই যে প্রবাসীরা শুধু ঢাকা বিমান বন্দরেই

www.pathagar.com

নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এবং সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরে জামাই আদর পাচ্ছেন। সিলেট বিমান বন্দরেও প্রবাসীদের সমান ভাবে হয়রানি করা হয়। সিলেট বিমান বন্দরের বাইরে আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতির কারণে প্রবাসীরা সেখানে মানসিক দিক দিয়ে একটু সবল থাকেন ও নিরাপদ বোধ করেন।

এখানে আরেকটি কথা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাকায় যে সকল প্রবাসী নির্যাতিত হন তারা সবাই কিন্তু সিলেটী। এর কারণ কি? ওরা কি বেছে বেছে সিলেটীদের ধোলাই দেয়? শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এয়ারপোর্টের লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলে, 'ওই আইছেরে সিলটি, একটু ভালো কইরা দেখিস্।' মনে হয় সিলেটে জন্ম হওয়াটাই আমাদের অপরাধ, তাই নয় কি? পাকিস্তানের প্রেমে পাগল হয়ে আমরা সিলেটের লোকেরা পূর্ব বাংলার সাথে যোগ দিয়েছিলাম। নতুবা সিলেট আসামের অংশ হিসেবে আজ ভারতের অংগরাজ্যের মর্যাদা পেত। যারা সে সময় আমাদের আসাম ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের সাথে বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন। ঢাকায় আমাদের প্রতি যে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয় তা কি তিনি স্বীকার করেন এবং করলে এ ব্যাপারে কি তার কোন করনীয় আছে?

আমাদের জেনে রাখা ভালো যে বিমান বন্দরে যারা প্রবাসীদের লুটপাট ও নির্যাতন করে তারা অত্যন্ত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী। সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশে পরিচালিত লুন্ঠন ও নির্যাতনের সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ ভাবে যে লুন্ঠন চলছে এর সাথে যখন যারা ক্ষমতায় আসেন তাদের যোগসাজোশ রয়েছে। কিন্তু তা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও তেমন সংঘবদ্ধ নয়। আবার সেখানে বাঘের উপর টাগেরও দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এয়ারপোর্টের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শোনা যায়, যারা বিমান বন্দরে চাকরি নিয়ে আসে তারা বড় অংকের সেলামির বিনিময়ে এখানে বদলি হবার সুযোগ পায়। এ সেলামি প্রদান প্রক্রিয়া আবার বছরে বছরে চালু রাখতে হয়। কেননা এ ভয় সবসময় আছে যে ওপর কেউ আরো বেশি সেলামি দিয়ে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারে। আরেকটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিমানবন্দরে যারা লুটপাট করে তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তারা লুটের মাল একা ভোগ করেনা, একা ভোগ করার সুযোগই সেখানে নেই। পিয়ন থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা পর্যন্ত সবাইকে এর অংশ দিতে হয়। এ ভাবে তারা সুকৌশলে স্বার্থের বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। সিভিল এভিয়েশনের কর্মচারী, ঝাড় দার, পুলিশ - সবাই একই সুতোয় বাধা। স্বার্থের বন্ধনের চেয়ে শক্তিশালী বন্ধন আর কি হতে পারে? কেউ সেখানে সাধারণতঃ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। কেউ সততা দেখাতে গেলে হয় তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে শায়েস্তা করা হয়, নতুবা দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পার্বত্য এলাকা বান্দরবনের মত জায়গায় নির্বাসনে যেতে হয়।

www.pathagar.com

প্রবাসীরা খুন হচ্ছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন, হয়রানির শিকার হচ্ছেন এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এর প্রতিকার কি ভাবে করা যায়? সুরত মিয়ার জন্যে আমরা অনেক কিছু করেছি। কিন্তু সস্তা বাহবা এবং মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আমরা আর কিছু পাইনি। সম্প্রতি জনাব খোন্দকার ফরিদ উদ্দিনকে ঢাকার জনৈক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা যে হুমকি দিয়েছেন তা যদি আমরা উপেক্ষা করি তা হলে আমরা নিজেরাই নিজেদের মাথায় কুড়াল মারবো। সুতরাং আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। এখানে সোচ্চার বলতে প্রতিবাদ সভা বা সংবাদ পত্রে বিবৃতি প্রদানের কথা আমি বলছিনা। আমার মতে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ সভা বা সংবাদ পত্রে বিবৃতি প্রদান করে কোন লাভ হবেনা, অর্থ ও সময়ের অপচয় হবে মাত্র। আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে বাংলাদেশ সরকারের টনক নড়ে।

আমরা দু'লাখ বাংলাদেশী বৃটেনে বসবাস করি। আমরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারি। শর্ত হচ্ছে, দলমত নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একটি অসুবিধার বিষয় যে আমাদের আধিকাংশ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। দলীয় শৃংখলার কারণে তারা অনেক সময় নিজ দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন না। কিন্তু এর সাথে যেহেতু প্রবাসীদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত তাই আশা করা যায় তারা এ ব্যাপারে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসবেন।

এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাব খুবই সহজ এবং সরল। সুরত মিয়া হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে বয়কট করতে হবে। ক্ষমতাসীন দল এবং সকল বিরোধীদলকে এ বিষয়ে একই কাতারে শামিল করতে হবে। সুরত মিয়াকে যখন হত্যা করা হয় তখন আজ যারা বিরোধীদলে তারাই ক্ষমতায় ছিলেন। এভাবে আমরা বাংলাদেশর সরকার এবং জনগণ উভয়ের উপর সুরত মিয়া হত্যার বিচার তরান্বিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারি। আমার বিশ্বাস বয়কট প্রক্রিয়া অবশ্যই কাজ দিবে। অবশ্য সরকার ও বিরোধীদলের পক্ষথেকে প্রবাসীদের ঐক্যে ফাটল ধরাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হবে। আমাদের প্রবাসী জনগণ দৃঢ়তার পরিচয় দিলে সরকারের জন্যে সুরত হত্যার বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবেনা।

যারা সুরত মিয়ার মত লাশ হতে চান তারা এ ব্যাপারে চুপ থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা লাশ হতে চান না তারা দয়া করে কথা বলুন। আমার প্রস্তাব পসন্দ না হলে বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে দয়া করে এগিয়ে আসুন।

ঢাকা বিমান বন্দরের লুটপাট প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধু মজার একটি গল্প বলেছেন। গল্পটি বলেই আজকের লেখা শেষ করছি। ঘটনাটা নিউ ইয়র্কের। ওরা দু'জন

www.pathagar.com

প্রেম করে বিয়ে করেছে, কেননা ইউরোপ-আমেরিকায় এটাই প্রথা। পেশায় উভয়ই পকেটমার। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওরা ভীষণ আনন্দিত। তাদের ভাবনা, যদি তাদের কোন সন্তান জন্ম নেয় তা হলে সে নিশ্চয়ই আরো বড়ো পকেটমার হতে পারবে।

এক সময় তাদের একটি ছেলে জন্ম নেয়। কিন্তু তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে ছেলেটির ডান হাত সব সময় মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। বহু চেষ্টা করেও হাত খোলা যাচ্ছেনা। শিশুর ডাক্তার তখন মা-বাবাকে একজন চাইল্ড সাইকোলজিষ্টের কাছে যাওয়ার জন্যে পরামর্শ দিলো। চাইল্ড সাইকোলজিষ্ট সব কথা শুনে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলো। তারপর নিজের সোনার চেইনযুক্ত ঘড়িটি ছেলের চোখের সামনে নাড়তে থাকলো। ছেলেটি কিছুক্ষণ সোনার চেইনের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করে দিলো। কিন্তু ছেলের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে মা-বাবা বিস্ময়ে একেবারে থ। মিডওয়াইফের হারিয়ে যাওয়া সোনার আংটিটি সেখানে পড়ে আছে।

www.pathagar.com

জেনারেল ওসমানীর অপরাধ কি?

জেনারেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন, ছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষথেকে নির্বাচিত এম পি এবং মন্ত্রী। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ তাঁকে সামনে নিয়েই সর্বপ্রথম মাঠে নামে। সে দিন জেনারেল ওসমানী না থাকলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ইতিহাস আজ হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হতো। জনগণের সামনে যাওয়ার জন্যে তাদের আরো অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হতো। কিন্তু আমরা সবাই আজ জেনারেল ওসমানীকে ভুলে গেছি। আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী ঘরানার প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী তাঁকে সযত্নে পরিহার করে চলেন। আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর মনে হয়। আমরা কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি এবং বলি যে গত বিশ বছর যাবত এ চেতনাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সংগঠনের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে তারা এখন ক্ষমতার মসনদে। সুতরাং কেউ যদি আশা করে যে এখন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হবে, করা হবে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন তা হলে নিশ্চয়ই তার আশা অযৌক্তিক বা অন্যায় নয়। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জেনারেল ওসমানীকে এড়িয়ে চলেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে বাদ দিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত করতে ও উর্ধে তুলে ধরতে চান। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব?

সত্যিকথা বলতে কি জেনারেল ওসমানীর দুর্ভাগ্য যে তার জন্ম বাংলাদেশে হয়েছে। ইউরোপীয় কোন দেশে জন্ম হলে সে দেশের শিশু-কিশোরগণ তাঁর জীবন কাহিনী পাঠ্যপুস্তকে পাঠ করার সুযোগ পেতো এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর রাষ্ট্রনীতি নিয়ে গবেষণা করে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতো। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্যে তিনি ছিলেন বেমানান। পাঠকগণ হয়তো আমার সাথে একমত হবেন না। আমার মতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সততার কোন স্থান নেই। ন্যায়-নীতি মেনে চলে সেখানে রাজনীতি করা যায়না। তোষামোদে ও ধোকাবাজদেরই সেখানে জয়জয়কার। জেনারেল ওসমানী তোষামোদ পসন্দ করতেন না এবং রাজনৈতিক ধোকাবাজদের তিনি ছিলেন দুশমন। এজন্যেই তিনি আওয়ামী লীগে থাকতে পারেননি। একই কারণে নতুন দল গঠন করেও সাড়া জাগাতে পারেননি। তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ এটাই ছিল যে তিনি ছিলেন অসম্ভব রকম এক সৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়নতার অসংখ্য কাহিনী মানুষের মুখে মুখে এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সততাই তাঁর রাজনীতির জন্যে কাল হয়েছে। এ ধরণের সৎ মানুষকে বাংলাদেশের মানুষ দূর থেকে সালাম দেয় ও শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

করে। কিন্তু কাছে টেনে নেয়না। থানার দালালী, মোকদ্দমার তদবির, পারমিট-লাইসেন্স এবং অন্যান্য দু'নাম্বারী কাজে এরা অচল মাল।

জেনারেল ওসমানী সম্পর্কে অন্যান্যদের মত আমারও এমনিতে একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিলো, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি ছিলো খুবই সীমিত। ৮৬ সনের দিকে সিলেটের সাপ্তাহিক সমাচার-সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ খান জেনারেল ওসমানীর জীবন ও কর্ম নিয়ে একখানা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং তা সম্পাদনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমি সিলেট ছেড়ে চলে আসায় সম্পাদনার মহৎ কাজটি সম্পন্ন করতে পারিনি। তবে এ সুবাদে জেনারেল ওসমানী সম্পর্কে জানার জন্যে বহুলোকের সাথে কথা বলেছি এবং তাঁর সম্পর্কে লেখা বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে জেনারেল ওসমানীর ঘনিষ্ট সহযোগী ও বন্ধু কর্নেল এ আর চৌধুরীর সাথে এ ব্যাপারে আমি কয়েক দফা বসেছি এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেছি। এ ভাবে পড়াশোনা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জেনারেল ওসমানী সম্পর্কে আমি যতটুকু জেনেছি তা থেকে এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন দিক দিয়ে তিনি বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের সামনে তুলে ধরার মত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। এ ধরণের ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে আর আছে কি না সন্দেহ আছে। সততা, ন্যায়পরায়নতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থার কারণে তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের কাছে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমরা যদি তাঁকে মূল্য না দেই বা না দিতে পারি তা হলে তা হবে আমাদের নিজেদের অযোগ্যতা ও দীনতা। বাংলাদেশে যে রাজনীতি দেখে আমরা অভ্যস্ত সেখানে কি কেউ মন্ত্রীত্ব থেকে কি কেউ পদত্যাগ করে? আমরা আরো দেখি, কেউ নির্বাচনে অংশ নিলে সেখানে সবাই যে ভাবেই হোক পাশ করতে চায়। বৈধ-অবৈধের প্রশ্ন তখন গৌন হয়ে যায়। কিন্তু জেনারেল ওসমানীর বেলা আমরা কি দেখি? এক নির্বাচনের সময় তাঁর কয়েকজন কর্মীকে অবৈধ ভোট প্রদানের দায়ে গ্রেফতার করা হয়। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হওয়া কর্মীদের মুক্ত করতে গেলে পুলিশ কর্মকর্তা বলে যে, ওসমানী সাহেব অনুরোধ করলে তাদের ছেড়ে দেয়া হবে। ওসমানী সাহেবের কাছে এ খবর পৌছলে তিনি ঠিকই থানায় ফোন করেন। কিন্তু ফোন করে তিনি কি বলেন জানেন? তিনি বলে দেন যে ওদের কেউ জালভোট দিয়েছে তা প্রমাণিত হলে এ জন্যে যে শাস্তি রয়েছে ত-ই যেন তাদের দেয়া হয়। বাংলাদেশে কি এর কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবেন? জেনারেল ওসমানীর জীবনে এ রকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়না, কি তাঁর অপরাধ? কেউ কেউ বলেন তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে তাঁর বাড়ি সিলেট। কারো মতে কঠোর নীতিনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি যথার্থ মর্যাদা পাচ্ছেন না। অপর কিছু লোকের মতে আওয়ামী লীগের প্রভাব বলয় ছেড়ে আসাই তাঁর সবচেয়ে বড়

www.pathagar.com

অপরাধ। এ কারণেই অওয়ামী লীগ তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বলেই স্বীকার করতে চায়না। তাদের মতে তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। একজন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী আরো এগিয়ে গিয়ে জেনারেল ওসমানীকে ভীরু ও কাপুরুষ হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সকল মিথ্যাচার যদি এখন সংশোধন করা না হয় তা হলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নিছক এক নামসর্বস্ব নায়ক হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

এম আর আখতার মুকুল তার আমি বিজয় দেখেছি গ্রন্থে এমন সব কথা বলেছেন যার সাথে অন্যান্যদের বর্ণনার মিল নেই। মনে হয় কোন পূর্বশত্রুতার জের ধরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তিনি জেনারেল ওসমানীর চরিত্র হননের চেষ্টা করেছেন। রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানী কেন উপস্থিত ছিলেন না, এ কথা তখন যেমন উত্থাপিত হয়েছে, তেমনি এখনো অনেকের মনে এ ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। এম আর আখতার মুকুলের বক্তব্য অনুযায়ী জেনারেল ওসমানী ভয়ে সেখানে হাজির হননি। যার কারণে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দীন আহমদ বাধ্য হয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকারকে সেখানে পাঠান। অথচ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ:দলিলপত্র' ১৫শ খন্ডে জনাব এ কে খোন্দকারের একটি সাক্ষাতকার রয়েছে। সেখানে এ কে খোন্দকার স্পষ্টভাবে বলেন যে সে সময় ওসমানী সাহেব মুজিব নগরে ছিলেন না বলেই তাকে (এ কে খোন্দকারকে) আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়।

এ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন-প্রধান এবং বর্তমান সংসদের স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ভিন্ন ধরণের বক্তব্য রেখেছেন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ' গ্রন্থে প্রকাশিত সাক্ষাতকারে তিনি ভারত সরকারের সাথে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত গোপন সাত দফা চুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তার বর্ণনা মতে, চুক্তির মধ্যে এ কথা ছিল যে সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান,- মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন। যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনে থাকবে। চুক্তির এ অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানানো হলে তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন না।

যে যা-ই বলুন না কেন এ ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীর নিজের কথাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজে ভালকরে জানেন কেন তিনি সে অনুষ্ঠানে থাকেননি। ১৯৮০ সালের স্বাধীনতা সংখ্যা রোববারে প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, " তখন আমি ছিলাম রণাঙ্গন সফরে। তবে তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

জানতেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু আমাকে কোন খবর দেয়া হয়নি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে পাঠান আমার ডিপুটি চীফ অব ষ্টাফ তদানীন্তন গ্রুপক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকারকে।.....উপরোক্ত বাস্তব তথ্য ও পারবর্তী ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের মহান ব্যক্তিবর্গ (স্ব স্ব কারণে ও উদ্দেশ্যে)চাইতেন না যে এ আত্মসমর্পন বাংলাদেশ তথা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে হোক।"

ওসমানীর বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে মুকুল সাহেবের কথা একটা বানানো কথা মাত্র।

আমি বলছিলাম, ওসমানী সাহেবের অপরাধ কি যার কারণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হয়েও সমাদর পাচ্ছেন না ? তাঁর প্রথম অপরাধ হচ্ছে, (হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ভাষ্য অনুসারে) ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত সাতদফা গোপন চুক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করা। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৪ সালের মে মাসে চিঠি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করা এবং পরবর্তীতে সে চিঠি প্রকাশ করে দেয়া। তৃতীয়তঃ বাকশাল প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সংসদ থেকে এ বলে পদত্যাগ করা যে চতুর্থ সংশোধনীর অর্থ হল জনগণের সাথে প্রতারণা করা। তাঁর চতুর্থ অপরাধ অপেক্ষাকৃত গুরুতর। ৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর খোন্দকার মোশতাককে তিনি কিছুটা সহযোগিতা প্রদান করেন। খোন্দকার মোশতাক তাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে যখন মোশতাক সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তখন জেনারেল ওসমানী শপথ না নিয়ে অবৈতনিক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনে সম্মত হন। আসলে জেনারেল ওসমানী তখন খোন্দকার মোশতাককে সহযোগিতার নামে জাতীয় সংকট মুহূর্তে জাতিকে সেবা প্রদান করেছেন। তখন সেনাবহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছিল এবং তা পুনঃস্থাপনে জেনারেল ওসমানীর সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি একই ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন জাতীয় সংকট মুহূর্তে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন শুধূ তারাই তুলতে পারে যাদের বোচকার উর্ধে ওঠে চিন্তা করার ক্ষমতা-ই লোপ পেয়ে গেছে।

জেনারেল ওসমানী সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদ ছিলেন না। চাটুকারিতা ও কপটতাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। রাজনীতি বলতে তিনি গণনীতি বুঝতেন। রাজনীতি তাঁর পেশা ছিলনা। লুটপাট সমিতির যারা সদস্য তারা তাঁর কাছেই যেতে ভয় পেতো। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটজনক মুহূর্তে জেনারেল ওসমানীর জীবন থেকে আমাদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা দরকার।

www.pathagar.com

এক.

এক মুদি, এক ব্যাঙ্কার আর এক রজনীতিবিদ পথ হারালো জঙ্গলে। শেষ পর্যন্ত তারা এক কৃষকের বাড়ি পৌছে রাতটা সেখানে কাটাতে অনুরোধ করলো। কৃষক অত্যন্ত কৃতার্থ হয়ে তাদের থাকতে দিতে সম্মত হয়ে বলল, এটা খুবই আনন্দের কথা, আপনারা গরীবের ঘরে এসে থাকতে চাচ্ছেন। তবে আমার থাকার ঘরে মাত্র দু'জন থাকার মতো জায়গা আছে। আপনাদের যে কোন একজনকে গোয়ালঘরে থাকতে হবে। সমস্যা হচ্ছে ওখানে গরু-ছাগল আছে। খুব বাজে গন্ধ পাবেন সেখানে।

'আমি ঘুমাবো গোয়াল ঘরে'। ভালোমানুষ ব্যাঙ্কার বলল।

কিন্তু আধঘন্টা যেতেই ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলে দেখা গেলো ব্যাঙ্কার দাড়িয়ে আছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, অসম্ভব! আমার পক্ষে ওখানে থাকা সম্ভব নয়।

'ঠিক আছে, আমিই থাকবো গোয়ালঘরে', এ বলে বেরিয়ে এলো মুদি। কিন্তু ওরে বাপ! এই গোয়াল ঘরের গন্ধের সাথে আরগুলোর তুলনাই হয়না।

'কি যে তোমরা!' নাক সিঁটকে বলল রাজনীতিবিদ।

'আমি চললাম, দেখি কেমন গন্ধ।'

আধঘন্টা পর আবার দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলে কৃষক, ব্যাঙ্কার এবং মুদি অবাক! গোয়াল ঘরের সবক'টি জন্তু দাড়িয়ে আছে দরজার সামনে লাইন ধরে।

দুই.

রাজনীতির সরল অর্থ কি তা হলে পলিটিক্স? কথাটা পুরাতন একটা কৌতুকের মত শোনাচ্ছে। এক ভদ্রলোক রিক্সায় চড়ে বললেন, চল বিশ্ববিদ্যালয়ে। রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। বিশ্ববিদ্যালয় আর খুজে পায়না। যাত্রী ভদ্রলোক দেখেন দূর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, ঐতো ইউনিভার্সিটি দেখা যাচ্ছে। ওদিকে চালও। যাত্রীর কথা শুনে রিক্সাওয়ালা ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে, আরে সাহেব এ কথাটাতো আগে বলবেন, যে আপনি ইউনিভার্সটিতে যাবেন। তা হলে আমাকে এতো হয়রান হতে হয়না।

www.pathagar.com

হ্যা, রাজনীতির চেয়ে পলিটিক্স শব্দের সাথে বাঙালী বেশী পরিচিত। তাই পলিটিক্স কথাটির অর্থ এবং তাৎপর্য তাদের কাছে, বিশেষ ভাবে আপামর জনতার কাছে অনেক বেশী স্পষ্ট। কেউ কারো সাথে ধোকাবাজী করলে বা কাউকে কৌশলে জব্দ করতে চাইলে বলা হয়, 'দেখ, সে আমার সাথে পলিটিক্স করছে'। যদি কোন ছেলে-ছোকরা মুরব্বীর সাথে প্রতারণা বা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় তাহলে মুরব্বী মন্তব্য করেন, দেখ,কালকের ছেলে, আজই সে আমার সাথে পলিটিক্স শুরু করে দিয়েছে। আমরা যদি বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যালোচনা করি তাহলে পলিটিক্স শব্দের এ অর্থের সাথে এক আশ্চর্য মিল দেখতে পাই। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি হচ্ছে জনতার সেবা করার একটা অঙ্গীকার। কিন্তু অনেকের কাছে তা নিছক বুদ্ধির খেলা। খেলতে নামলে ফাউল হবে। কিন্তু আসল টার্গেট হচ্ছে খেলায় জেতা। জিততে না পারলে ফাউলের হিসাব করে লাভ নেই। আবার বিজয়ী হতে পারলে হাজারটা ফাউল করলেও কিছু যায় আসেনা। এক অর্থে এ কথা ঠিক যে রাজনীতি কিছুটা বুদ্ধির খেলা বটে। তবে এ খেলায় রেফারি একজন দু'জন নয়। রাজনীতির খেলায় পুরো দেশবাসী রেফারির ভূমিকা পালন করে। ফুটবল খেলায় রেফারিরা খেলা চলাকালেই খেলোয়াড়দের দোষত্রুটি ধরেফেলে, প্রয়োজনে লালকার্ড হলুদ কার্ড দেখায়। রাজনীতির খেলায় খেলার মাঝখানে সাধারণতঃ লালকার্ড-হলুদ কার্ড দেখানো হয়না। নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জনগণ তাদের খেলতে দেয়। অবশ্য দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সে ভিন্ন কথা। জনগণ তখন ফুসে ওঠে এবং মেয়াদপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়না। সরকারকে তখন বাধ্য হয়ে ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পথে যেতে হয়।

তিন.

বাংলাদেশে বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক খেলায় তারা প্রধান পক্ষ। বিএনপি সেখানে দ্বিতীয় পক্ষ। জামাত, জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য যে সকল দল আছে তাদের ভূমিকা সেখানে গৌন, নিছক পার্শ্বচরিত্রের। রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা হয় এবং তা প্রধানতঃ আসে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের এটা রীতি। বিরোধী দল ছাড়াও সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি মহল থেকে ক্ষমতাসীন দলের নীতি বা বিভিন্ন পদক্ষেপের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা হতে পারে, হওয়া সুস্থতার লক্ষণ। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা সরকারের জন্যে কল্যাণকর এবং এতে সরকারের ইমেজ বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি যাদের শ্রদ্ধা আছে তারা সমালোচনাকে স্বাগতঃ জানায় এবং প্রয়োজনে এর জবাব দেয়। আমার কেন জানি মনে হয়, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কেনো যেনো সমালোচনা সহ্য করতে পারেনা। দলের ভেতরে বা বাইরে যখন তাদের সমালোচনা করা হয় তখন তারা কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের নীতি। এ নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা করে গণতন্ত্রী হওয়া যায়না। মাঠে খেলতে নেমে কেউ ভুল করলে দর্শকরা সমালোচনা করবে। এ সমালোচনা অসহ্য হলে তার খেলা

www.pathagar.com

পরিত্যাগ করে দর্শকের গ্যালারীতে গিয়ে বসা দরকার। সত্যিকার খেলোয়াড় এবং সত্যিকার রাজনীতিবিদরা সমালোচনা থেকে শিক্ষা নেন, নিজেদের আরো চৌকস ও পারঙ্গম করে তুলতে সচেষ্ট হন। আওয়ামী লীগ সরকার যদি নিজের যোগ্যতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখে তাহলে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভাবমুর্তি উজ্জল হবে এবং এর সুফল ভোগ করবে সমগ্র জাতি। তাই তাদের নিজেদের মধ্যে সমালোচনা সহ্যকরার এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

চার.

একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়েছে। যে দল স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে, স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনা করেছে সে দলকে পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে সুদীর্ঘ ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু কেনো? আওয়ামী লীগের যারা নীতি নির্ধারক তারা কি নিজেকে কখনো এ প্রশ্ন করেছেন? মাঠে-ময়দানে এবং কর্মীদের কাছে জবাব দেয়ার জন্যে এর যুৎসই উত্তর আছে। সে উত্তর আমি চাইনা। আমি জানতে চাই, আপনারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকে কি এ প্রশ্ন কোনদিন করেছেন? এর দায় খোন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান এবং দালালদের উপর পাইকারীভাবে চাপিয়ে দিয়ে ময়দানে গরম বক্তৃতা দেয়া যায়। এ ধরনের বক্তৃতায় হাততালি পাওয়া যায় কিন্তু ভোট যে পাওয়া যায়না এর বাস্তব প্রমাণ গত ২১ বছর। দেশবাসী সাক্ষী, গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা স্পষ্ট ভাবে অতীত ভুলের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলেছেন, আরেকবার আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে আপনারা যাচাই করুন। একটিবারের জন্যে আমাদের সুযোগ দিন। জনগণ তার এ আব্দার রক্ষা করেছে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা দিয়ে বিজয়ী করেছে। কিন্তু এ ক্ষমতায় যাওয়া কি শেষ যাওয়া? ৫ বছর পর জনগণের দরবারে কি আবার যেতে হবেনা? কথাটা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয়দের এবং বিশেষ ভাবে শেখ হাসিনাকে এখন থেকে ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে ৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন তখন আওয়ামী লীগ নিজের দল থেকে নিজ নামে কোন প্রার্থী দেয়ার পর্যায়ে পর্যন্ত ছিলনা। সর্বদলীয় ব্যানারে জেনারেল ওসমানীকে নিয়ে তাদের মাঠে নামতে হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু এবং চার জাতীয় নেতা হত্যার পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব শূণ্য হয়ে গিয়েছিলো, এ কথা বলার অবকাশ নেই। কিন্তু তবু কেনো এ অবস্থা হয়েছিলো? গত সংখ্যা জনমতে প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালের কথা বলতে গিয়ে লন্ডনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা পড়ে আজকের প্রজন্মের অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাৎক্ষনিক ভাবে এর প্রতিবাদে লন্ডনে কোন সভা হয়নি। প্রথম সভা হয় ১৩ নভেম্বর। ১৫ আগষ্ট থেকে ১৩ নভেম্বর কি অল্প সময়? আবার সে প্রতিবাদ সভার উদ্যোগক্তাদের কেউ আওয়ামী লীগের ছিলেন না। কিন্তু আজ কি অবস্থা? আওয়ামী লীগের মন্ত্রী বা নেতা-নেত্রী এখানে এলে তাদের পা মাটিতে ফেলার অবকাশ হয়না। এ সকল কথা কি ভোলা যায় বা ভোলা উচিৎ? আমি জানি, নব্য আওয়ামী লীগার এবং

www.pathagar.com

চাটুকার ও মোসাহেবগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় ব্যস্ত সময় কাটান। এ সকল কথা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ খুব কম পান। কিন্তু নিজের স্বার্থে শুধু নয়, দেশের স্বার্থেও প্রধানমন্ত্রীকে এ সব নিয়ে ভাবতে হবে।

কথায় কথায় আওয়ামী লীগ বিগত সরকারগুলোর চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়ে। ক্ষমতাচ্যুত হলে এ সকল উদ্ধার কার্য সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, জিয়ারউর রহমান, খোন্দকার মোশতাক এবং এরশাদের পদসেবা করে যারা আখের গুছিয়েছেন তাদের অনেকেই আজ শেখ হাসিনার চারপাশে। অনেকে মন্ত্রীসভায়ও স্থান পেয়েছেন। যে সকল সরকার আপনাদের ভাষায় গত ২১ বছর জনগণের ঘাড়ের উপর জোর পূর্বক সোয়ার হয়েছিলো তাদের সেবকগণ বর্তমান সরকারের মন্ত্রীসভায় কি ভাবে স্থান পান? যিনি মোশতাক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন তিনি কি বর্তমান সরকারের মন্ত্রী নন? সুতরাং বিগত সরকার গুলোর গোষ্ঠী উদ্ধার বাদ দিয়ে দেশের জন্যে, দেশের জনগণের জন্যে যা কল্যাণকর সেধরণের কাজে এগিয়ে আসুন। শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের জন্যে এটাই হবে ক্ষমতার সত্যিকার রক্ষা কবচ।

www.pathagar.com

মিলেনিয়াম উৎসবের
এপিঠ ওপিঠ

আজকের লেখায় বহুল আলোচিত মিলেনিয়াম নিয়ে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। সর্বত্র চলছে মিলেনিয়াম উৎসব। সবার সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা মুসলমানরা ঈদ ২০০০ ,হজ্জ এবং উমরা ২০০০ এর মত হাস্যকর বিজ্ঞাপন দিয়ে মিলেনিয়াম উৎসবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। মিলেনিয়াম নিয়ে সারা দুনিয়ায় এবং আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে যা হয়ে গেল সে ব্যাপারে নতুন দিনের পাঠকরা কি ভাবছেন জানিনা। এ ব্যাপারে আমার চিন্তা ভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত। সারা দুনিয়ায় এ নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে আর আমি ভাবছি বিংশ শতকের পন্ডিতদের হলোটা কি ? ওদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না কি ব্যাপারটা আমার মাথায়ই ঢুকছেনা ? বলতে গেলে যেদিন থেকে মিলেনিয়াম নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তা করছি। কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছতে পারছিনা। হতে পারে আমার অজ্ঞতা বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাই এর জন্যে দায়ী।

আমি যতটুকু জানি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বা খৃষ্টাব্দ গণনা শূন্য বা জিরো থেকে শুরু হয়নি, হয়েছে এক থেকে। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রবর্তিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরনে খৃস্টের জন্মের ৫ শ' বছর পর ইতালীয় ধর্মযাজক অক্সিজাস খৃস্টীয় ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। তখনকার পৃথিবীর জ্ঞানী-গুনীদের শূন্যসংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলনা। মুসলমান বিজ্ঞানীরা অনেক পরে শূন্যসংখ্যা আবিষ্কার করেন। তাই শূন্য থেকে গ্রেগরিয়ান সালের গণনা শুরু হয়নি তা অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। এর বহুকাল পর পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারকে আরো সংশোধন-সংযোজন করেন এবং ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে তা অনুসরন করার জন্য যাজকীয় নির্দেশনামা জারি করেন। তখন থেকে তা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশে এটাকেই বলে ইংরেজী সন। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রথমে শুধু খৃষ্টানদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু হয়। প্রটেষ্টান্টরা বহু পরে তা গ্রহণ করেন। বৃটেন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরন করছে এই সেদিন থেকে মাত্র, ১৭৫২ সালে এসে। গ্রেগরিয়ান সনের হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে এসে নতুন শতাব্দী বা নতুন সহস্রাব্দ শুরু হবার প্রশ্নই আসেনা। শতাব্দীই বলুন আর মিলেনিয়াম বা সহস্রাব্দই বলুন, তা শুরু হবে ২ হাজার সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২ টার পর। ২ হাজার সাল হচ্ছে বিংশ শতকের শেষ বছর এবং ১ লা জানুয়ারী ২০০১ সাল থেকে শুরু হবে একবিংশ

www.pathagar.com

শতক বা তৃতীয় সহস্রাব্দ। আমি জানিনা আমার এ হিসাবে কোন ফাঁক আছে কিনা। কোন সহৃদয় পাঠক এ ব্যাপারে আমার ভুল শোধরে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

এর পর আসছে এর নাম নিয়ে আমরা যে বন্য আচরণ শুরু করেছি সে প্রসঙ্গ। মিলেনিয়াম উৎসবের নামে ঢাকায় যে সকল ঘটনা ঘটে গেল এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। মানুষকে যারা পশু থেকে রূপান্তরিত একটি জীবমাত্র ভাবে তাদের কাছে হয়তো এর একটা ব্যাখ্যা আছে। আমাদের কাছে মানুষ আল্লাহ্‌র এক অনন্য সৃষ্টি। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মানুষের সহজাত প্রকৃতি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে এ অনুভূতি বিদ্যমান। কিন্তু ইংরেজী নববর্ষের প্রথম প্রহরে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় যে উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা শুধু হিংস্র পশুদের সমাজেই শোভা পায়। ঢাকা শহরের সর্বত্র সেদিন বোমাবাজি ও ভাংচুর হয়েছে নিছক বিকৃত উল্লাস দেখাতে গিয়ে। স্থানে স্থানে তরুণী ও গৃহবধূরা নাজেহাল হয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের হাতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিক্ষককেন্দ্রে শাওন নামক এক তরুণীকে বিবস্ত্র করে যুবকরা উল্লাস করেছে এবং গুলশানে কয়েকশ' যুবকের হাত থেকে প্রায় বিবস্ত্র এক মহিলাকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। এ সকল খবর পাঠ করে আমরা বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের লজ্জায় ও ক্ষোভে ক্রন্দন আসে। ভেবে পাইনা আমরা কোথায় যাচ্ছি ? কি হল আমাদের যুবকদের এবং আমাদের রাজনীতিবিদদের ? আমি অবাক হয়ে ভাবি, ইংরেজী সন নিয়ে বাংলাদেশে এত মাতামাতির কারণ কি ?

ইংরেজী সনের সাথে বাঙালির সম্পর্ক স্থাপিত হয় ভারতে বৃটিশ রাজত্বের সময়। সময়টা কলঙ্কের এবং সে অর্থে ইংরেজী সন গণনা করা বাঙালির জন্যে গোলামির তকমা গলায় ঝুলিয়ে রাখার সমতুল্য। ফসলী সন হিসেবে বাদশাহ্ আকবর প্রবর্তিত বাংলা সনের সাথে বাঙালির সম্পর্ক আছে এবং থাকবে। এর কারণটা স্বাভাবিক। গ্রামবাংলার অক্ষরজ্ঞানহীন মা-বোন এবং বাপ-চাচারা মুখে মুখে এর হিসাব রাখেন। কারণ গ্রামীন জীবন যাপন এবং ফসলের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হিজরী সনের সাথে আমাদের সম্পর্ক ধর্মীয় আবেগ ও বিধি-বিধানের প্রয়োজনে। বিশেষতঃ রোজা, ঈদ, হজ্জ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উদযাপনে এর প্রয়োজন পড়ে। মুসলিম বিশ্বের সাথে সংযোগের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা রয়েছে। তাই হিজরী সন বাঙালি মুসলমানদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। কিন্তু ইংরেজী সন বাঙালির জন্যে গোলামীর চিহ্ন বৈ কিছু নয়।

ইংরেজী নববর্ষ বৃটেনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়। কিন্তু মা-বোনকে নাজেহাল করা আর ভাংচুরের কালচার কোথাও নেই। বাংলাদেশে যা ঘটেছে এ রকম ঘটনা বৃটেনে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও ঘটেছে বলে আমি শুনিনি। তা হলে বাংলাদেশে এ কালচার কোথা থেকে আমদানী হল ? এসময় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যরাই বা কোথায় ছিল ? বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ভন্ডুল করার

www.pathagar.com

সময় ওদের খুব তৎপর দেখা যায়। সাদেক হোসেন খোকা ও শায়খুল হাদীসের ওপর হামলা, কাদের সিদ্দিকীর সমাবেশ ভন্ডুল করে দেয়া ইত্যাদি এর প্রমাণ। যুবকরা যখন পৈশাচিক উল্লাস করছে তখন কি তারা দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখেছে ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা তরুণীকে বিবস্ত্র করার মত বর্বর কাজ করেছে লক্ষলোকের সামনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজ করার সাহস না দেখাতে পারে। আমরা জানিনা তিনি তার কথা রাখতে পারবেন কি না। ঢাকার মানব জমিনের সৌজন্যে লন্ডনের একটি বাংলা কাগজ একদিনের সংবাদপত্রে অপরাধের যে চিত্র প্রকাশ করেছে তা পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজনৈতিক বক্তব্য ও সাধ্যের সীমানা কতটুকু। যে দেশে খুনের বিচার নেই, যে দেশে এরশাদ শিকদারদের জয়জয়কার, সে দেশে শাওনদের লাঞ্ছনার কালিমা মোছার জন্যে সংবাদপত্রের পাতা ধুয়ে পানি খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে বলে আমি ভাবতে পারিনা।

মিলেনিয়াম যদি সঠিকও হয় তবু এ নিয়ে বাংলাদেশের উল্লাস করার কোন কারণ নেই। মিলেনিয়াম উৎসব হচ্ছে ধনবাদের বিজয় উৎসব এবং এর নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ধনবাদী সভ্যতার বিজয় উৎসবে বাংলাদেশ যোগ দিতে পারেনা। পুজির শোষণের কারণেই পৃথিবীব্যাপী এত দারিদ্র। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের সকল অনুন্নত দেশ এর সহজ শিকার। মানুষের পৃথিবী আজ মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠছে পুজির শোষণের কারণে। গোটা পৃথিবী জোড়ে এখন চলছে লগ্নি পুজির শাসন ও শোষণ। রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তিত রূপ এটা।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উন্নয়ন, শিক্ষা সকল কিছু নিয়ন্ত্রন করছে তারা। এখন আমাদের শোষণ ও লুন্ঠন করে যারা বড় হয়েছে এবং এর জন্যে বিজয় উৎসব করছে সে উৎসবে আমরা কোনমুখে যোগ দেব? ধনবাদী সভ্যতা আমাদের কি দিয়েছে ? দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ,দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ এবং দারিদ্র। অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ছাড়া এ সভ্যতার গর্ব করার কি আছে ? রাষ্ট্রীয় ভাবে বাংলাদেশের এবং ব্যক্তিগত ভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে ধনবাদী সভ্যতার সাথে গলা মিলিয়ে মিলেনিয়াম উৎসবের নামে বর্বরতা প্রদর্শন করা ও ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করাকে কি নামে অভিহিত করা যায় সে বিচার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

মুসলমান হিসেবে মিলেনিয়ামের পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে আসবে আরো ভয়াবহ এক চিত্র। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করলে আমাদের সামনে এক শক্তিশালী মুসলিম মিল্লাতের চিত্র ভেসে ওঠে। কিন্তু পরবর্তী তিনটি শতক আমাদের জন্যে শুধু দুঃখ ও অপমানের শতক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

www.pathagar.com

পর সে অপমান ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে। আজকে চেচনিয়ায় যা চলছে , অতীতে পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই তা সংঘটিত হয়েছে। বিগত তিনটি শতক ধরে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখি যুদ্ধ চলছে এবং এসকল যুদ্ধের আসল নায়ক ও নেপথ্য নায়কদের পরিচয় কারো অজানা নয়। সহস্রাব্দের শেষ লগ্ন তাই আমাদের জন্যে আনন্দ-উল্লাসে ব্যয় করা শোভা পায়না। আমাদের আত্মবিচার ও আত্মজিজ্ঞাসা করা দরকার। চিন্তা করা দরকার, আমরা কোথায় আছি এবং আগামী সহস্রাব্দে বিশ্বমানচিত্রে আমাদের অবস্থান কি রকম হবে।

বিষয়টার আরেকটি দিক রয়েছে। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্ম যদি ১৫৮২ সালে হয়ে থাকে তা হলে দু হাজার সালে এসে এর বয়স হয় ৪শ' বছর থেকে সামান্য কিছু বেশি। সে তুলনায় হিজরি সন অনেক পুরানো এবং মুসলমান হিসেবে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত। সপ্তম শতক থেকে নিয়ে বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত হিজরি সন ছিল মুসলিম বিশ্বের সরকারি ক্যালেন্ডার। রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত হবার পর ক্যালেন্ডারও আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে তুরস্কে সর্বপ্রথম গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশও তাদের অনুসরন করতে থাকে। খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ইংরেজ প্রবর্তিত রীতিনীতি গ্রহণ করলে দেশে উন্নয়নের জোয়ার দেখা দেবে, এ জাতীয় বিশ্বাসই এ পরিবর্তনের পেছনে কার্যকর ছিল। নব্যতুরস্কের প্রবক্তাদের এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত ছিল তা তুরস্কের বর্তমান অবস্থা সাক্ষ্য দেয়। গত ৭০ বছরে যাবত তুরস্ক ইউরোপীয় হতে চেস্টা করছে। কিন্তু না তারা ইউরোপীয় হতে পেরেছে, না ইউরোপ তাদের গ্রহণ করেছে।

মজার ব্যাপার হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এখনো গাণিতিক জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফেব্রুয়ারী মাসকে ২৮ দিনে ধরে এবং লিপ ইয়ার চালু করেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাছাড়া কিছু মাস ৩০ দিনে এবং কিছু মাস ৩১ দিনে হিসাব করার কি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে ? এর পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এখনো কেউ দেখাতে পারেননি। রাজা অগাস্টাস নিজেকে এবং জুলিয়াস সিজারকে সম্মান দিতে গিয়ে তাদের নামের অনুকরনে রাখা আগষ্ট ও জুলাই মাসকে ৩১ দিনে হিসাব করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ দু মাসকে ৩১ দিনে করার জন্যে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ২ দিন ধার করে আনতে হয়েছে। সৌরবর্ষের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কি রকম হাস্যকর বিষয় ! সে তুলনায় হিজরি সনের হিসাব কত সহজ। চাঁদের জন্মের সাথে এর সম্পর্ক, কোন রাজা-বাদশাহের সাথে নয়। চাঁদের জন্ম হলে মাস শুরু হবে, নতুবা নয়। মুসলমান হিসেবে আমরা ক্যালেন্ডার সম্পর্কে বোঝার জন্যে কুরআনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখি, কুরআন বলেঃ তিনিই সে মহান সত্তা যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন মনযিলসমূহ যেন তোমরা চিনতে পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। (১০:৫) নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় মাস বারটি।(৯:৩৬) তোমাকে তারা চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এটা মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।(২:১৮৯) আসলে হিজরি সন আমাদের গৌরব চিহ্ন, আমাদের উজ্জল ঐতিহ্য।

www.pathagar.com

মুসলমানরা, বিশেষ ভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি এর মূল্য না দেয় তা হলে অন্যরা মূল্য দিবে কেন ? রাজনৈতিক গোলামী থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের গোলামী মানসিকতা এখনো রয়ে গেছে। এজন্যেই ইংরেজী নববর্ষ শুধু বাংলাদেশ নয় অধিকাংশ মুসলিম দেশে জাঁকজমকের সাথে পালিত হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে হিজরি সন কখন আসে ও কখন যায় সে খবরই আমাদের থাকেনা।

ঢাকা মহানগরীতে মাহে রমজানের পবিত্র রজনীতে মিলেনিয়াম উৎসবের নামে যা হয়ে গেল তা বাংলা কাগজে পাঠ করে কবি আল মাহমুদের লেখা কদর রাত্রির প্রার্থনা কবিতাটি আমার মনে পড়ে গেল। প্রায় দশ বছর আগে কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চিত্র অংকন করেছেন এর সাথে বর্তমান চিত্রের মিল বা অমিল কোথায় তা পাঠকরাই বিচার করে দেখবেন। এখানে শুধু কবিতাটির শেষ কটি লাইন উল্লেখ করছি। কবি বলেনঃ

হে অনুকম্পার মহান অধিপতি,
এই মহানগরীর ভদ্রবেশী বেশ্যা, লম্পট, হিরোইনসেবী ও ছিনতাইকারীর
প্রাত্যহিক পাপের দেনায় আমরা এমনিতেই অতিষ্ঠ,
এর সাথে যোগ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান পন্ডিতেরা
শিক্ষার প্রতিটি প্রাঙ্গণ কিশোর হত্যার মহাপাপে এখন রক্তাক্ত, পঙ্কিল।
প্রকৃত পাপীদের বিনাশ তরান্বিত করতে তুমি কি বাংলাদেশের
প্রতিটি বিদ্যাপীঠকেই বিরাণ করে ফেলবে?
এমনিতেই গ্রামে গ্রামে ধসে পড়া স্কুলবাড়িগুলোর ভেতর থেকে
শেয়াল আর পেঁচার ডাকে প্রাইমারি স্কুলের আবু মাষ্টারের ঘুম নেই
তার ওপর তারই একমাত্র শহুরে পড়ুয়া মেয়েটির গলার চেন ও হাতের বালা
জগন্নাথ হলের পাশের রাস্তা থেকে ছিনতাই হল। বুকের ওপর ছুরি রেখে
খুলে দে হারামজাদী, চুপ্।

আমরাতো চুপ করেই আছি, হে পরোয়ারদিগার
জানতে সাধ জাগে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ডাকাতদের গ্রাম?
বাল্যে যেমন কোনো গাঁয়ের পাশ দিয়ে নাও বেয়ে ফিরতে গেলে
মুরব্বীরা বলতেন, ওপথে যেওনা অমুকটা হলো ডাকাতদের গ্রাম।

প্রভূ
ডাকাত, ছিনতাইকারী, পন্ডিত ও বেশ্যাদের হাত থেকে
তুমি কি ইলমকে রক্ষা করবেনা? – রাব্বি যিদনী ইলমা –
প্রভূ, আমাদের জ্ঞানদান কর।

লন্ডন, ২৫ জানুয়ারী ২০০০

www.pathagar.com

আমাদের বিয়ে কেন ভাঙছে?

আমাদের বিয়ে ভাঙছে, নানান ধরণের জটিলতা এসে পারিবারিক জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে। ইউরোপের জন্যে এটা কোন খবরই নয়। বিয়ে ভাঙা তাদের কাছে ডাল-ভাতের মত। তাদের কাছে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা জুতা-কাপড়ের মত। জুতা-কাপড় আমরা কিনি, কিছুদিন ব্যবহার করি। তার পর এক সময় তা ডাস্টবিনে ফেলে দেই। ইউরোপে নর-নারীর সম্পর্ক এভাবেই চলছে। পসন্দ হলে তারা এক সাথে বসবাস করছে। তারপর একদিন যখন দেখাগেল একে অপরকে পসন্দ করতে পারছেনা তখন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রেজিস্ট্রি করছে, ইচ্ছা হলে তাও করছেনা। বিবাহ বিচ্ছেদের যে পরিসংখ্যান আমরা পাই তা ওই রেজিস্ট্রিকৃত বিয়ের হিসাব থেকে আসে। লিভ টুগেদার সে হিসাবের বাইরে। কিন্তু এশিয়া বা বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ ডালভাত নয়। এটা রীতিমত একটা ভয়ংকর খবর। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, মা-বাবার ঘুম হারাম হয়ে যায়। তবে আমরা যারা বিলাতে বাস করছি তারা ক্রমেই সিজন্ড হয়ে যাচ্ছি। নিজের এবং পরের মিলিয়ে চারদিক থেকে যে ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের খবর আসছে তাতে ইউরেপীয় সমাজের মত আমাদের সমাজেও বিয়ে ভেঙে যাওয়া কোন ভয়ংকর ব্যাপার থাকছেনা।

আমাদের সমাজ বিবাহ বিচ্ছেদকে যে ভাবেই দেখুক না কেন, বিবাহ বিচ্ছেদ পাপ নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণে অমিল হলে বা সমঝোতা করে চলা অসম্ভব হয়ে পড়লে বিবাহ ভেঙে দেয়ার বিধান ইসলামী শরিয়াতে রয়েছে। যে সকল ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান নেই সেখানে নাগরিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সমাজের জন্যে বিবাহ বিচ্ছেদ কোন ভাল কাজ নয়। একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ বিনির্মানে স্থিতিশীল পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবনতা বেশি সে সমাজে বাবা-মার স্নেহ ও শাসন থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশের জন্যে সুস্থ ও প্রতিশ্রুতিশীল নাগরিক সৃষ্টির প্রক্রিয়া সাংঘাতিক ভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। অপর দিকে অনেক সময় দেখা যায়, ডিভোর্সের ফলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনেও ধ্বস নেমে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পরবর্তী জীবন খুব সুখকর হয়না।

ইউরোপে কেন বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

www.pathagar.com

কিন্তু বিলাতের বাংলাদেশী সমাজে কেন বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইউরোপীয় সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় পুরুষ বা নারীর উপস্থিতি। এ প্রসঙ্গে একটি মজার কৌতুক এখানে উল্লেখ করতে চাই।

মনে করুন একটি ছেলের নাম জন এবং তার স্ত্রীর নাম সু। জনের ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাস রয়েছে। একদিন সু লক্ষ্য করল জন ঘুমের মধ্যে বার বার বলছে, 'ইভা ডর্লিং ....ইভা ডার্লিং।' এতে সু ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায় এবং বলে, 'আমার নাম সু, কিন্তু তুমি বার বার ইভা বলে কাকে সম্বোধন করছ?' কাঁচা ঘুম ভাঙানোর কারণে জন বিরক্ত হলেও এ ক্ষেত্রে তাকে ধৈর্য ধরতে হয়। সে জানে ইভা তার মেয়ে বান্ধু। কিন্তু সে কথা কি বউয়ের কাছে স্বীকার করা যায়? বউয়ের প্রশ্নে হচকিত হলেও সে দমে যায়না। সে বুদ্ধি খাটিয়ে বলে, 'ইভা একটি রেসের ঘোড়ার নাম। গতকাল এ ঘোড়ার উপর আমি দান ধরেছিলাম।' জনের জবাব পেয়ে সু আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু পর দিন অফিস থেকে ফিরে এসে জন দেখে সু'র মেজাজ সপ্তমে। কি ব্যাপার জানতে চাইলে সু বলে, 'রাত্রে তুমি বলেছিলে ইভা তোমার রেসের ঘোড়া। তুমি সকালে অফিসে যাওয়ার পর সে ঘোড়া ঘরে ফোন করেছিল।'

স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝখানে কখনো ইভা এবং কখনো জনের উপস্থিতি ইউরোপে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। উই আর জাস্ট ফ্রেন্ড বলে তারা একে অন্যের চোখে ধুলো দিতে চায়। কিন্তু সে লুকোচুরি বেশি দিন চলে না। একদিন রুঢ় সত্য প্রকাশ পায় এবং পরিণতিতে বিবাহ ভেঙে যায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে স্বামী বা স্ত্রীর এবং কখনো উভয়ের অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা। বিশেষ করে কর্মজীবি মহিলাদের জন্যে অফিস-আদালতের কাজ এবং পারিবারিক কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং কখনো তা বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

বিলাতের বাংলাদেশী সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের পেছনে তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা আছে কি নেই তা নিশ্চয়তা দিয়ে বলার উপায় নেই। থাকলেও হয়তো এর সংখ্যা হবে খুব নগন্য। স্বামীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক জীবনে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিণতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে আছে এবং এর সংখ্যা মোটামুটি উল্লেখ করার মত। তবে অসম বিবাহ যে বিলাতের বাংলাদেশী সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণ তা এক রকম চোখ বুজেই বলে দেয়া যায়।

এখানে আমি অসম বিবাহ বলতে কি বোঝাচ্ছি তা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। ইসলামী শরিয়াতে 'কুফু' নামক একটি পরিভাষা রয়েছে যার অর্থ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দ্বীনিদারীর দিক দিয়ে সমতা। ইসলাম এক নির্দেশ বলে সকল মানুষকে সমান করে দিয়েছে। ইসলাম বলে, সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদমকে

www.pathagar.com

মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কারো থেকে কেউ বড় নয়, সবাই সমান। বংশ,গোত্র,ভাষা,রঙ ইত্যাদির কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। তবে ইসলামী শরিয়াতে যারা পন্ডিত তারা বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে কুফু বা বর ও কনের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দ্বীনদারীর বিচারে সমতা আছে কি না তা বিবেচনা করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হল জমিদারের মেয়ে যদি কৃষক পরিবারে যায় তা হলে তার পক্ষে কৃষক পরিবারের উপযোগী উপায়ে ঘর-কন্নার কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করা কঠিন হবে। একই ভাবে কোন ধনীর দুলালীর বিয়ে যদি গরীব পরিবারে হয় তা হলে গরীব পরিবারকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করা এবং গরীব পরিবারের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া তার জন্যে সহজসাধ্য নয়। এ সকল দিক চিন্তা করেই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিয়ে-শাদীতে কুফু-এর দিকে দৃষ্টি রাখার কথা বলেছেন। তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে রাসুল (সঃ)এর আজাদকরা গোলাম ও পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেসার সাথে বিবি যায়নাবের বিয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, কুফু বা সমতা না হওয়ার কারণে সে বিয়ে টিকেনি। আজাদকৃত ক্রীতদাস যায়েদের সাথে কুরাইশ বংশের সুন্দরী ও বিদুষী মহিলা যায়নাবের মানসিক দুরত্ব ছিল এবং তা কোন ভাবেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এ জন্যেই শেষ পর্যন্ত যায়েদ তাকে তালাক প্রদান করেন।

ইদানীং বিলাতে যে সকল বিয়ে-শাদী হচ্ছে তা যদি আমরা পর্যালোচনা করে দেখি তা হলে দেখব যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম ভাবে তা হচ্ছে। ধনীর সাথে গরীবের, জ্ঞানীর সাথে মুর্খের বা জমিদারের সাথে কৃষকের বিয়ে হচ্ছে সে কথা আমি বলছিনা। এদেশে আমরা যারা ছেলে বা মেয়ে বিয়ে দেই তারা এ দেশের বর বা কনেকে সাধারণতঃ অপসন্দ করি। ছেলে এ দেশে থেকে বেড়ে উঠেছে, এখানে লেখাপড়া করেছে। কিন্তু আমরা তার জন্যে এ দেশের কনে পসন্দ করিনা। আমরা তার জন্যে বউ আনতে বাংলাদেশে যাই। সেখানে গিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কারো মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেই। এর কারণ হিসেবে আমরা দুটো কথা বলি। এক, আমরা এর মাধ্যমে নিজেদের গরীব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা হয় বলে মনে করি। দুই, আমরা বলি, দেশের মেয়েকে ছেলের বউ করে নিয়ে এলে সে মেয়ে দেশের কালচার জানবে, শশুর-শাশুড়ি ও আত্মীয়-স্বজনকে আদর-যত্ন করবে। কিন্তু আরেকটা কথা আছে যা আমরা মুখ ফুটে বলিনা এবং সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মেয়েকে যে ভাবে খাটানো যায় এ দেশের মেয়েকে ছেলের বউ করে আনলে সে ভাবে খাটানো যায়না। হাজারো অত্যাচার-নির্যাতন করলেও বাংলাদেশ থেকে বউ করে আনা মেয়ে টু শব্দটি করবেনা। আমরা ইচ্ছামত তাদের উপর শশুর-শাশুড়িগিরি এবং স্বামীগিরি ফলাতে পারি। বিনাবাধায় এ ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন চালানোর নিশ্চয়তা লাভের জন্যে যারা ছেলের জন্যে বাংলাদেশী বউ খুজেন তারা কি জঘন্য চরিত্রের লোক তা পাঠকরা অনুমান করতে পারেন। এ যাবত যে সকল মেয়ে বউ হয়ে বাংলাদেশ থেকে এ দেশে এসেছে, আমার মতে তাদের অধিকাংশই খুব কষ্টের মধ্যে আছে। বহু মেয়ের

www.pathagar.com

খবর আমার কাছে আছে যারা তাদের কষ্টের কথা না বলতে পারছে, না সইতে পারছে। চোখের জলে তাদের বালিশ ভেজে, কিন্তু তারা শ্বাস ফেলার জায়গা পাচ্ছেনা। তাদের মধ্যে যারা সাহসী অথবা যাদের শক্তিমান আত্মীয়-স্বজন এ দেশে আছে তারা এক সময় বিদ্রোহ করে এবং পরিশেষে তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

অপরদিকে যারা মেয়ে বিয়ে দেই তারাও এ দেশের পাত্র পসন্দ করিনা, পাত্রের অন্বেষণে আমরা মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে যাই। অথচ মেয়ে এ দেশে বড় হয়েছে, এখানকার স্কুল-কলেজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছে। কেন এ দেশের পাত্র পসন্দ নয় এর অনেক কারণ। এ দেশের ছেলেদের চলাফেরা ও হালচাল এর একটা বড় কারণ। ভাল ছেলে পেলে আমরা সাধারণতঃ মেয়ে বিয়ে দিতে আপত্তি করিনা। কিন্তু ভাল ছেলে পাওয়া আসলেই খুব কঠিন। পরের ছেলেকে কি বাছাই করব, নিজেদের ছেলেদের যন্ত্রণায়ই আমরা বাঁচিনা। এ তুলনায় আমাদের মেয়েদের অবস্থা অনেক ভাল আছে। লেখাপড়ায়ও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অধিকতর মনযোগী। ভাল ছেলে না পেয়ে আমরা আমাদের মেয়েদের নিয়ে দেশে যাই এবং এমন ছেলের সাথে তার বিয়ে দিতে বাধ্য হই যার বিলাতের রীতিনীতি ও কালচার সম্পর্কে সামান্যই জ্ঞান আছে। বিয়ের পর ছেলে এদেশে আসে। কিছুদিন তাদের সংসার খুব ভাল চলে। এর পরই শুরু হয় মন কষাকষি। প্রথমে খুব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে শুরু হয়। তারপর আস্তে আস্তে তা বড় হতে থাকে এবং এক সময় তাদের স্বপ্নের সংসার ভেঙে পড়ে।

এখানে আমি যা বলছি এর কোনটাই অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলছিনা। বাংলাদেশ থেকে বউ হয়ে আগত মেয়ে এবং স্বামী হিসেবে আগত ছেলেদের সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনার উপর ভিত্তি করেই বলছি। আমি এরকম বহু পারিবারিক বিরোধে সালিশ হিসেবে মধ্যস্থতা করেছি এবং ডিভোর্স মামলায় দোভাষী হিসেবে কাজ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বলে, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে বিলাত এবং বাংলাদেশের সামাজিক দ্বন্দ্ব। দু'জন গড়ে ওঠেছে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে। তাদের মধ্যে মনের মিল হওয়া সহজ কাজ নয়। অধিকন্তু দু' বিপরীত পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে মানসিক মিল প্রতিষ্ঠার জন্যে যে উপযোগী পরিবেশ দরকার তাও আমাদের বিভিন্ন পরিবারে বলতে গেলে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় যা হবার তা-ই হচ্ছে। ইউরোপীয় কায়দায় আমাদের ভবিষ্যত বংশধর তৈরির কারখানা পরিবারগুলো একের পর এক ভেঙে পড়ছে। ছেলের পক্ষ দোষ দিচ্ছি মেয়েপক্ষকে আর মেয়েরপক্ষ দোষ দিচ্ছি ছেলেপক্ষকে। কিন্তু আসলে কে দোষী তা কেউ জানিনা। তবে এ কথা নিশ্চিত যে ছেলে বা মেয়ে এ জন্যে দায়ী নয় অথবা কমপক্ষে প্রধান দায় তাদের নয়। তারা সংসার গড়েনি, ভাঙার দায়ও তাদের উপর বর্তায় না। আমরা মা-বাবা অথবা অভিভাবকরা জোর করে বা প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে তাদের অসমভাবে বিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এর দায়ও আমাদেরই বহন করতে হবে।

লন্ডন ৪ জুলাই ২০০০

www.pathagar.com

ওআইসি কনফারেন্সের-এর এজেন্ডা কার হাতে?

আজকের লেখা ওআইসি অর্থাৎ অরগেনাইজেশন অব দা ইসলামিক কনফারেন্স সম্পর্কে, তবে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন কোন্দলের কারণে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ওআইসি-এর মহাসচিব হতে পারবেন কি পারবেন না তা নিয়ে আমি ভাবছিনা। স্পীকার বনাম পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দ্বন্দ্ব সিলেট থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার পরিনাম নিয়ে আপাততঃ আমি উদ্বিগ্ন নই। যে জাতি অধঃপাতে যাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় তাদের কেউ রক্ষা করতে পারেনা। কেউ সে চেষ্টা করলে তাকে পাগল বলে উপহাস করা হবে, যে ভাবে নবী নূহ (আঃ)এর প্রতি তার জাতির লোকেরা উপহাস করেছিল। বরং বুদ্ধিমানের কাজ হল অধঃপাতে যাওয়া যাতে আরো তরান্বিত হতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আমার বিশ্বাস আমাদের নেতানেত্রীরা সে উদ্দেশ্যেই দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন।

ওআইসি যখন গঠিত হয় তখন মুসলিম বিশ্বে আনন্দের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। সবাই তখন ভেবেছেন, ওআইসি মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্যে একটি শক্তিশালী প্লাটফরম হিসেবে কাজ করে যেতে সক্ষম হবে। আমাদের কাছে তখন ওআইসি ছিল বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণের প্রতীক। আমরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এর পক্ষে জোরালো ভাবে কথা রেখেছি। আমাদের আশা ছিল, ওআইসি মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক হিসেবে বলিষ্ট ভূমিকা রাখবে। কিন্তু বর্তমানে ওআইসি নিছক নামসর্বস্ব একটি সংস্থায় পরিনত হয়েছে। এখন ওআইসি আর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মধ্যে কোন তফাত পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় একটা অথর্ব সংস্থার জন্যে একজন অথর্ব মহাসচিব অন্বেষন করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। যারা আমাদের মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে ওআইসির মহাসচিব পদে নির্বাচনের চেষ্টা করছেন তারা সেদিক বিবেচনা করেই তা করছেন কি না কে জানে?

আসছে ২৭ থেকে ৩০ জুন, ২০০০, কুয়ালা লামপুরে ওআইসির ২৭ তম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সে কনফারেন্সের বহু এজেন্ডার মধ্যে নতুন একজন সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ অন্যতম একটি এজেন্ডা। কিন্তু ফান্ডামেন্টালিস্ট ও টেররিস্ট প্রতিরোধের অজুহাতে গোটা পৃথিবীব্যাপী মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যে অঘোষিত যুদ্ধ চলছে তা সে কনফারেন্সের আলোচ্যসূচীতে রয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। বিশেষ করে চেচনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে বসেছি।

www.pathagar.com

ওআইসির এজেন্ডা যদি মুসলমানদের প্রয়োজন সামনে রেখে ঠিক করার বিধান থাকে তাহলে চেচনিয়া হতে হবে এবারের প্রধান এজেন্ডা। কিন্তু তা কি হবার উপায় আছে? এক সময় আফগানিস্থান ছিল ওআইসির প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে এর পেছনে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের চাপ কতটুকু ছিল আর কতটুকু ছিল মার্কিন উদ্যোগ তা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। ওআইসির এজেন্ডা যদি রুশ-মার্কিন অক্ষশক্তি ঠিক করে দেয় তা হলে এমন ওআইসির কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? আমার বিশ্বাস আসন্ন ওআইসির কনফারেন্স বলে দিবে কারা এর এজেন্ডা নির্ধারণ করে। যদি মুসলমানদের স্বার্থ এবং মুসলিম বিশ্বের জনগণের আবেগ অনুভুতির কোন মূল্য সেখানে থাকে তা হলে রুশ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওআইসি অবশ্যই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সত্যিকথা বলতে কি আমরা মুসলমানরা এতটা অযোগ্য ও অপদার্থ হয়েছি যে চেক প্রেসিডেন্ট ভাকলাভ হ্যাভেল যে কথা বলতে পারেন, ইউক্রেনের জনগণ যা করতে পারে আমরা মুসলিম বিশ্বের কেউ তা বলার বা করার সাহস রাখিনা। গত ২৮ এপ্রিল হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল ইউরোপীয় প্রেসিডেন্টদের কনফারেন্স শেষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে চেক প্রেসিডেন্ট বলেন,

'Well, look, this Chechnya hadn't belonged to Russia permanently and hasn't belong to it for too long at all. It is a nation with different traditions,religion,history etc. In a democratic environment it would at least be appropriate to ask the nation whether it wants to belong or be part of this empire or not. But there hasn't been any referendum at all.'

অর্থাৎ 'দেখুন, চেচনিয়া কখনো রাশিয়ার অংশ ছিলনা, এখনো বেশিদিন যাবত এর অংশ নয়। ইহা এমন একটি জাতি যার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি রয়েছে। কমপক্ষে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে যদি জাতিকে এ কথা জিজ্ঞেস করা যেত যে তারা রাশিয়া সরকারের অধীনে থাকতে চায় কি না, তা হলে এ কথা বলা যেত যে কাজটা যথাযথ হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন প্রকার রেফারেন্ডাম মোটেই হয়নি।'

চেক প্রেসিডেন্ট যে কথাটা এখানে বলেছেন এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।'কিন্তু এ সত্য কথাটা বলার সাহস আমাদের মুসলিম রাজা-বাদশাহ্ এবং প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীদের নেই। বাংলার মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী জীবিত থাকলে এ সকল মুসলমান নামধারী সরকার প্রধানদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তিনি হুংকার দিয়ে বলতেন, তোমাদের কি ধ্বজভঙ্গ হয়েছে যে তোমরা কথা বলছোনা? আমরা যারা রাজা-বাদশাহ্ নই তারাও আমাদের বিবেক বন্ধক দিয়ে রেখেছি। বৃটেনের মুসলমানরা কারো গোলাম নয় যে কারো ভয়ে সত্যকথা বলা থেকে তারা বিরত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমরাও বৃটিশ মিডিয়ার দিকে হা করে চেয়ে আছি। তারা যদি কারো পক্ষে কোন কথা লেখে তখন

www.pathagar.com

আমরা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠি। কসভো এবং বসনিয়া সম্পর্কে বৃটিশ মিডিয়া কিছুটা সোচ্চার ছিল বলে বাংলা পত্র-পত্রিকা যেমন এ ব্যাপারে কথা বলেছে তেমনি বৃটেনের বিভিন্ন মসজিদ থেকেও কসভো ও বসনিয়ার মুসলমানদের পক্ষে আওয়াজ উঠেছে।
এদিকে ভ্লাদিমির পুটিন চেচনিয়ায় পাইকারী হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার পুরস্কার স্বরূপ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হবার পর গত ১৮ এপ্রিল ইউক্রেন সফরে গিয়েছিলেন। নব্য-খৃষ্টান পুটিন ইউক্রেন-এর প্রসিদ্ধ গীর্জা কিভ-পেচোরা লাভরায় যান সেখানকার ধর্মযাজকের আশীর্বাদ নিতে। কিন্তু গীর্জায় যাওয়ার পথে ইউক্রেনের বিক্ষুব্ধ জনগণ তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সেখানে তারা প্ল্যাকার্ড-ব্যানার হাতে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শ্লোগান দেয় 'চেচেন-হত্যাকারীর শাস্তি চাই'। পুটিনের সাথে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট লিওনিদ কুচমাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এর নিন্দা বা প্রশংসা কিছু না করে নিরবতা পালন করেন।

পুটিন যদি মুসলিম বিশ্ব সফরে যান তা হলে কয়টি দেশের মুসলমানরা 'হত্যাকারীর শাস্তি চাই' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সাহস রাখেন? বিক্ষোভ বাদ দিন, আমাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় রাশিয়াকে চেচনিয়ার মুসলমানদের হত্যাকারী হিসেবে বিবেচনা করতেই আমরা রাজি নয়। রাশিয়ার সাথে গলা মিলিয়ে আমরাও যেন বলতে চাই, এটা রাশিয়ার আভ্যন্তরীন বিষয় এবং রাশিয়া যা করছে তা নিছক টেররিষ্ট ও মৌলবাদীদের প্রতিহত করার জন্যেই করছে।

ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি আসুন একটি মুসলিম বিশ্বের শাসকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখি। কয়েকদিন আগে একটি উপসাগরীয় দেশের এক দল মুসলমান চেচনিয়ায় রাশিয়ার সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। তারা চেচনিয়ার ব্যাপারে আরব বিশ্ব, ইউরোপিয়ান জাতিসমূহ ও জাতিসংঘের নিরবতার নিন্দা জানায় এবং পুটিনের কৃশপুত্তলিকা দাহ করে। তখন সে দেশের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী চেচেন-হত্যাকারীকে খুশি ও সন্তুষ্ট করার জন্যে বিবৃতি প্রদান করে বলেন, 'আমরা, কুয়েত সরকার, এ ঘটনার জন্যে দুঃখিত।' আসলে শুধু কুয়েত কোন ব্যতিক্রম নয়। চেচনিয়ার ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র একই ধরণের অবস্থা বিরাজ করছে। ইউক্রেন, জর্জিয়া ও অন্যান্য বাল্টিক দেশসমুহে চেচনিয়ার তথ্যদফতর রয়েছে, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে তথ্যদফতর খোলার অনুমতি তারা পাচ্ছেনা। চেচনিয়া সরকারের কর্মকর্তারা তাদের পুরানো মেয়াদ উত্তীর্ণ পাসপোর্ট নিয়ে ইউরোপীয় দেশে সফরে যেতে পারেন, কিন্তু পারেন না মুসলিম দেশে যেতে। পাকিস্তান সরকার সাবেক চেচেন প্রেসিডেন্ট জেলিমখান ইয়ানদারবেয়েভ-এর ভিসা নবায়ন না করে পাকিস্তান ত্যাগ করতে তাকে বাধ্য করে। চেচেন বিদেশ মন্ত্রী ইলিয়াস আহমাদভ মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভিসা নিয়ে আমেরিকা যেতে পারেন। কিন্তু মুসলিম দেশে যাওয়ার জন্যে তিনি ভিসা পাননা।

www.pathagar.com

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা - কোথাও চেচনিয়ার মুসলমানদের বন্ধু নেই। সর্বগ্রাসী কূটনৈতিক ও মিডিয়া অবরোধের কারণে চেচনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খবরই কারো কাছে নেই। একমাত্র আফগানিস্থানের তালেবান সরকার তাদের সাথে কিছুটা মানবিক আচরণ প্রদর্শন করছে। এ জন্যে রাশিয়া আফগানিস্থানকে কসভো বানানোর হুমকি দিচ্ছে। এমনিতেই রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্থানের উপর ক্ষেপে আছে। মাত্র কয়েক বছর আগে রাশিয়া আফগানিস্থানে যে নাকানে-চুবানী খেয়েছে সে অপমানের জ্বালা এখনো তারা ভুলেনি। ওপর দিকে একমাত্র আফগানিস্থান সরকারই সাহসিকতার সাথে চেচেনদের পক্ষে কথা বলে। এ জন্যে আমেরিকার 'লাদেন কার্ড' রাশিয়াও ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। এ কথা সবার জানা যে আফগানিস্থানের তালেবান সরকারকে শুধুমাত্র পকিস্তান, সৌদী আরব এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাত সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চান্নটি মুসলিম দেশের বাকি বায়ান্নটি দেশই রাশিয়া-আমেরিকার ভয়ে সন্ত্রস্থ। তাই তারা তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া দুরের কথা তাদের সাথে কোন প্রকার সংযোগ রাখতেই রাজি নয়।

রুশরা দাবি করছে তারা 'চেচেন টেররিষ্টদের' প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। তাদের এ দাবি যে সর্বতোভাবে মিথ্যা তা রুশকমান্ডারের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। রুশরা চেচনিয়াকে কেন পরিত্যাগ করতে পারেনা এর কারণ কারো অজানা নয়। গোটা আরব বিশ্বের তৈলসম্পদের চেয়ে অধিক পরিমাণ তৈলসম্পদের মওজুদ নিয়ে একটি দেশ যদি কস্পিয়ান সাগরের তীরের স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে আওয়াজ তুলে তা হলে এর ধাক্কায় গৌড়গোবিন্দের দালানের মত পেন্টাগন ও ক্রেমলিনে একই সাথে ধ্বস নেমে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। চেচেনদের বক্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ চলছে এবং তাদের ভাষায়, 'উই উইল ফাইট টিল দা লাস্ট রাশান কুইটস চেচনিয়া।' নবেল বিজয়ী রুশ সাহিত্যিক আলকজান্ডার সলঝেনিৎসিনের দৃষ্টিতে চেচনিয়া এমন একটি জাতি যারা কখনো পরাভব মানেনি। চেচনিয়ার পার্লামেন্ট সদস্য আখিয়াদ ইদিগভ লন্ডনে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন,

'The Russian can be said to be occupying only those part of our land which directly under the feet of their soldiers; otherwise they occupy nothing and the war is going on.'

অর্থাৎ 'আমাদের দেশের সে সকল অঞ্চলই রুশরা দখল করে নিয়েছে বলে দাবি করতে পারে যেটুকু সরাসরি তাদের সৈন্যদের পায়ের নিচে রয়েছে। নতুবা কোন অংশই তাদের দখলে নয় এবং লড়াই চলছে।'

আমার এ লেখা যারা পড়ছেন তাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের জন্যে এখানে আমাদের মহানবী(সঃ)এর একটি হাদীস উল্লেখ করতে চাই। হাদীসটি সুনানে

www.pathagar.com

আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত হয়েছে এবং জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহানবী(সঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর হামলা হবে ও তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে তখন যদি অপর মুসলমান তাকে পরিত্যাগ করে তাহলে সে নিজে যখন বিপদে পড়বে তখন আল্লাহ্ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন না। আবার কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর হামলা ও তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে অপর মুসলমান যদি তার সাহায্যে এগিয়ে আসে তা হলে সে যখন বিপদে পড়বে তখন আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন।'

এ হাদীসের আলোকে চেচনিয়ার মুসলমানদের প্রতি আমাদের আচরণ পর্যালোচনা করে দেখার আবেদন জানিয়ে আজকের লেখা এখানেই শেষ করছি।

লন্ডন ১৩ জুন ২০০০

www.pathagar.com

সিলেট ও সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ

সিলেটঃ ভৌগলিক অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত সিলেট জেলা বর্তমানে সিলেট, মৌলবীবাজার , সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ এ চারটি জেলায় বিভক্ত। সিলেটের উত্তরে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে কাছাড়, দক্ষিণে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে কুমিল্লা ও মোমেনশাহী। বৃটিশ আমলে সিলেট জেলার সীমানা আরো বিস্তৃত ছিলো। কুমিল্লা ও মোমনেশাহীর কতিপয় এলাকা এবং ভারতের করিমগঞ্জ মহকুমা সিলেট জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিলো। পাকিস্তান প্রীতির কারণে সিলেট আসাম প্রদেশ ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় যোগ দেয় এবং করিমগঞ্জের মতো একটি সমৃদ্ধ মহকুমাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

সিলেট একটি প্রাচীন জনপদ। তাম্রশাসন, শিলালিপি, চীনা পরিব্রাজক হিউ এন-সাঙ এবং ইবনে বতুতার ভ্রমন বৃত্তান্ত ইত্যাদি থেকে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। ভৌগলিক দিক দিয়ে দুর্গম হওয়ার কারণে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই সিলেট অঞ্চল রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের জন্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ভারবর্ষে আর্যদের আগমনের পর দ্রাবিড় ও বৌদ্ধরা সিলেটে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের পিছু পিছু আর্যরাও এসেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে এসেছেন পাঠান ও মোঘল। এসেছেন দরবেশ শাহজালাল এবং তাঁর সঙ্গী তিনশ' ষাট আওলিয়া। তার সাথে অসংখ্য সৈনিকও আসেন। দেশ জয়, রাজনৈতিক আশ্রয়, ভাগ্যান্বেষন বা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এ ভাবে সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ সিলেটে এসেছেন। কেউ কেউ স্বদেশে বা অন্যত্র চলে গেলেও অধিকাংশই সিলেটের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এ ভাবে সিলেট অঞ্চল এশিয়ার নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকের সমন্বয়ে গঠিত এক বৈচিত্রময় জনপদে পরিণত হয়েছে।

রাজনীতি

রাজনৈতিক দিক দিয়ে সিলেট অঞ্চল স্থানীয় শাসকদের অধীনে শাসিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন কালে এর কিছু অংশ অন্যান্য রাজাদের অধীনে থাকার প্রমাণও রয়েছে। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের সময় সিলেট পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিলো। বারো ভূইয়াদের সময় সিলেট বিভিন্ন সরদারদের শাসনাধীনে ছিলো। উড়িষ্যা দখলের ৮০ বছর পর সিলেট মোঘলদের দখলে আসে। ১৭৬৫ সালে বাংলাদেশে ইংরাজ

www.pathagar.com

রাজত্বের সূচনা হয়। এর মাত্র ১৭ বছরের মধ্যে সিলেটের সৈয়দ হাদী, সৈয়দ মাহদি এবং ইমাম শেখ ফরিদ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে শাহাদত বরণ করেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন ও সংগ্রামে বিশেষ ভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সিলেটের সংগ্রামী অবদান রয়েছে। সিলেটের দেশ প্রেমিক বিদ্রোহীদের ধরে ধরে বৃটিশ সরকার গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাসি দিয়েছে, স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা বলার অপরাধে আমাদের নেতৃবৃন্দ জেল, জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু মাথা নত করেননি। তাদের মধ্যে অনেকে সর্ব ভারতীয় নেতৃত্বও প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি যুদ্ধে সিলেটের জনগণ এবং বিলাতপ্রবাসী সিলেটবাসীর অবদান অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানী, চীফ অব ষ্টাফ মেজর জেনারেল এ রব, ডিপুটি চিফ অব ষ্টাফ কর্ণেল এ আর চৌধুরী প্রমুখ সিলেটেরই কৃতিসন্তান। বিলাতে অবস্থানরত সিলেটবাসী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে এবং অর্থ সংগ্রহে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

অর্থনীতি

আর্থিক দিক দিয়ে সিলেট প্রাচীনকাল থেকেই একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় সেখানে দিনমজুরের সংখ্যা অনেক কম। ইংরেজ ডিপুটি কমিশনার এলেন তার রিপোর্টে ১৯০৫ সালের সিলেট সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তার বিবরণ থেকে সিলেটের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেন, "ভারতের অন্যান্যস্থানের তুলনায় সিলেটের লোকেরা অধিকতর স্বচ্ছল।..... ফসলের ফলন নিশ্চিত ও প্রচুর। অতিরিক্ত শস্য কোন মধ্যসত্বভোগী ছাড়াই সোজাসুজি প্রতিটি এলাকায় নৌকাযোগে আগত বাংলার অন্যান্য এলাকার ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি হয়।"

সিলেট শহর সম্পর্কে তিনি বলেন, "এখানে বহু রাস্তা-ঘাট রয়েছে। এর অধিকাংশই পাকা এবং পাকা পুল সংযুক্ত। জনবসতি শূণ্য পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি এদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। প্রত্যেক এলাকায়ই ছোট মসজিদ ও মুসলমান দরবেশদের কবর দেখা যায়।"

বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে সিলেট বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। সিলেটের চা, আনারস, গ্যাস, শুকনামাছ, চুনা, সিমেন্ট প্রভৃতি বিদেশে রফতানী হচ্ছে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সিলেট অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাদের অর্জিত বৈদেশিক মূদ্রা বাংলাদেশে প্রেরণ করে তারা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও স্থিতিশীলতা অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে সিলেটবাসীর অবদান বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ঈর্ষনীয় পর্যায়ের বললেও অত্যুক্তি হবে না। সিলেটেবাসীর মাতৃভাষা বাংলা নয় এ কথাটা সত্য। কিন্তু এর চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে সিলেটের কবি-সাহিত্যিকগণ যে অবদান রেখেছেন তা আরো দশটি অঞ্চলের মিলিত অবদান থেকেও অনেক বেশী। বাংলাদেশের আদি নিদর্শন চর্যাপদের লেখকদের মধ্যে অনেকেই সিলেটের বাসিন্দা ছিলেন, তাদের ব্যবহৃত ভাষাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ শাখা হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য। এ সাহিত্যের মূল প্রেরণাদানকারী গুরু হচ্ছেন চৈতন্যদেব এবং তিনি সিলেটের সন্তান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৈয়দ সুলতান, দৌলতকাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মোহাম্মদ কবির, মোহাম্মদ ছগির, সাধক কবি শেখ চান্দ প্রমুখ কবিদের অবদানে সমৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ গর্ববোধ করে। এ সকল কবি যে সিলেটেরই সন্তান ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসদ্দর আলী নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। লোক সাহিত্য বাংলাসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা। এ ব্যাপারে সিলেটের অবস্থান বাংলাদেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে। ময়মনসিংহ গীতিকার দশটি গীতিকার মধ্যে কমপক্ষে সাতটি গীতিকা সিলেট অঞ্চলের, যদিও অবস্থার ফেরে এর নাম দেয়া হয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা। এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, শুধুমাত্র সিলেট অঞ্চলে যতগুলো বারমাসী, গীতিকা, লোকসঙ্গীত, ধাঁ ধাঁ ও প্রবাদ পাওয়া যায়, এর পরিমাণ সামষ্টিক ভাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাপ্ত পরিমানের চেয়ে অনেক বেশী। বাংলাভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক মহাকবি সঞ্জয় সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লাউড় এলাকার লোক বলে সর্বশেষ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম মহাভারত রচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্য রচয়িতার মধ্যে নারায়ন দেব এবং ষষ্ঠীবরও সিলেটের কৃতিসন্তান।

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার কবি সাহিত্যিকগণ যেখানে শুধুমাত্র বাংলাভাষায় সাহিত্য সাধনা করেছেন সেখানে সিলেটের কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী, নাগরী, সংস্কৃত, সিলেটি নাগরী, আরবী, ফারসী এবং উর্দূ লিপি বা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে অনন্য বৈশিষ্টের স্বাক্ষর রেখেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্র কুমার সিদ্ধার্থ শাস্ত্রী তার 'শ্রীভূমির সন্তানদের সংস্কৃত সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধে ১০১ জন সিলেটবাসীর ৩৫৯ খানা সংস্কৃত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এমনি ভাবে ফারসী, আরবী এবং উর্দূ ভাষায়ও অসংখ্য কবি সাহিত্যিক নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

সিলেটের কথ্য ভাষা নিয়ে যে যতকথাই বলুন না কেনো, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেখানে কমলালেবুর গন্ধ পেয়েছেন। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার সাথে মিল রেখেই সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে নাগরী লিপি। সিলেটবাসীর নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা সিলেটবাসীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের প্রমাণ এবং সিলেটী নাগরী লিপি সিলেটের এক অমূল্য সম্পদ। গবেষণা করলে দেখা যাবে সিলেটী নাগরী একটি বিজ্ঞান সম্মত লিপি এবং যারা তা উদ্ভাবন করেছেন, এ লিপি তাদের বিরল প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। অধ্যাপক শিব প্রসাদ লাহিড়ীর মতে এ লিপি উর্দূ লিপির চেয়ে অনেক প্রাচীন। তিনটি অক্ষর ছাড়া সেখানে কোন যুক্ত অক্ষর নেই এবং মোট ৩২টি অক্ষর মাত্র।

সুন্দরী শ্রীভূমি

হিউয়েন সাঙ, আলবেরুনী, ইবনে বতুতা প্রমুখের বর্ণনা মতে সিলেট একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর জনপদ ছিলো। হিন্দু পুরাণ মতে সিলেট মহাশক্তির পীঠস্থান রূপে পূণ্যতীর্থ বলে গণ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

" মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাংলার প্রান্তসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি"।

ভূস্বর্গ হিসেবে পরিচিত কাশ্মীরের রাজধানীকে যেমন শ্রীনগর নাম দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটকে এক সময় শ্রীভূমি বলা হতো। গণমানুষের কবি দিলওয়ার বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতার উক্তি দিয়ে একবার লিখেছিলেন, "কাশ্মীর পৃথিবীর সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং সিলেট তার হৃৎপিন্ড।" প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যে গর্বিত সিলেট ভূমি সম্পর্কে মরহুম আমীনুর রশীদ চৌধুরীর জীবনী গ্রন্থে সৈয়দ মোস্তফা কামাল একটি চমৎকার বন্দনা গীতি উল্লেখ করেছেন। বন্দনাগীতিটি এখানে উল্লেখ করেই সিলেট সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করছিঃ

"পয়লা বন্দনা করি মালিক ছত্তার
দুছরা বন্দনা করি নবী মছতফার।
পূবেতে বন্দনা করি আসামর পাড়
দক্ষিণে বন্দনা করি জেলা তির্পুরার।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালী পরবত
পশ্চিমে বন্দনা করি ময়মনসিংহের পথ।
তিছরা বন্দনা করি ছিলটী মানুষ
নাকিছের কথা গুলি হুন দিয়া হুশ।
ধন আছে জন আছে আছে ধনে চাউল
অরিন আছে পাখি আছে আছে মাছ হউল
জ্ঞানির আছে বুদধি আছে আছে শান মান

www.pathagar.com

গলা ভরা গান আছে বাটা ভরা পান
কিওর লাগি গম কর আল্লা কর সার
পীর মুরশিদ আউলিয়ার দোয়ায় অইবায় পার।
যত নিয়ামত দিছেন আল্লায় দুনিয়ার মাঝ
বাশশাগিরি করা অইলো ছিলটির কাজ।
চুন সিমেন্ট তেল গ্যাস ফেছুগঞ্জের সার
পাহাড় ভরা গাছ আছে এলাহী কারবার।
হাওর ভরা মাছ আর চা-কমলার বাগান
তেজপাতার বাগানে দেখি কিবা রূপ তান।
জালালী কৈতর উড়ে কাজল পাংখা দিয়া
আল্লা আল্লা জিগির পড়ে তারা সবে বৈয়া।"

সাহিত্য সংসদ

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ সিলেটের গৌরব, সিলেটবাসীর অহংকার। সমগ্র বাংলাদেশের কোথাও এরকম একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। এ দিক বিচারে সাহিত্য সংসদ শুধু সিলেটবাসী নয় বরং গোটা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অমূল্য সম্পদ। তাই এর সংরক্ষণ, লালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

যে ভাবে শুরু

১৯৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আল ইসলাহ এবং সাহিত্য সংসদের প্রাণ পুরুষ জনাব মুহাম্মদ নূরুল হক তার আত্মকথায় এবং সাহিত্য সংসদের প্রথম সম্পাদক জনাব এ জেড আব্দুল্লাহ সংসদের প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে তা উল্লেখ করেছেন। কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, "এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগীদের স্থান দখল করে থাকবেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, আল্ ইসলাহ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল হক, কবি আব্দুর রাজ্জাক, শেখ মোহাম্মদ সিকান্দর আলী, এ জেড আব্দুল্লাহ, আমীনুর রশীদ চৌধুরী প্রমুখ সাহেবান। ১৬/৯/৩৬ ইং তারিখে দেওয়ান একলিমুর রাজা সাহেবকে সভাপতি এবং মৌলবী মকবুল হোসেন ও মৌলবী আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী সাহেবানকে সহ সভাপতি করে সংসদ গঠিত হয়। এ জেড আব্দুল্লাহ সম্পাদক, এবং দেওয়ান অহিদুর রাজা ও সৈয়দ আব্দুল হাফিজ সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ ছাড়া দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ, মৌলবী সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, মৌলবী মুহাম্মদ নুরুল হক, মৌলবী ইকবাল হোসেন, মৌলবী মোহাম্মদ সিকান্দর আলী, মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মৌলবী আব্দুল মুকতাদির মোহাম্মদ রইস, মৌলবী আবু মোহাম্মদ আব্দুজ্জাহের, মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল বারী বিএ, মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মৌলবী মোহাম্মদ নূর উদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

সাহেবানকে নিয়ে সংসদের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।"

সাহিত্য সংসদের প্রথম অফিস ছিলো ঝর্ণার পারে অবস্থিত ছনবাশের তৈরী একটি ঘরে। সে ঘরের মালিক ছিলেন জনাব এ জেড আব্দুল্লাহ। ১৯৪০ সালে তা বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান ভবনের মালিক ছিলেন জনাব সৈয়দ আব্দুল মজিদ (কাপ্তান মিয়া)।

'কেন্দ্রীয়' কেনো

সাহিত্য সংসদের নামের আগে কেন্দ্রীয় শব্দটি যুক্ত থাকায় অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, এর কি কারণ থাকতে পারে? কেন্দ্র থাকলে শাখা থাকতে হবে। এর কি কোন শাখা সংগঠন আছে? আসলে সাহিত্য সংসদ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আসাম ও সিলেটের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা গঠন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে এ সকল শাখা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় শব্দটি যথাস্থানে রয়ে গেছে।

'মুসলিম' কেনো?

সংসদের গঠনতন্ত্রে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "মুসলমান সমাজে সাহিত্য চর্চার ব্যাপক প্রচলন, বৃহত্তর সিলেটের বাংলা ভাষাভাষী অজ্ঞাতনামা কবি সাহিত্যিকগণের রচিত সাহিত্য সংকলন, প্রাচীন পুথি সংগ্রহ এবং মুসলিম সাহিত্য সেবীবৃন্দের সাহিত্য চর্চার সুযোগ প্রদানই এই সংসদের মুখ্য উদ্দেশ্য। নীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে রাজনৈতিক মতভেদী কোন প্রস্তাব সংসদের কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবেনা। এখানে কোনও প্রকার রাজনৈতিক মতবাদ বা দলাদলি থাকিবেনা। ইহা সকল দল ও সকল মতের সম্মিলন ক্ষেত্র হইবে"।

উদ্দেশ্য ও নীতির ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত থাকলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জন্ম লগ্ন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত মুসলিম সাহিত্য সংসদ এর উদ্দেশ্য হসিলের পথে তৎপর রয়েছে এবং নীতি থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৯৩৬ সালের প্রেক্ষাপট এবং আজকের প্রেক্ষাপট এক নয়। সংসদের প্রথম সম্পাদক এ জেড আব্দুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের পাশেই সাহিত্য পরিষদ এবং প্রগতি সাহিত্য সংঘ রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের নিজস্ব এমন কোন প্রতিষ্ঠানই এখানে ছিলোনা যেখানে সাহিত্য চর্চা এবং সাহিত্যের অনুশীলন চলতে পারে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য ভিতরে ভিতরে যে প্রচেষ্টা চলে আসছিলো তারই ফলে ১৯৩৬ ইংরেজীর ১৬ই সেপ্টেম্বর এই সংসদের জন্ম হয়।" আনন্দের বিষয় যে সংসদের নামের পূর্বে মুসলিম শব্দটি থাকলেও সাহিত্য সংসদ সব সময় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকেছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের সেবা ও উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকগণও এ থেকে সমান ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন। খাটি

www.pathagar.com

মুসলমান কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেনা এর উজ্জল দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে সংসদের সকল যুগের কর্মকর্তাগণ সাফল্যের পরিচয় দিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে সংসদের বর্তমান সভাপতি জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী বলেন, "একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিলো আমাদের এই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি। এ অঞ্চলের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে পেছনে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মননশীল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে সামনের দিকে নিয়ে আসার মহান ব্রত নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিত বিচারে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা ছিলো অনিবার্য বাস্তবতা।"

কর্মতৎপরতার বিভিন্ন দিক

গত ৬২ বছর যাবত কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ দেশ ও জাতির সেবা করে আসছে। সংসদের কর্মতৎপরতার কিছুটা বিবরণ আল ইসলাহ পঞ্চাশ বছর পূর্তি সংখ্যা এবং ষাট বছর পূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আজকের এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এর ছিটে ফোটা উল্লেখেরও সুযোগ নেই। শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেই আমার আলোচনা শেষ করতে চাই।

আল্ ইসলাহ

সাহিত্য সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হচ্ছে আল ইসলাহ নামক সাহিত্য মাসিকের প্রকাশনা অব্যাহত রাখা। আল ইসলাহ বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য পত্রিকা এবং ১৯৩২ সাল থেকে তা প্রকাশিত হচ্ছে। সংসদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তা ছিলো জনাব নূরুল হকের নিজস্ব পত্রিকা। ১৯৩৬ সালে সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠার পর জনাব নুরুল হক আল ইসলাহকে সাহিত্য সংসদের মুখপত্র হিসেবে ঘোষণা দেন এবং সংসদ জনাব মুহাম্মদ নুরুল হককে আল ইসলাহ এর আজীবন সম্পাদক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

আল ইসলাহ সাহিত্য মাসিক তিরিশের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সিলেটের সাহিত্য অঙ্গনে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতের ভাষায়, "তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে সিলেটের সাহিত্য সেবী প্রায় সবাই এক হিসেবে আল ইসলাহর প্রসব।" বহু থিসিস, অসংখ্য বই ও প্রবন্ধে রেফারেন্স হিসেবে আল ইসলাহর নাম উল্লেখিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ নুরুল হকের ইন্তেকালের পর বেশ কিছুদনি এর প্রকাশনা বন্ধ থাকে। আনন্দের বিষয় যে বর্তমান সম্পাদক বিশিষ্ট কবি রাগীব হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পুরাতন সাহিত্যসেবীদের খোঁজে বের করা, তাদের মর্যাদাদান, নতুন লেখকদের উৎসাহ প্রদান, লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে আল ইসলাহ'র মাধ্যমে এর প্রাণ পুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ নূরুল হক এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তার এ কাজকে সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞতাভরে চিরদিন স্মরণ

www.pathagar.com

রাখবে। বর্তমান সম্পাদকও তাঁর পূর্বসূরীর পদাংক অনুসরণ করে সকল মত ও পথের নবীন ও প্রবীণ লেখকদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সংসদ পাঠাগার

মাত্র ১৯টি বই নিয়ে সংসদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় এর বই সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হয়েছিলো। এর মধ্যে কিছু বই বিভিন্ন ভাবে হারিয়ে গেছে। যে বই বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায়না তা সংসদে পাওয়া যাবে, বাংলাদেশের অনেক গবেষকের মুখ থেকে এ ধরণের মন্তব্য শোনা যায়। শুধু সিলেট নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লেখক ও গবেষকগণ তথ্য সংগ্রহের জন্যে সংসদ পাঠাগারে আসেন এবং দিনের পর দিন সেখানে থেকে গবেষণার খোরাক সংগ্রহ করেন। সংসদে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিজহাতে লিখিত কুরআন মজিদ অন্যতম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সংসদ ও মুহাম্মদ নুরুল হককে নিয়ে থিসিস করা হয়েছে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি সম্পর্কে লিখিত পুস্তক তৈরীর সময় বেশ কিছু দিন সিলেট এসে অবস্থান করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' গ্রন্থটির অধিকাংশ তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে সাহিত্য সংসদের পাঠাগার থেকে। বই প্রেমিকদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে সাহিত্য সংসদ গত ষাট বছর যাবত দেশ ও জাতির খেদমত করে যাচ্ছে। অখন্ড ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অনেক জ্ঞানী-গুণী ও মনীষি সাহিত্য সংসদের পাঠাগার পরিদর্শনে এসে অভিভূত হয়েছেন। তাদের প্রশংসাবানী সম্বলিত মন্তব্য সাহিত্য সংসদের পরিদর্শন বইয়ে লিখিত রয়েছে। ২/৮/৫৬ ইং তারিখে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সংসদ দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেন " On the 2nd August I managed to spare a few minutes to pay a short visit to the Muslim Sahithya Sangsad and was charmed with all I saw."

হাবিবুল্লাহ বাহার ১৬/৪/৪৮ তরিখে লিখেন, সিলেটের প্রাণ শক্তির পরিচয় পেতে চাইবেন যিনি তাকে এখানে (সংসদে) আসতে হবে।

সাহিত্য সভা

সাহিত্য প্রেমিকদের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সাহিত্য সভা। জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম সাহিত্য সংসদে নিয়মিত সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রথম বছরের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে নিয়ে ষাট বছর পুর্তি সংখ্যায় সন্নিবেশিত বার্ষিক রিপোর্ট পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতি বছরই সংসদে অসংখ্য সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লেখকরা এ সকল সভায় নিজেদের লেখা পাঠ করেন এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ পঠিত লেখার উপর তাদের সারগর্ভ পর্যালোচনা পেশ করেন। এ ধরণের সাহিত্য সভা লেখক তৈরী ও লেখার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতীতে যারা

www.pathagar.com

নিয়মিত ভাবে এ সকল সাহিত্য সভায় উপস্থিত হয়েছেন তাদের অনেকেই পরবর্তী পর্যায়ে লেখক হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। জনাব মুহাম্মদ নূরুল হকের ইন্তেকালের পর সামান্য কিছুদিন সংসদের এ সকল সাহিত্য সভা বন্ধ ছিলো। বর্তমান সম্পাদক নিজে কবি ও লেখক হওয়ার কারণে এবং তিনি মরহুম নূরুল হকের মতই বড়দের প্রতি শ্রদ্ধশীল ও ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়ার ফলে সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য সভায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বর্তমানে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর সেখানে সাহিত্য সভা বসে এবং বিপুল সংখ্যক লেখক ও কবির উপস্থিতিতে সংসদ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ সকল সাহিত্যসভায় কখনো শতাধিক লোকও উপস্থিত হন। এ রকম জমজমাট ও নিয়মিত সাহিত্য সভা বাংলাদেশের কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। সাহিত্য সংসদ এ ভাবে সাহিত্য সভাগুলোর মাধ্যমে সিলেটে লেখক ও সাহিত্যিক তৈরীর ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

ভাষা আন্দোলন

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য বলতে গেলে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভাদ্র সংখ্যা আল ইসলাহতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে জনাব মুহাম্মদ নূরুল হক বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তখন সারা পূর্ব বাংলা ছিলো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব নিশ্চুপ। পরবর্তী মাসে অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত সংসদের নিয়মিত সাহিত্য সভায় জনাব মুসলিম চৌধুরী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সভার সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক মতিন উদ্দীন আহমদ। জনাব মুসলিম চৌধুরী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ দাবী উত্থাপন করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা অবশ্যই বাংলা হতে হবে।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে জনমত তৈরীর উদ্দেশ্যে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা হলে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সিলেটের কৃতিসন্তান ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী। উর্দু ভাষার সমর্থক কিছু লোক এ সভা বানচাল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাহিত্য সংসদের কর্মীদের প্রচেষ্টায় এবং ডঃ আলীর বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ডঃ আলী তার সুদীর্ঘ লিখিত বক্তব্যে অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে একমাত্র বাংলা ভাষাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা রাখে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে তাই করতে হবে। বেশী দীর্ঘ হবার কারণে ডঃ আলী ভাষনটি সংক্ষিপ্ত ভাবে আল ইসলাহতে ছাপিয়ে দেয়ার জন্যে জনাব নূরুল হককে দিয়ে যান। আল ইসলাহতে ১১ শ' বর্ষ ৭ম-১২ শ' সংখ্যায় ম্যাগাজিন সাইজের ৩০ পৃষ্টাব্যাপী ভাষনটি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক এ লিখিত বক্তৃতাটি কলিকাতার চতুরঙ্গ পত্রিকায়ও প্রকাশ পায়। একই বছর ২৮ ডিসেম্বর

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে আরেকটি সভার আয়োজন করা হয়। সংসদ সভাপতি নজমুল হোসেন চৌধুরী সে সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংসদের সাবেক সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। আল ইসলাহ এবং মুসলিম সাহিত্য সংসদের এ সকল প্রচেষ্টায় ভাষা আন্দোলনের চেতনা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ৮ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্থানীয় গোবিন্দ পার্কে (বর্তমান হাসান মার্কেট) এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সে সভায় কায়েমী স্বার্থবাদী মহল থেকে হামলা চালানো হয়। সে হামলায় যারা আহত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হন তাদের মধ্যে মুসলিম সাহিত্য সংসদের দীর্ঘদিনের সভাপতি জনাব মুসলিম চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। এ ঘটনার পর সংসদ সম্পাদক জনাব নূরুল হকের উপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ ও হুমকি আসা শুরু হয়। এমনিক তার জীবন নাশের আশংকাও দেখা দেয়। ফলে তিনি কিছু দিন আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন।

নূরুল হক উত্তর সাহিত্য সংসদ

সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠায় সমসাময়িক অনেক জ্ঞানী-গুনী এবং দানশীল ব্যক্তির ভূমিকা ছিলো, কিন্তু জনাব মুহাম্মদ নূরুল হক ছিলেন এর ভিত্তি এবং মূল প্রাণ শক্তি। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মায়ের মতো আদরে-যত্নে তিনি একে প্রতিপালন করে বড় করেছেন। তার ইন্তেকালের পর যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় তা কাটিয়ে উঠতে সংসদকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তখন জনাব মুসলিম চৌধুরী, এ এইচ সা'দত খান, অধ্যাপক আসদ্দর আলী প্রমুখের নেতৃত্বে এবং সিলেটের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদদের প্রচেষ্টায় সাহিত্য সংসদের ভেঙে পড়া কাটামো পূর্ণগঠনের প্রচেষ্টা চলে।

নূরুল হক উত্তরকালে ১৯৮৮ সালে এবং ১৯৯২-৯৪ সালে গঠিত কমিটি দ্বয়ের চেষ্টায় সংসদের সংরক্ষিত সকল বই পুস্তকের তালিকা নতুন করে লিপিবদ্ধ করা হয়, ভবনের সংস্কার সাধন হয় এবং বানিজ্যিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

জনাব মুসলিম চৌধুরীর ইন্তেকালের পর ১৯৯৪-৯৫ সালে সংসদের কার্যকরী কমিটি নতুন করে গঠিত হয়। তখন প্রবীন রাজনীতিবিদ দেওয়ান ফরিদ গাজী সভাপতি এবং সু-সাহিত্যিক রাগিব হোসেন চৌধুরী সেক্রেটারী হিসেবে নির্বাচিত হন। এ কমিটির প্রচেষ্টায় সংসদের সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষ করে নিয়মিত সাহিত্য সভা, আল ইসলাহ প্রকাশনা, গণ্যমান্য কবি সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা প্রদান প্রভৃতি জোরাদার ভাবে শুরু হয়। এ সময়ের একটি উজ্জ্বল উল্লেযোগ্য দিক হচ্ছে সংসদের ষাট বছর পুর্তি উপলক্ষে দু'মাস ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা। ২৯ ডিসেম্বর ৯৬ সালে এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন বাংলাবাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। তখন সমগ্র সিলেট যেনো উৎসবে মেতে উঠেছিলো। সাহিত্য

www.pathagar.com

সভা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, এবং বিশেষ করে লেখকদের পদযাত্রা অনুষ্ঠান ছিলো অত্যন্ত উপভোগ্য সিলেটের রাজপথে শান্তির স্বপক্ষে লেখকদের সে নীরব পদযাত্রা সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শেষ কথা

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এবং বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মানস গঠনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যচ্ছে। এ ব্যাপারে সংসদের বর্তমান সভাপতি দেওয়ান ফরিদ গাজীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার এ নিবন্ধ শেষ করতে চাই। সংসদের ষাট বছর পুর্তি উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের সমাপনী দিনে সভাপতির ভাষনে তিনি বলেন, "বিগত ষাট বছরের এ অঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র সহ জাতীয় ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বাঁকগুলোকে সামনে রেখে যদি আমরা মুসলিম সাহিত্য সংসদের কার্যক্রমকে বিচার করি, তাহলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ প্রতিষ্ঠান পালন করেছে ঐতিহাসিক দায়িত্ব। জাতীয় পট পরিবর্তনের পেছনে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি প্রয়োজন– তা তৈরী করতে সংসদের ভূমিকা ছিলো অনস্বীকার্য।

সিলেটের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে ধরে রাখা, সাহিত্য আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়া থেকে শুরু করে কবি সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সাহিত্য সংসদ তথা আল ইসলাহ যে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা দিবালোকের মতো ভাস্বর।

সাতচল্লিশের গণভোট, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের ইতিহাসের এই ঐতিহাসিক বাঁকগুলোতে উপনীত হবার পর্যায়ে যে যৌক্তিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে এই সংসদ ও তার পাঠাগার পালন করেছে জতীয় দায়িত্ব। ভাষা আন্দোলন ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্য সংসদ যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।"

মুসলিম সাহিত্য সংসদের সভাপতির সাথে সুর মিলিয়ে আমি বলতে চাই, "আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদকে এ দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। এ প্রতিষ্ঠান হোক সকল মত ও পথের মানুষের মিলন কেন্দ্র।" (সংসদের তদানীন্তন সম্পাদক কবি রাগিব হোসেন চৌধুরীর বিলাত সফর উপলক্ষে বিলাতের ৫টি বাংলা পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত 'সিলেট ও সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত)

২১ জুন ১৯৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

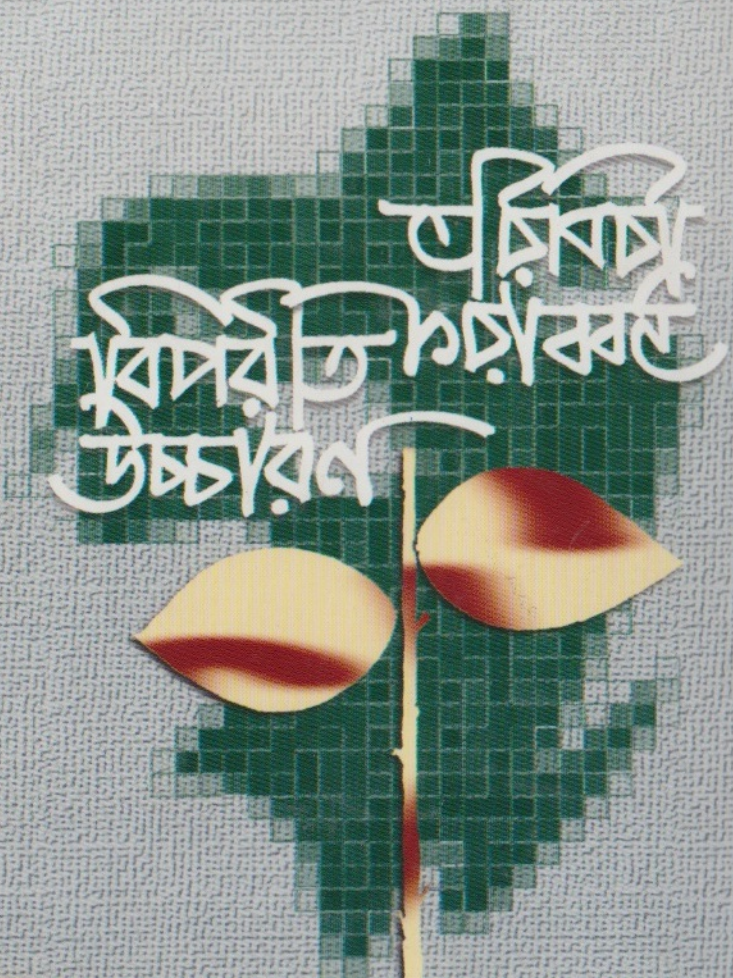

বিপরীত
উচ্চারণ